প্রকাশক ঃ
স্বপন কুমার ভট্টাচার্য
টিচার্স কনসার্ন
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ৮ নভেম্বর ১৯৯২
( পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের
নবম বার্ষিক সম্মেলন, উলুবেড়িয়া কলেজ, হাওড়া )

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীভোলানাথ পাল
অনুশ্রী প্রিন্টার্স
৪/১ই, বিডন রো,
কলকাতা-২০০০০৬

# নিবেদন

ইতিহাস সংসদের ছাত্র-ছাত্রী সদস্যদের অনুরোধ ক্রমে গত ১৯৯১ সালের ১৫ ডিসেম্বর "ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজের ভূমিকা" প্রসঙ্গে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য ( শিক্ষা ) ড. ভারতী রায় ও সভাপতিত্ব করেন ড. কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়। প্রবন্ধ পেশ করেন ড. রণজিৎ রায়, অধ্যাপক সুব্রাত দাশ, ড. মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, ড. চণ্ডীপ্রসাদ সরকার ও অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়।

সংসদের সাধারণ রীতি অনুযায়ী উক্ত অনুষ্ঠানে পঠিত প্রবন্ধগুলি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ড. বরুণ দে-র সম্পাদনায় প্রকাশ করা হল। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের কাছে, বিশেষত প্রকাশক টিচার্স কনসার্ন এবং মুদ্রক তনুশ্রী প্রিন্টার্স-এর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। পরিকল্পনা ও ছাপার যে-দোষত্রুটি থেকে গেল, তার দায়িত্ব সংসদের। অবশ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও বক্তব্য লেখকদের একান্তই নিজস্ব।

কলকাতা
৮ নভেম্বর, ১৯৯২

রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

# সূচীপত্র



---

# মুখবন্ধ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ছাত্র সমাজের অবদান যে অবিস্মরণীয় একথা সর্বজনবিদিত। তবে এ নিয়ে মৌলিক গবেষণা খুব একটা বেশি হয়নি। ফলত ইতিহাস সংসদের এই প্রচেষ্টা থেকে আমরা আশা করতে পারি যে গবেষক, শিক্ষক ও ছাত্র সমাজে কিছু উদ্দীপনা সঞ্চারিত হবে যার থেকে শুধু অবিভক্ত বাংলা কেন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্র আন্দোলন বিষয়ক মৌলিক চিন্তা-চর্চার সূত্রপাত হবে। ভারতের ছাত্র আন্দোলন বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য আধুনিক যুগের ইতিহাসেই সীমিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ছাত্ররা শিক্ষা পদ্ধতি তথা সমাজ তথা তৎকালীন রাজনীতিতে কতটা মনোনিবেশ করতেন সে বিষয় আষাঢ়ে গল্প বলা ছাড়া উপায় নেই—যেমন দূরদর্শনের চাণক্য বিষয়ক গালগল্প। টোল, পাঠশালা, মক্তব মাদ্রাসাতেও নিশ্চয় সমাজ-সচেতন ছাত্র ছিল এবং বঙ্গে তুর্কীদের আগমনের সুযোগে তাদের ভাবনা চিন্তা কেমন ছিল সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অচলায়তনে কিছু গল্প ফেঁদেছিলেন ঠিকই তবে ইতিহাস সিদ্ধ আকরগ্রন্থ তেমন পাওয়া যায় না বলে এ বিষয় ঐতিহাসিকদের এখনও কিছু বলার নেই।

ভারতে প্রথম ছাত্র আন্দোলনের কথা আমরা পাই নব্য বঙ্গ যুগে। অর্থাৎ হিন্দু কলেজ স্থাপনের কিছুদিন পরেই যখন একদল ছাত্র ডিরোজিওর পঠন-পাঠনের উন্মাদনায় 'এনকোয়ারার' বা জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করেছিলেন, উৎকৃষ্ট আধুনিক চিন্তার নিদর্শন হিসেবে সে সব পত্রিকার অংশ রসিককৃষ্ণ মল্লিকের কাছ থেকে পেয়েছিলেন সুপ্রীম কোর্টের এক জজ যিনি উদাহরণ স্বরূপ এগুলি লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বিলাতের নাটিংহাম লাইব্রেরিতে বেণ্টিঙ্ক-পত্রাবলীতে এখনও রক্ষিত আছে। এই উন্মাদন থিতিয়ে যায় হিন্দু কলেজের প্রশাসক মণ্ডলীর কঠোর পদক্ষেপে। ডিরোজিও স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। নব্যবঙ্গীয়দের অনেকেই পরিণত বয়সে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, শহরতলীর সমাজ সংস্কারক বা মহান কবি রূপে দেখা দেন। শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' গ্রন্থে এই পরিবর্তনের কথাই লিখেছেন—কিভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলকাতার ইংরেজি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ বা কারিগরিবিদ্যা অনুধাবনের মাধ্যমে এক যে এক নতুন প্রজন্ম (কারিগরীবিদ্যা অনুধাবনের মাধ্যমে যে এক নতুন প্রজন্ম) মধ্য শতাব্দীর পরিণত প্রগতিবাদী এবং পাশ্চাত্য ভাবালম্বী মধ্য বর্গ ( Middle class )-এ পরিণত হয়। সে প্রজন্মের যাঁরা লোকবরেণ্য তাঁদের মধ্যে কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব, মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা নির্ধারক রাধানাথ সিকদার, উত্তরপাড়ার পাবলিক

লাইব্রেরির স্থাপয়িতা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাঙালি নেতৃকুলের জীবনীকার ভ্রাতৃদ্বয় কিশোরীচাঁদ মিত্র ও প্যারীচাঁদ মিত্রর নাম সর্বজনবিদিত।

গৌতম চট্টোপাধ্যায় 'অ্যাওয়েকেনিং ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে এই যুগের এমন একজন অখ্যাতনামা ষোলো বছর বয়সী কিশোরের লেখা ছাপিয়ে দিয়েছিলেন যার নাম কৈলাসচন্দ্র দত্ত। ১৮৩৫-এ লিখিত "একশত দশ বছর পরে আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষ" প্রবন্ধে ঐ কিশোর ১৯৪৫-এ ভারত জুড়ে এক কল্পিত গণবিদ্রোহের কাহিনীতে অত্যাচারী বড়লাট ফেল বুচারকে কিভাবে গদিচ্যুত করে বিদ্রোহীরা স্বাধীন ভারতে সরকার গড়ে তোলে তার এক দৃপ্ত বিবরণী দিয়েছেন। ১৮৪০-এর দশকে সত্যি এক ধরণের নতুন চেতনা আসে, কলকাতার ছাত্র সমাজে শুধু নয়, সুদূর বোম্বাইয়ের ছাত্র সমাজেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে ইংরেজি এবং পাশ্চাত্য চিন্তায় উদ্দীপিত ভারতীয় ছাত্রসমাজের মৌল দ্বন্দ্বের আগমন আসন্ন হয়ে পড়ে। এর কয়েক বছর পরেই ভারতের ঐতিহাসিকদের দ্বারা লিখিত ভারত-ইতিহাসের ( হিস্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড্ বাই ইটস ওন হিস্টোরিয়ানস্ ) সংকলক স্যার এইচ. এম. এলিয়ট তাঁর সংকলনের মুখবন্ধে লিখেছিলেন যে ভারতের ইতিহাস খুঁজতে হলে বিলাতি সমাজকে এই নব্য দোভাষী কূলের আওতা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুঁথিপত্রের মধ্যে। এই চিন্তার দ্বন্দ্বের মধ্যেই প্রাচ্যবাদ ওরফে ওরিয়েণ্টালিজম জন্ম নেয় আঠারো শতকের শেষ দুই দশকে। ঐ ধরণের প্রাচ্যবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল প্রাচীনযুগের যে ঐশ্বর্যই থাক না কেন নয়া ভারত হলো ইংরেজেরই সৃষ্টি।

এই ধরণের প্রাচ্যবাদের সঙ্গেই সংঘর্ষ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কলকাতার কলেজের ছাত্র সমাজের। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী বা কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিতে যে সব চিত্তাকর্ষক গল্প আমরা ছেলেবেলায় পড়তাম তার মধ্যে একটি হলো কিভাবে হেয়ার স্কুল অঞ্চলে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বাচ্চাদের সঙ্গে বাঙালী সন্তানদের মারপিট হতো জাত্যাভিমান বিষয়ক বিতর্কে। গল্পটি আমার মনে আছে, কারণ আমার নিজের ছোটোবেলায় ব্রিটিশ আমলের শেষ দশকে এই ধরণের ধস্তাধস্তি দেখেছি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অ্যালান গার্ডেনে। সাহেব পেটানো ছিল আমার প্রজন্মের এক বড়ো মাদকতা। হয়ত এই সাহেব পেটানোই ছিল বাঙালি যুবকের বয়ঃসন্ধিকালের আদিম প্রয়োজন। গ্রামের ছেলেদের কথা বলছি না। তাদের জীবনের বয়ঃসন্ধি কালের ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। সে বিষয়ে এখনো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কিভাবে তারা, ধরুন শ্রীহট্ট থেকে, এসে কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলের মেসে বাস করতেন তার কিছু গল্প পাওয়া যাবে বিপিনচন্দ্র পাল বা কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিতে। সে যুগে আমরা দেখেছি হ্যারিসন রোড, আমহার্স্ট

স্ট্রিট, মির্জাপুর স্ট্রিটের হোটেল বা ছাত্রাবাসে অর্থাভাবে ক্লিষ্ট মফঃস্বল শহরের ছাত্রদের জীবন বৃত্তান্ত। তবে কলকাতার খাস বাবুদের মধ্যে সাদা চামড়ার সঙ্গে পাঞ্জা কষার প্রবণতা গত শতাব্দীতেই বেড়েছিল।

এই নানা ধরণের অভিজ্ঞতা জড়িত সমাজ চেতনা গড়ে ওঠে কলকাতার ভিন্ন ভিন্ন কলেজের ছাত্র মননের মধ্য দিয়ে। এই ছাত্র মনোভাব যে সম্পূর্ণ একক তা ভাবার কারণ নেই। এর মধ্যে শ্রেণী স্বার্থ, গোষ্ঠী ও কৌমের বিরোধ ও দ্বন্দ্ব নিশ্চয় ছিল। আমার বাবা যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন (১৯১৫-১৮) তখন তিনি এসেছিলেন সেকালের অভিজাত হেয়ার স্কুল থেকে। তাঁর সহপাঠী ছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ফণীভূষণ চক্রবর্তী যিনি স্বাধীন পশ্চিম বাংলার প্রথম প্রধান বিচারপতি, তিনি নাকি একটা ছড়া লিখেছিলেন। ছড়াটি এই রকম—"প্রথম যখন কলেজে এলাম বললাম বাহাবাহারে / আসছি হতে হিন্দু হেয়ার / কারিনে কেয়ার কাহারে।" এটা শুধু সামাজিক অবস্থানের দ্বন্দ্ব নয়, চিন্তার দ্বন্দ্ব, রাজনীতি বোধের দ্বন্দ্ব।

এই দ্বন্দ্বের একটা দিক নিয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হলো। এই গ্রন্থে সামাজিক পরিবেশের বিষয়-বিশ্লেষণ তেমন নেই। কলকাতা তথা পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গে কী ধরণের কলেজ ছিল, তাদের মধ্যে কী ধরণের যোগাযোগ বা অন্য সম্পর্ক ছিল বা থাকতে পারে সে বিষয়ে যে গবেষণার প্রয়োজন সেদিকে ইশারা দেওয়ার জন্য আমার এই কটি কথা লেখা। সেই মিশ্রিত পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসে একটি যোগাযোগের সূত্র। সে সূত্র হলো গণতান্ত্রিক জাতীয় চেতনা। এই গণতান্ত্রিক জাতীয় চেতনার সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের সময় থেকে, নব্যবাংলার অব্যবহিত পরেই। তবে কলকাতা, ঢাকা, রাজশাহী, আবার পরবর্তীকালে মেদিনীপুর, দৌলতপুর ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি শহরে এই চেতনা ছাত্র সমাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উদ্দীপিত হ'য়ে ওঠে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অগ্নিযুগে। এই অগ্নিযুগের ইতিহাস, অধ্যাপক সুমিত সরকারের 'স্বদেশী মুভমেণ্ট ইন্ বেঙ্গল' বইটিতে বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। তার মধ্যে ছাত্র আন্দোলনের বিশিষ্ট স্থানের ছোটো বিবরণ দিয়ে শ্রীমান রঞ্জিত রায়ের প্রবন্ধ শুরু এবং তিনি গল্পটিকে নিয়ে গেছেন আইন অমান্য আন্দোলন যুগ অর্থাৎ ১৯৩০-এর দশকে প্রথম বছরগুলি পর্যন্ত। গণতান্ত্রিক জাতীয়বাদী চেতনার বিক্ষিপ্ত আলোচনা সংগঠিত রূপ ধারণ করে অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনের মাধ্যমে। এই সংগঠন স্থাপন কালে যারা এর সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁদের এখনো মনে আছে কিভাবে এই সংগঠন কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে এবং পরবর্তী সময়ের কংগ্রেস অধিবেশনগুলিতে ভলাণ্টিয়ার নিযুক্ত করেছিল। এই স্বেচ্ছাসেবক-মণ্ডলীর মধ্যে ১৯২৮-এ বড় স্থান গ্রহণ করে মহিলা সমাজ।

ছাত্র আন্দোলনে মহিলা সমাজের অবদান এবং তার খুঁটিনাটি দিকগুলি নিয়ে প্রচুর তথ্য পরিবেশন করেছেন জঙ্গীপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুব্রাত দাশ। তিরিশের দশকে ফ্যাসিবাদি আন্দোলনের বিরুদ্ধে বাংলায় প্রতিরোধী চেতনার বিষয়ে সুব্রাতবাবুর সাম্প্রতিক 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা' বইটি সুপরিচিত ঃ ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে কিভাবে তরুণ ছাত্রীরা যুক্ত হলেন এবং জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তার সংযোগ এই প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু। বলা হ'য়ে থাকে যে ১৯২০-২১-এর অহিংস সত্যাগ্রহের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবারের মহিলাকুলের ডাকে বহু নারী বেরিয়ে এসেছিলেন কলকাতার রাস্তায় সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধে। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের প্রকাশ্য সহযোগ অনেক বিস্তারিত হয়ে পড়ে ১৯৩০-এর আইন অমান্যর সময় যখন সর্বভারতীয় নারী জাগরণের রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তবে এই ইতিহাসের মধ্যে ১৯২৮-এ কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের স্থান বিশিষ্ট। আমি আমার মায়ের কাছে গল্প শুনেছি, তাঁর বিবাহের আগে তিনি যখন বেথুন কলেজে প্রমীলা গুপ্ত নামে ছাত্রী তখন তিনি দীপালী সংঘর ক্যুরিয়ার হিসাবে কাজ করতেন, বিশেষ করে বিনয়-বাদল-দীনেশের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। এই সময় তিনি ইউনিফর্ম পরে ঘোড়সওয়ার সুভাষ বসুর পেছনে মার্চ করে পার্কসার্কাস ময়দানে গিয়েছিলেন। দেখানো হয়েছিল এক নয়া জমানার স্বপ্ন। শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর সাম্প্রতিক 'দাই হ্যাণ্ড গ্রেট অ্যানার্ক' গ্রন্থে এবং নীরদবাবুর পত্নী অমিয়াদেবী লিখিত 'দিদিমার যুগ ও জীবন' বইতে এ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা আছে। আমার মা এবং অন্যান্য মেয়েরা "গো ব্যাক সাইমন" আন্দোলনের সময়ে বেথুন কলেজ থেকে মিছিল বের করেছিলেন কলেজ স্ট্রিট দিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায়ের বাড়ি পর্যন্ত। হস্টেলের অধিকর্তাদের কাছে তাঁরা নাকি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে তাঁরা কালো পতাকা নিয়ে বেরোবেন না, কেননা তাঁরা সরকারি কলেজের ছাত্রী। বিধানচন্দ্রের বাড়ির মধ্যে কিছু নেতা হঠাৎ তাঁদের ফেস্টুন সরিয়ে মেয়েদের হাতে কালো পতাকা ধরিয়ে দেন, তখন নাকি প্রমীলা গুপ্ত রাজনৈতিক উন্মাদনার চেয়েও তাঁর প্রতিশ্রুতিকে বেশি উচ্চ স্থান দিয়েছিলেন এবং ছাত্র দের বেথুন হস্টেলে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই ধরণের খুঁটিনাটি দ্বন্দ্বের কথা আমি তুলছি ছাত্রীদের আন্দোলনে যোগদান করার ব্যাপার খাটো করার জন্য নয়। শুধু সেই যুগে তাঁদের কোন ধরণের মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে নিজেদের আত্মপ্রত্যয় বজায় রাখতে হতো সেই বিষয়টিকে উত্থাপন করার জন্য। আমার মা-রই সহকর্মিনী চট্টগ্রামের অন্যতম বিপ্লবী সুহাসিনী গাঙ্গুলির কাছে শুনেছি যে অধ্যাপক ও শ্রীমতী সুশোভন সরকারের এলগিন রোডস্থ ফ্ল্যাটে সমসাময়িক বিপ্লবী দল থেকে কোনো অজু-

হাতে প্রমীলাকে ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। কেননা তাঁর মতো লাবণ্যময়ী চেহারার যুবতী রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ছেলেদের সঙ্গে কথা বলছে তাতেই পুলিশের টিকটিকির নজরে পড়ত যে কথাবার্তা নিশ্চয় রাজনীতি প্রসঙ্গে। ফলে বিপ্লবী দলের অংশগ্রহণকারীদের সনাক্ত করা সহজ হয়ে যেত। এই ধরণের অবস্থা ১৯৪০-এর দশকেও অবিশ্বাস্য, কারণ তখন রাস্তায় ছেলে-মেয়েদের কথা বলা ক্রমশ সহজ হয়ে আসতে শুরু করেছে এবং তখন পুলিশের টিক-টিকির প্রকোপও খানিকটা কমে গিয়েছিল। তবে একদিকে নিজের বিবেককে অটুট রেখে এবং অপরদিকে আই. বি. গোয়েন্দাদের নজর এড়িয়ে বিপ্লবী আন্দোলন করা এবং সেই সঙ্গে প্রকাশ্যে কোনো কোনো ব্যাপারে রাজনীতি চালানো সহজ ব্যাপার ছিল না।

অগ্নিযুগের মহিলা আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক কর্ম। শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে খানিকটা সংযোগ ছিন্ন হয়ে যেত বটে অর্থাৎ সেই যুগের গুরুকুলের তপোবন আশ্রিত শিক্ষাদীক্ষার থেকে। এসব কথা তোলার অর্থ হলো এই যে স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা ছাত্রছাত্রী আন্দোলন করেছিলেন তাঁদের ত্যাগ ও ব্যথার কথা মনে করিয়ে দেওয়া। আজকাল আমরা যাঁদের দেশ বরেণ্য বলে খানিকটা পুজো করি, কুলঙ্গিতে তুলে উচ্চকোটিতে স্থান দিই তাঁরা কিন্তু ছিলেন সেযুগের রক্তমাংসের মানুষ। কতটা রক্তমাংসের মানুষ তা অনুমান করা যায় যদি ঐ প্রমীলা গুপ্তর ঢাকা কলেজের সহপাঠিনী ও রুমমেট প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দারের শেষ পত্র পড়া যায়। এ বিষয়ে তনিকা সরকারের "পলিটিকস অ্যান্ড উইমেন ইন বেঙ্গল—দ্য কণ্ডিশনস অ্যান্ড মিনিং অব পারটিসিপেশন" (জে কৃষ্ণমূর্তি সম্পাদিত 'উইমেন ইন কলোনিয়াল ইণ্ডিয়া,' দিল্লি ১৯৮৯) প্রবন্ধে কয়েকটি কথা লিখেছিলেন যা পড়ে মনে হয় এই পত্রটি ফিরে গিয়ে পড়লে প্রীতিলতার মনের অবস্থা সম্পর্কে কিছু নতুন আলোক পাওয়া যাবে। এই জন্য মহিলা আন্দোলনের যাঁরা পথিকৃত তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজন অনেক বেশি।

ডাঃ চণ্ডীপ্রসাদ সরকার সম্প্রতি বাংলার মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তার বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা 'বেঙ্গলি মুসলিম ঃ এ স্টাডি ইন পলিটিসাইজেশন, ১৯১২-২৯' প্রকাশ করেছেন। তাতে এই রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ হয়েছে। আমরা সাধারণত স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে মুসলিমদের হয় কংগ্রেসের সমর্থক নয়তো কংগ্রেস বিরোধী হিসেবে সহজ দুটি সাম্প্রদায়িক ভাগে বিভক্ত করে ফেলি। এর চেয়ে ভুল বিভাজন আর কিছু নেই। উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম সমাজের মধ্যে যেমন সাম্প্রদায়িক শক্তির উন্মেষ হয়েছিল, দ্বিজাতি-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাও হয়েছিল, তেমনি বাংলায় কিছু মনীষী এবং সাহিত্যিক জন্ম নিয়েছিলেন যাঁরা ছিলেন যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন এবং

অসাম্প্রদায়িক। এঁদের মধ্যে মীর মোসারফ্ হোসেন বা বঙ্গভঙ্গ যুগের ব্যারিস্টার আবদুর রসুল স্বনামধন্য। যদিও আব্দুর রসুল বা 'দি মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক মুজিবর রহমান কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন এবং সাংবাদিক মুজিবর রহমান অহিংস সত্যাগ্রহের জন্য কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেল হাজতে বাসও করেছিলেনে। ত র ডায়েরি প্রকাশ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য আবুল ফজল। এই ধরনের মনন ২০-৪০-এর দশকে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের রাজনীতি ছাড়াও কম্যুনিস্ট আন্দোলনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল এবং ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্ব এক সময় শ্রেণীবন্ধ হয়েছিল। সিরাজ-উদ্-দৌলা বিদ্বেষী ডালহৌসি স্কোয়ারে জি. পি. ও-র বিপরীতে স্থাপিত হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের আন্দোলনের সময় থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও নৌ-বিদ্রোহ সম্পর্কিত আন্দোলন উত্তাল করে তোলে ১৯৪৫-৪৬-এর ছাত্র সমাজকে। ঐ বিষয়েও অধ্যাপক সরকার বেশ কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন।

স্বাধীনতা-পূর্ব দশকে ছাত্র আন্দোলনরত বাঙালি ছাত্রসমাজের ইতিহাসের গল্পটি তুলে ধরেছেন অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়। বাংলার বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বিশেষ করে যুব সমাজের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার ইতিহাস লেখায় তিনি পথিকৃৎ। এ বিষয়ে তিনি যে মৌলিক গবেষণা করেছেন তারই একটি অংশ পরিবেশিত হয়েছে।

একটা কথা আজকের দিনে আমাদের মনে রাখা দরকার যে সেযুগের কমিউনিস্ট আন্দোলন যতটা প্রসার লাভ করেছিল কলকাতায় বা ঢাকায় তার চেয়ে অনেক বেশি প্রসার পায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সাম্প্রদায়িক শক্তি। সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদও বাংলার জেলায় জেলায় দেখা গিয়েছিল ৪২-এর কংগ্রেস আন্দোলনের পর। যখন মেদিনীপুরে কুখ্যাত আই. সি. এস. এবং আই. পি এস. সমর সেন ও খওয়াজা মহম্মদ কায়সর মুসলমানদের প্ররোচিত করেছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে। সে জেহাদে জনগণ যোগ দেয়.ন অথচ নেতৃবর্গে র মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা যে বেড়ে গিয়েছিল সে কথা অনস্বীকার্য। ১৯৪৬-এর মারাত্মক কলকাতার হত্যাকাণ্ড এরই ফলশ্রুতি যেমন ছাত্র সমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নিদর্শন প্রচুর ও স্মরণীয় তেমনি কোন জমিতে সাম্প্রদায়িকতা রোপন করা যায় সে বিষয়েও চেতনার প্রয়োজন, যদি আজকের ছাত্র সমাজে সাম্প্রদায়িকতাকে নিরঙ্কুশ করতে হয়।

এই তো গেল ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক দিকটা। এই রাজনীতির মধ্যে অনেক সময় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজনগুলি প্রধানরূপে ধারণ করেছিল। তবে এই দিকটাই যে মুখ্য ছিল সেটা ভাবা ঠিক হবে না। ছাত্রদের আন্দোলনে ছাত্রবৃত্তির প্রয়োজনগুলি সবসময় মুখ্য না হয়ে উঠলেও

অনেক সময় ছাত্রনেতাদের মননের মধ্যে লক্ষিত হয়েছে। ছাত্রআন্দোলনে শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখেছেন ডঃ মঞ্জু-চট্টোপাধ্যায়। তিনি আধুনিক বাংলায় সম্পূর্ণ যুগটা পটভূমিকার মধ্যে রেখেছেন, শুরু করেছেন ডিরোজিও উত্তর যুগ, উপসংহারে মাতৃভাষা এবং পাঠক্রমে সংস্কার আন্দোলন যা বর্তমানেও জীবন্ত রয়েছে। এই চিন্তা-ভাবনার প্রগতিশীল দিকটা নিয়েই লিখেছেন মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়। প্রগতিবাদী ছাত্ররা ছাড়াও অনেকে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি, পাঠ্যতালিকা এবং পুরাতন ঐতিহ্য রক্ষণ নিয়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন। যেমন সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যুক্তিবাদের প্রশ্ন তুলে ধরেছিলেন, তেমনই সংস্কৃত শিক্ষাকে জীবন্ত রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। মধ্যযুগীয় মাদ্রাসা প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যেও নিশ্চয় প্রগতির প্রচেষ্টা করেছিলেন নবাব আবদুল লতিফের উত্তরসূরীগণ। পুরাতন ভাষাগুলির শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যে চর্চা চিন্তা হয়েছে তার বিষয়েও প্রচুর গবেষণার অবকাশ রয়েছে এবং তাতে ছাত্রসমাজের কী চাহিদা ছিল তার বিষয়ে তথ্য পরিবেশনের প্রয়োজন। এ বিষয়ে অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ সম্পাদিত ১৭৫৭ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে স্বর্গীয় ডঃ রমেশচন্দ্র মিত্রর প্রবন্ধ ভিন্ন তেমন কোনো গবেষণামূলক কাজ করা হয় নি। তেমনই কাজ হয় নি বামপন্থী ছাত্র সংস্থা ভিন্ন অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠগুলির শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের বিষয়ে ধ্যান-ধারণা নিয়ে। শ্রীরণজিৎ রায় এর রাজনৈতিক দিকের প্রথম পর্ব নিয়ে কিছুটা লিখেছেন। ১৮৮৫ সালের হাণ্টার কমিশন, ১৯০৪ সালের র‍্যালে কমিটি, ১৯১৮ সালের স্যাডলার কমিটি ইত্যাদিতে যেসব জবান বন্দী আছে তার মধ্যে ছাত্রদের বিষয়ে কী আছে তা নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন। তেমনই প্রয়োজন কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সমাজবাদী দল, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল, বিপ্লবী কমিউনিস্ট দলের চিন্তা ভাবনার তালিকা সংগ্রহ করা এবং শিক্ষানীতির বিষয়ে আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তাদেরও যথার্থ স্থান দেওয়া। এই ধরণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিবরণের পথপ্রদর্শন করেছেন ডঃ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে।

এইসব বিষয়ে এই পুস্তিকার লেখকেরা আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন, আমরা তাঁদের ধন্যবাদ জানাই এবং আশাকরি, বাংলায় ছাত্র আন্দোলনের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ, মফঃস্বল এবং গ্রামীণ সমাজে তার বিস্তার বা বিকল্প প্রকরণ এবং সমাজ সংস্কার ও উন্নতির সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের যোগা-যোগ বিশেষ করে সাধারণ শিক্ষার বিষয়ে ছাত্রসমাজের চিন্তা ভাবনা বিষয়ে আরও তথ্য ইতিহাস সংসদ আগামী যুগে পরিবেশন করতে পারবে।

বরুণ দে

# স্বদেশী থেকে আইন অমান্য : 'রাজ'-এর বিরুদ্ধে বাংলার ছাত্র-সমাজের সংগঠিত বিক্ষোভ

**রঞ্জিত কুমার রায়**

রাজনীতি এমন একটি বস্তু যার এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে। আর এই শক্তির অমোঘ আকর্ষণে ছাত্রসমাজ স্বেচ্ছায় তাদের প্রাণ উৎসর্গ করতে অগ্রসর হয়—ফলস্বরূপ রচিত হয় ইতিহাস। একথা আজ সুস্পষ্ট এবং সুবিদিত যে সারা বিশ্বে ছাত্রসমাজ এক সক্রিয় ভূমিকায় রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের এই ভূমিকা আকস্মিক নয়। অনেক অনেক বছরের নিরলস প্রচেষ্টায় তারা প্রগতিশীল আন্দোলনের অগ্রভাগে থেকে শিক্ষা লাভ করেছে। আমাদের যুগের, বিশেষত আধুনিক কালের ইতিহাসের পরিবর্তন সাধনের জন্য যুব ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা বহুলাংশে সুস্পষ্ট। অল্প বয়সে রাজনীতির বীজ তাদের চিন্তা-চেতনায় প্রবিষ্ট হয়েছে। কালক্রমে রাজনীতির সেই বীজ বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়ে সমগ্র ছাত্রসমাজকে এক বলিষ্ঠতা দান করেছে—তাদের সহযোগিতা ছাড়া দেশ গঠনের কথা আজ ভাবা যায় না। কিন্তু ছাত্রসমাজ তাদের ক্রিয়াকলাপ আজ নির্বিঘ্নে জনমানসে উপস্থিত করতে পারছে না, ফলস্বরূপ বলা যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারী শক্তি—দুই মিলে তাদের কাজের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তাদের আদর্শকে দলিত-মথিত করবার জন্য উক্ত দুই ভিন্ন শক্তি আজ বদ্ধপরিকর। কিন্তু এতে ছাত্রসমাজ দমবার পাত্র নয়—বরং তারা দ্বিগুণ উৎসাহে কর্তব্যকর্মে মেতে উঠেছে।[1]

বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি-লগ্নে একবিংশ শতাব্দীর আহবান আজ প্রতিটি মানুষের কাছে এক নতুন পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষমান। তাই সেই পথে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে ছাত্রসমাজের এই উত্থান নতুন করে পুনর্মূল্যায়ণের অপেক্ষা রাখে। সম্প্রতি বেজিং-এ তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারের ঘটনাবলী বর্তমান যুগে ছাত্রসমাজের রাজনীতিগত ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা প্রমাণ করেছে। কিন্তু ছাত্রসমাজের রাজনীতিতে সক্রিয় পদার্পণের উৎস জানতে হলে ইতিহাসের মূল সন্ধান করা প্রয়োজন।

তৎকালীন ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রসমাজ। ইতালীর ম্যাটসিনি এবং

গ্যারিবল্ডির মত ব্যক্তিত্ব তাদের স্বাধীনতাস্বপ্নের আগুনকে রাঙিয়ে তুলেছিল। তাদের চিন্তাধারা প্রসারিত হয়—দেশের স্বাধীনতা তাদের ধ্যান-জ্ঞান ও কল্পনার একমাত্র বিষয় হয়ে উঠে। অপরাপর উন্নয়নশীল দেশগুলির মতো দেখা যায় যে এদেশের স্বদেশী আন্দোলনেও তাদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পরাধীন ভারতে শুধুমাত্র আদর্শের প্রেরণায় তারা স্বাদেশিকতার প্রেমাগ্নিতে মাতোয়ারা হয়নি। দেশের অর্থনৈতিক অবনতির ফলস্বরূপ চাকুরীর ক্ষেত্র ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসে। এই অবস্থায় ছাত্রসমাজ দিশাহারা হয়ে পড়ে। ক্রমশঃ তারা বৃটিশ শাসনাধীন পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর আস্থা হারায়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই তরুণ সম্প্রদায় মনে করেছিল যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লে নিজেদের এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। Frank Pinnes-এর মতে ছাত্রসমাজকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—একদল সমাজের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর, অপরদল রক্ষণশীল—তারা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সাথে নিজেদের মানিয়ে নেয়।[2] প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ছাত্রসমাজের পক্ষে এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রায় অসম্ভব ছিল। সেই সময় জাত-ধর্ম নির্বিশেষে যুব সমাজ একত্রিত হয়ে রাজশাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব এদেশের জনমানসে দৃঢ় মূল স্থাপন করে। পশ্চিমী দুনিয়ার চোখ-ধাঁধানো আলো ছাত্রসমাজের জ্ঞানতৃষ্ণাকে আরও জাগ্রত করে। ফলে কোন রকম বিচার-বিবেচনা না করেই তারা পাশ্চাত্য হুজুগে মেতে উঠে—যা কিছু ভারতীয় ঐতিহ্য তাকে বিসর্জন দেওয়াই এই হুজুগে ছাত্রসমাজের প্রথম কর্তব্য ছিল। পরে মোহলাভের মোহভঙ্গ শুরু হয়। ভারতীয় ঐতিহ্যের সনাতন রীতির প্রতি তাদের তীব্র আকর্ষণ বেড়ে ওঠে। ফলে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য—নতুন এবং পুরাতনের মধ্যে এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটে যায়। আর এটা সম্ভব হয়েছিল কয়েকজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের দূরদর্শিতায় এবং প্রচেষ্টায়—এঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য এবং স্মরণীয়। এই সমস্ত মনীষীবৃন্দ ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির অমৃত মন্থন করে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। তাঁরা ভারতীয় সনাতন মূল্যবোধের ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে যুক্তিবাদী, নিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল এক নতুন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। এই নবজাগ্রত বলিষ্ঠ ভারতের আদর্শবাণী ছিল স্বনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হওয়া। বাংলার দুই কৃতি সন্তান—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জাতিকে এক চরম সার্থকতার শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সৃষ্টি করেছিলেন এক নতুন যুগের। আর সেই জন্যই আমরা দেখতে পাই যে ভারতীয় জাতীয়

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই এই বাংলাদেশ ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠে।[3]

উনিশ শতকের শেষ ভাগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে দিয়েই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার সুযোগ পায়। ইলবার্ট বিল, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর গ্রেপ্তার ও কারাবরণের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শনে এবং আন্দোলনে ছাত্রসমাজ বিশেষ ভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রথম দিকে এই ছাত্র-সমাজ সরাসরি কংগ্রেসের সাথে যুক্ত না থাকলেও তারা কংগ্রেসের প্রতিটি কাজের ওপর তীক্ষ্ন নজর রাখত। তারপর শ্রীঅরবিন্দের এবং অনুরূপ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের আবির্ভাবের পর ছাত্রসমাজ সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন 'অনুশীলন সমিতি' এবং 'যুগান্তর' দলের এরা ছিল প্রধান স্বেচ্ছাসেবক। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ছাত্রদের সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গিয়েছিল লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-ঘোষণার পর। এই প্রথম সমস্ত ছাত্রসমাজ দলবদ্ধ হয়ে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। এই ভাবে ভারতবর্ষের রাজনীতির মঞ্চে এক অতীব শক্তিশালী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এদিকে মধ্যপন্থী কংগ্রেস সদস্যদের টালবাহানার ফলে ছাত্র আন্দোলন হিংসার পথ গ্রহণ করে।[4] কিন্তু আমার বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান ধারায় ছাত্র-সমাজের ভূমিকা খতিয়ে দেখা— অতএব এই প্রবণতা নিয়ে বিশদ আলোচনা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে যখন একঘরে করা হল, তখন রাজনীতির উত্তপ্ত আবহাওয়া থমথমে হয়ে উঠল। এরপর ১৯০৫ সালের ৫ই আগস্ট এলবার্ট হলের ঐতিহাসিক সভায় একটি তহবিল চালু করা হয়। এই তহবিলের লক্ষ্য ছিল, যে সমস্ত ছাত্র ইউরোপীয় লোকের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিয়ে স্বদেশী শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে যোগদান করবে তাদেরকে এই তহবিল থেকে সাহায্য করা। তৎকালীন সংবাদপত্র ১৮ই জুলাইয়ের 'সন্ধ্যা' ও ২৩শে জুলাইয়ের 'প্রতিজ্ঞা'তে একটি স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আহবান জানানো হয়।[5]

এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'রাখীবন্ধন' উৎসব করেন এবং তার প্রেরণায় ছাত্রসমাজ সদলবলে এই উৎসবে মেতে উঠে। ক্রমশ এই ছাত্র আন্দোলন এতই তীব্র হয়ে ওঠে যে সরকার পুলিশের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়। ২১শে অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ ও পেডলার চিঠির বিরুদ্ধে ছাত্ররা ঢাকা সরকারী কলেজে খালি পায়ে ক্লাসে আসে। এদিকে হ্যারিসন রোডে ছাত্র-পুলিস সংঘর্ষ বাধে। সরকার ছাত্রদের

যে শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল তার প্রতিবাদে একটা বিধ্বংসী ঝড়ের পূর্বাভাস এই প্রথম দেখা গেল।[6]

'কার্লাইল সার্কুলার'-এর নির্দেশ ছিল সেই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে যারা ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে বিফল ছিল। সেই সাথে হুমকি দেওয়া হয়েছিল যে সমস্ত রকম বৃত্তি ও অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হবে। পূর্ববঙ্গে লিয়ন সার্কুলার 'বন্দে মাতরম্' নিষিদ্ধ করে দেয় এবং আদেশ জারি করে যে, আদেশ অমান্যকারী শিক্ষাকেন্দ্রগুলির ছাত্রদের সরকারী চাকুরী দেওয়া হবে না। ফলস্বরূপ ক্রমপর্যায়ে বিক্ষোভ শুরু হয় ও সকলে মিলে সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বয়কট করে।[7] 'কার্লাইল সার্কুলার'-এর উপযুক্ত জবাব হিসেবে একটি স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে অনেকে বক্তব্য রাখেন—এঁদের মধ্যে আব্দুল রসিদ, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন উল্লেখযোগ্য।[8] এই সময় প্রায়শই ছাত্রসমাবেশ হত। ৪ঠা নভেম্বর কলেজ স্কোয়ারে প্রায় ৫০০০ ছাত্র মিলিত হয় এবং বাংলাদেশের প্রথম ছাত্র সংস্থা—'অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত[9] হয় এবং তারপরেই নেতৃস্থানীয় সদস্যারা রংপুরে গিয়ে বহিষ্কৃত ছাত্রদের জন্য একটা স্কুল খোলেন।[10] কলকাতাতেও বহিষ্কৃত ছাত্রদের জন্য একটি স্কুল খোলা হয়।[11] এর জন্য সুবোধচন্দ্র মল্লিক মুক্তহস্তে এক লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁর এই বদান্যতার জন্য তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে সম্মান জানানো হয়। এইভাবে অনেক সমৃদ্ধিশালী জমিদারের সাহায্যে নবগঠিত স্বদেশী স্কুলগুলি পরিচালনা করার জন্য ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন' স্থাপিত হয়।[12]

বাংলার ছাত্রসমাজ 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে গর্জে ওঠে—অমানুষিক অত্যাচারে জর্জরিত হল তারা। স্বদেশী স্কুলগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান সার্থকতা ছিল ছাত্র সমাজের এই সংগঠিত বিপ্লব। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রথম সব সময়ের 'ক্যাডার' শক্তি দিয়ে রাজনীতি চালনা করা সম্ভবপর হল।[13] বরং এটাই বলা উচিত যে স্বদেশী আন্দোলনের সফলতার পিছনে ছিল বাংলাদেশের ছাত্রদের অশ্রুজল-মিশ্রিত স্বার্থত্যাগ। এই আন্দোলন যদিও ছিল শান্ত অহিংস প্রকৃতির, তবুও মাঝে মাঝে এই তরুণ গোষ্ঠী হিংস্র হয়ে উঠত। তাদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সক্রিয় তাঁরা বিপ্লবী দলগুলি বলিষ্ঠ করার জন্য লোকচক্ষুর আড়ালে রইলেন। বৃটিশ সার্কুলার-এর বিরুদ্ধে যাঁরা সরব ছিলেন তাঁরাই পরবর্তীকালে বিপ্লবী নামে পরিচিত হলেন।[14] এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সোসাইটির একজন প্রতিষ্ঠাতা শচীন্দ্রনাথ বসু—তিনিও অনুশীলন দলের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯১১ সালে সরকার যখন

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নাকচ করে দেয়, তখন ছাত্র আন্দোলনের এই অধ্যায়টি তখনকার মত শেষ হয়। এরপর ১৯১১-১৮ সাল পর্যন্ত দেখা যায় যে এই ছাত্র আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে এলেও ছাত্ররা মাঝে মাঝেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। এরপর গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার ছাত্রসমাজ দলে দলে যোগদান করে।

গান্ধীজীর এই অসহযোগ আন্দোলন বৃটিশ শাসনাধীন ভারতে ছাত্রদের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের একেবারে কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসে। গান্ধীর আহ্বানে ছাত্রসমাজ যে বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিল সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তেণ্ডুলকর লেখেন—অসহযোগিতার প্রথম ফুল ফোটে বাংলায়। এমন কি জানুয়ারী মাস থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আবেদনে তিন হাজার কলেজ-ছাত্র ধর্মঘট শুরু করে। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী স্কুল যাওয়া বন্ধ করে। এই সময় গান্ধীজী এদের উদ্দেশে বলেছিলেন—"I had expected no less; I certainly expect still more."

"বুদ্ধি ও ধৈর্যের দিক দিয়ে বাঙালী জাতি গৌরবের অধিকারী। বাংলাদেশ তাই বিশেষভাবে ভারতীয় আধ্যাত্মিক শক্তির উত্তরাধিকারী। ভারতের অন্যান্য স্থানের চেয়ে এখানকার মানুষের কল্পনাশক্তি, বিশ্বাস ও মনের আবেগ অনেক বেশি। গান্ধীজীর ধারণায় এটা বদ্ধমূল হয়েছিল যে এই বাঙালী জাতি সুনিশ্চিতভাবেই কাপুরুষতার অভিযোগকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে পেরেছে। তাই তাঁর মতে বাংলা যে কোন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা বা যোগ্যতা রাখে।"

গান্ধীজী প্রথম সুযোগেই কলকাতায় এসে বাঙালীদের উৎসাহকে বাড়িয়ে দেন। তিনি এখানে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী 'ন্যাশনাল কলেজ' উদ্বোধন করেন।[15] সেই প্রচুর পরিমাণে স্বদেশী ছাত্র তাদের ক্লাস বয়কট করে। এই ধর্মঘট উত্তরে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং দিনাজপুর বাদে সর্বত্র ব্যাপকতা লাভ করে।[16] ছাত্রদের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ লক্ষ্য করে দেশবন্ধু এদের সম্বোধন করে বলেছিলেন—"ছাত্রগণ! আমি তোমাদের কাছে মাথা নত করব।[17]

এই আন্দোলনের বিশেষ কার্যকরী বৈশিষ্ট্য ছিল ছাত্রদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বয়কট করা। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন ১,০৩,১০৭ ছাত্রসংখ্যার মধ্যে ১১,১৫৭ জন ছাত্র সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বয়কট করছে।[18] ধীরে ধীরে দেখা গেল ছাত্ররা স্বেচ্ছাসেবক দলে এগিয়ে এসে বিভিন্ন প্রচারকার্য, পিকেটিং ও হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে তাদের কার্যধারাকে আরও প্রসারিত করছে। রাজাকে লিখতে গিয়ে রোণাল্ডশে বলেছিলেন, যে গ্রামগুলিতে বিভিন্ন ধরণের কুফল দেখা দেয় ছাত্রদের বিভিন্ন আন্দোলন ও প্রচারে যুক্ত করার জন্য।[19] ১৯২১

সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী ডিউক অব কনট্ বোম্বাইয়ে যখন অবতরণ করেন তখন তাকে দেশজুড়ে হরতালের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যার অনেকাংশের নেতৃত্ব দিয়েছিল তৎকালীন ছাত্রসমাজ। আবার ঐ একই বছরের শেষ দিকে প্রিন্স অব ওয়েলস্-এর কলকাতায় আগমনের বিরুদ্ধে হরতাল ডাকা হয়। অনেকে আবার গ্রামে গিয়েও প্রচারকার্য চালাতে শুরু করেছিলেন। এই সমস্ত গ্রামীণ সাধারণ মানুষকে তারা কতখানি প্রভাবিত করতে পেরেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ফেব্রুয়ারী মাসে পাটচাষীদের পাট চাষ বয়কট করার মধ্য দিয়ে।

১৯২১-এর মার্চ মাস নাগাদ রাজনৈতিক উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ছাত্রসমাজ রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তাদের চিহ্ন অঙ্কিত করে দিয়েছিল। এর জন্য অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রদের বহিষ্কার করা হয়েছিল। অনেকে কারাবরণ করেছিল। আসলে এই সময়টা ছিল অনেকের কাছে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব। যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তী কালে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সুস্পষ্টভাবে স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্রসমাজের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলে। এই আন্দোলনে যে ভাটার টান ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছিল তা কিন্তু উৎসাহের অভাবে নয়, আসল গলদ ছিল সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায়। আন্দোলনের পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও পরিচিতি না থাকা সত্বেও ছাত্রসমাজ যে সাহস ও দায়িত্বের সাথে নিজেদের পরিচালনা করেছিল তা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। পরবর্তী পর্যায়ে নব সংগঠিত সভার কাজ পুর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। ১৯২২ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে বিভিন্ন ছাত্রদল গঠিত হয়, যারা রাজনৈতিক আন্দোলনে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। এদের দ্বারা গোটা দেশ প্রভাবিত হয়েছে। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, তৎকালীন বৃটিশ শাসনাধীন ভারতে রাজনীতির এক নতুন পর্ব সৃষ্টি হয়েছিল যার পুরোধা ছিল ছাত্রসমাজ। এতদিন পর্যন্ত এই ছাত্রসমাজ কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাজির হত। এবার তারা পুর্ণ সাহস এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগিয়ে সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দিল।

১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনে গোটা দেশ জুড়ে হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 'সাইমন কমিশনের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সর্বত্র কালোপতাকা দেখানো হয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলাদেশের ছাত্রসমাজও এই কাজে অংশগ্রহণ করে। এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী অমরেন্দ্র রায় যিনি পরে অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য হয়েছিলেন, তিনি তার স্মৃতিচারণে লিখেছেন—"আমাদের সমকালীন ইতিহাসে ৩রা ফেব্রুয়ারী এক স্মরণীয় দিন। সাইমন সহ অন্যান্য সদস্যগণ বোম্বেতে

অবতরণ করার দিন থেকে সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কলকাতার ছাত্র সম্প্রদায় এই ডাকে সাড়া দিয়ে হরতাল পালন করে। কলকাতার হরতাল সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল।"[20]

এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার কিছুদিন আগে ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস। কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ ঘোষাল দেশের স্বাধীনতার জন্য যুব সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তোলায় বৃটিশ শাসনকর্তারা অসন্তুষ্ট হয়। সাইমনকে ফিরে যাবার কথাও তিনি বোলেন। শুধু তাই নয়, তেরঙ্গা ব্যাজ পরা ও 'বন্দে মাতরম্' গান গাওয়ার জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নিজেদের আরো অপমানিত মনে করে। তারা ক্রুদ্ধ হয় এবং এর প্রতিশোধ নিতে ১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী ছাত্ররা যখন হরতাল পালন করে তখন সরকারী পুলিস বাহিনী প্রমোদ ঘোষাল সহ অনেক ছাত্রকে নির্মমভাবে প্রহার করে।[21] ছাত্রদের এই কর্মসূচী শুধুমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গোটা বাংলাদেশের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় 'সাইমন কমিশনে'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। বেথুন কলেজ, (যেখানে মেয়েরা প্রথম হরতালে যোগ দেয়।) মুরারীচাঁদ কলেজ, শ্রীরামপুর কলেজ ও হুগলি কলেজের পরিস্থিতি হয় গুরুতর। এ প্রসঙ্গে অমরেন্দ্র রায় বলেন যে, তিনি একজন-দুজনের কথা বলছিলেন না—৩রা ফেব্রুয়ারী হাজার হাজার ছাত্র যোগদান করে। সবাই একত্রিত এবং সংগঠিত হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। এক স্বতঃস্ফূর্ত আবেগই ছিল সেই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য।[22]

এর আগে যে এরকম ঘটনা ঘটেনি তা নয়, তবে এবারের ঘটনায় এটাই বার বার বোঝা গিয়েছিল যে বাঙালী ছাত্রসমাজ কোন বাধা মানতেই রাজি ছিল না। এদের অনেকেই সচেতনভাবে জানত যে ৩রা ফেব্রুয়ারী ছিল বিরাট এক কর্মযজ্ঞের প্রস্তুতিপর্ব মাত্র।

প্রমোদ ঘোষাল ও অন্যান্য ছাত্রদের অশোভন আচরণের (!) অভিযোগে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। ঠিক একইভাবে স্কটিশ চার্চ কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা শচীন মিত্রকে বরখাস্ত করে। এর প্রতিবাদ জানাতে ১৯২৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার সমস্ত কলেজের ছাত্ররা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। প্রেসিডেন্সী কলেজ, স্কটিশ চার্চ ও যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির নেতৃত্বে বাংলাদেশের ছাত্রগোষ্ঠী এ্যালবার্ট হলে 'প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্টস কনফারেন্স' নামে এক সমাবেশের আয়োজন করে। গোটা বাংলাদেশে ছাত্রদের একটা সঙ্ঘের আয়ত্তে আনার প্রস্তাবটি এখানে এক নির্দিষ্ট রূপ নেয়। পরবর্তী মার্চ মাসে দ্বিতীয় 'অল ক্যালকাটা স্টুডেন্টস্'-এর অধিবেশন বসে। নেহরুর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত চারদিন ব্যাপী

দীর্ঘ আলোচনা সভার পর এই সংস্থাকে পূর্ণরূপ দেওয়া হয়।[23] অবশেষে 'অল বেঙ্গল স্টুডেণ্টস অ্যাসোসিয়েশন' সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত কাজের পূর্ণ দায়িত্বে ছিল বাঙালীরা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে প্রথম তিনটি শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী ছিলেন প্রমোদকুমার ঘোষাল, শচীন্দ্রনাথ মিত্র এবং যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। অ্যাসোসিয়েশন-এর সংবিধান গঠন করা হয়েছিল কংগ্রেস সংবিধানের অনুকরণে। ১৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি সেণ্ট্রাল কাউন্সিল-এর কার্যকরী কমিটি ছিল। এ. বি. এস. এ. বাংলা ছাড়া আসামের সিলেট, কাছাড়, বিহারের মানভূম (যেখানে বাংলা ভাষার প্রচলন ছিল) অঞ্চলগুলিতেও প্রসারিত হয়। ১৯২৯-এর প্রাদেশিক শাখা অথবা 'ডিস্ট্রিক্ট স্টুডেণ্টস অ্যাসোসিয়েশন'-এর সংখ্যা ১৫ থেকে ১৯৩১-এ ২৯-এ দাঁড়ায়।

সরকারের নজর ও প্রতিক্রিয়া এড়াবার জন্য অ্যাসোসিয়েশন সমাজ সেবা, গ্রাম উন্নয়নমূলক কাজ, শরীর-চর্চা শিবির ও সাহিত্যচক্র ইত্যাদি গৌণ উদ্দেশ্যগুলিকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করিয়ে তাদের আসল আদর্শকে আড়াল করে রাখত।[24] স্বাদেশিকতা সম্পর্কে মতামত পেশ করার ব্যাপারে ছাত্ররা খুবই সতর্ক ছিল। এমন কি 'রিসেপশন্ কমিটি'র সম্বর্ধনায় বক্তৃতা দেবার সময় প্রমোদ ঘোষাল অস্বীকার করেন যে, সাইমন কমিশন-এর বিরুদ্ধে এ. বি. এস. এ.-র ছাত্ররা যে হরতাল ডেকেছিল তার পিছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু নেতারা তাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকা গোপন করতেন না। ১৯২৮-এর বক্তৃতায় নেহরু বলেছিলেন—তোমাদের আদর্শ পরিষ্কার-ভাবে বুঝে নিতে হবে—তা না হলে স্বপ্নরাজ্যকে কি করে বাস্তব রূপ দেবে?[25] এই অধিবেশনের যে প্রস্তাবগুলি ছিল তা হল—১) খেয়াল খুশীমত সরকার কাউকে বন্দী করতে পারবে না, ২) স্বদেশে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার ও প্রসার, ৩) সাইমন কমিশন-এর তীব্র নিন্দা। ১৮ বছরের ঊর্ধে ছাত্রদের কংগ্রেসের তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য ডাক দেওয়া হয়।[26]

১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালীন এ. বি. এস. এ.-র এক রাজনৈতিক কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। কেউ সদস্য হিসেবে যোগদান করে, কেউ বা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আয়োজিত স্বেচ্ছাসেবক সংস্থায় দলভুক্ত হয়। অনেক আশা নিয়ে ছাত্রদের স্বার্থরক্ষা করার উদ্দেশ্যে এ. বি. এস. এ.-র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজ ও রাজনৈতিক ধারা অনুযায়ী এই সংগঠন অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গোষ্ঠীকোন্দলের শিকার হয়। কর্মকর্তারা এক নব পরিচিত ছোট দলের সম্মুখীন হয়। সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে এই নতুন দলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইতিমধ্যে এ. বি. এস. এ.-র পরিচালকবর্গ আকৃষ্ট হয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের প্রভাবে।

১৯২৯-এ সালের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের অধিকাংশ বোসকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু অপর পক্ষের কঠোর বিরোধিতা সত্ত্বেও সেনগুপ্তের সমর্থিত দল গান্ধীবাদী লেবর-এর ডঃ মহম্মদ আলমকে সভাপতি করেন। থমথমে পরিবেশে অধিবেশন শুরু হয়। দ্বিতীয় দিনে যখন বোসের সমর্থকরা চরম পন্থা কার্যকর করার জন্য সংবিধান পুনর্গঠন করার দাবি জানালেন তখন তুলকালাম কাণ্ড বেধে গেল।[27] পরিচালক মণ্ডলী আস্থা ভোট নিতে যাবার মুখেই সভাপতি তাড়াতাড়ি অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।[28] ১৯২৯-এর ৭ই ডিসেম্বর বোসের বিক্ষিপ্ত সমর্থকেরা 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' নামে এক নতুন সংঘ গঠন করেন। মূল সংগঠন খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিল, ফলে প্রতিপক্ষীয়দের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়েছিল।[29]

প্রথম থেকেই দুটি সংস্থার মধ্যে বিরোধ স্পষ্টরূপে দেখা দিয়েছিল। লেবর কংগ্রেস অধিবেশনের ঠিক আগে বোসবাবু তাঁর শক্তির পরিচয় দেবার প্রয়াসে সারা প্রদেশ জুড়ে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিলেন। এ. বি. এস. এ. শুধু বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হল না—বোসের এই অভিপ্রায়ের নিন্দা করে তারা বলল যে এর পিছনে তাঁর সুপরিকল্পিত অভিপ্রায় রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হল যে, রাজনৈতিক সফলতার জন্য বোস বোধ হয় যুবশক্তিকে নিজের কাজে লাগাতে চাইছিলেন।[30] দুইটি সংস্থার মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ খুব একটা ছিল না—ছিল বোস ও সেনগুপ্তের মধ্যে ব্যক্তিগত মতের রেষারেষি। তৎসত্ত্বেও উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ করার চেষ্টা অব্যাহত ছিল। কিন্তু দুই পক্ষের একগুঁয়েমি মনোভাবের জন্য কোন প্রয়াসই সফল হয় নি। দুইটি সংগঠন যদি মিলেমিশে এক হয়ে যায় তা হলে কে ক্ষমতা ভোগ করবে এই নিয়ে শুরু হয় ঝগড়া। এ. বি. এস. এ. চাইছিল দুই পক্ষ একত্রিত হওয়ার পর কার্য পরিচালনার ভার ভোটের দ্বারা নির্ধারিত করা হোক। কিন্তু সংখ্যালঘু হয়ে যাবার ভয়ে বি. পি. এস. এ. প্রস্তাব করে যে, সভাপতি ও যুক্ত সচিবের একটি পদ সংরক্ষিত থাকবে। বি. পি. এস. এ. আরো দাবি করে যে, কোন নতুন নাম দিয়ে এক নতুন সংবিধান চালু করা হোক। তাদের মতে এগুলি মেনে না নিলে উভয় পক্ষের মিলন অসম্ভব। অপরদিকে এ. বি. এস. এ. এই সমস্ত প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহে রাজনৈতিক অসন্তোষ চরম আকার নেয়। এবারও আসন্ন সমাবেশে সভাপতি কাকে নির্বাচিত করা উচিত তাই নিয়ে শুরু হয় ঝগড়া। এ. বি. এস. এ. চাইছিল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বাধীনে ময়মনসিংহে সভা হোক। স্থানীয় বি. পি. এস.এ. সভাস্থল হিসেবে

একই অঞ্চলের নেত্রকোণা পছন্দ করল। তারা যুগান্তর দলের মাদারিপুর গোষ্ঠীর নেতা পূর্ণচন্দ্র দাসকে সভাপতি হবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ডাক্তার বিপিনবিহারী সেনচক্রবর্তী ছিলেন সেই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও কংগ্রেস সদস্য। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সেই সময় তাঁর বাড়িতে অতিথি ছিলেন। বি. পি. এস. এ.-র সমর্থকরা এই খবর পেয়ে বাড়িটা ঘেরাও করে সেনগুপ্তকে অধিবেশন যাবার পথে বাধা দেয়। ময়মনসিংহ অধিবেশনের কর্মকর্তারা প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নেত্রকোণা অধিবেশনের নির্বাচিত সভাপতিকে কলকাতা থেকে অধিবেশনে যাবার পথে আটক করে। সেনগুপ্ত গোষ্ঠীর শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের সুপারিশের ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।[31] এর পর এই দুই সংগঠনের বিবাদ নিয়ে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। বি. পি. এস. এ.-র এরপর কি হয়েছিল তা আমাদের অগোচরে। আইন অমান্যের অগ্রভাগে ছিল সেনগুপ্তর নেতৃত্বাধীন বেঙ্গল সিভিল ডিসওবেডিয়েন্স কাউন্সিল। বোসের পরিচালনায় বি. পি. সি. সি. এই জন-আন্দোলনের ব্যাপারে উৎসাহিত ছিল না।[32] বি. পি. এস. এ.-র সদস্য-সংখ্যা, তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও প্রাদেশিক পরিচালক মন্ডলীর বিষয় সম্পর্কে আমরা সরকারি নথিপত্র কিম্বা সমকালীন পত্রিকাগুলি থেকে বিশেষ কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। এই থেকে এটাই বোঝা যায় যে গোড়া থেকে বি. পি. এস. এ. ছিল দুর্বল।

১৯৩০ সালে গান্ধীজী সিভিল ডিসওবেডিয়েন্স-এর ডাক দেবার আগে পর্যন্ত এ. বি. এস. এ. যতটা গর্জন করেছিল ততটা বর্ষণ করতে পারেনি। অবশ্য কোন কোন বিশেষ কিছু নির্দিষ্ট অভিযোগের বিরুদ্ধে ছাত্ররা এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত কিছু বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল—গোটা ১৯২৮ সাল ধরে সিটি কলেজ হয়ে উঠল হিন্দু ছাত্রদের প্রতিবাদের কেন্দ্রস্থল। সরস্বতী পুজোর দিনে ঘটনার শুরু।[33] রাজা রামমোহন রায় হোস্টেলে পুজো অনুষ্ঠিত হবার ফলে কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করত—মূর্তিপুজো ছিল তাদের নীতিবিরুদ্ধ। সুভাষচন্দ্র বোস ও জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জীর মত রাজনীতিবিদ ও অভিভাবকদের সমর্থনে প্রতিষ্ঠানের ভেতরে পুজো অনুষ্ঠিত করার দাবিতে দীর্ঘ আট মাস ধরে ধর্মঘট চলতে থাকে।[34]

এরপর ১৯২৯ সালে প্রেসিডেন্সী ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে হরতাল ডাকা হয়। বছর দুই আগে প্রেসিডেন্সীর ইডেন হোস্টেলে একটি ছাত্র আত্মহত্যা করেছিল। তাঁর স্মরণে এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল।[35] এই ধর্মঘটে অংশ নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ সকলের ওপর জরিমানা ধার্য করে এবং ৪০ জন ছাত্র বহিষ্কৃত করে। এ প্রসঙ্গে এ. এন. রায় ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন—আগস্ট মাসের ১৯-এর বিকেলে ইডেন হিন্দু হোস্টেলের

ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে লঘু কোলাহল করছিল। খুব স্বাভাবিকভাবে উত্তেজনা সরব হওয়াতে পাশ্বর্বর্তী আর্মি মেডিক্যাল হোস্টেলের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা আপত্তি জানায়। শুরু হয় পাল্টা বাদ-প্রতিবাদ। সেরকম কোন শারীরিক আঘাত কারো লাগেনি বা মারাত্মক রকমের কোন সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়নি। ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনায় এই র‍্যাগিং ছিল হিংস্রতা বর্জিত নিরীহ কোলাহল।[36] তবুও পরের দিন বিকেল ৬টার মধ্যে হোস্টেল খালি করার হুকুম দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়—পুলিসের ডেপুটি কমিশনার মিঃ গর্ডন পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করেন। শুরু হয় তিলকে তাল করে লঙ্কা কাণ্ড। অন্যদিকে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ২৯শে কংগ্রেস বেক্টরস্ ডে অনুষ্ঠানের পরে কিছু ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়।[37] স্বাদেশিকতার স্পর্শদোষে দুইটি বক্তৃতা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। বেশির ভাগ ছাত্ররা অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে 'নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে চুপচাপ রইল। শেষ পর্যন্ত পাদ্রীরা একজন ছাত্রকে বুঝিয়ে বক্তব্য পেশ করাতে রাজি হন। কিন্তু সহপাঠীরা চিৎকার করে তাকে থামিয়ে দেয়। এই সময় একজন পাদ্রী ছাত্রদের ধাক্কা দেন। এর প্রতিবাদ জানিয়ে অনেকে সভা ত্যাগ করে, যারা পিছিয়ে ছিল তাদের যাবার পথ আগলে দাঁড়ায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্রের দল। চড়-লাথিও শুরু হয়ে যায়। ভারতীয়রা এর প্রতিবাদ করতে গেলে হট্টগোল বেধে যায় এবং ফলস্বরূপ পুলিস ডাকতে বাধ্য হতে হয়। দুইটি কলেজের ছাত্ররা এ.বি.এস.এ-র কাছে সাহায্য চায় এবং এ.বি.এস.এ বিষয়টিতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এদিকে কর্তৃপক্ষের দৃঢ় ও একগুঁয়েমি মনোভাবের জন্য কোন আপোষ ও মীমাংসা করা সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে ছাত্ররা দলে দলে কলেজ ছেড়ে চলে যায়। কলেজে প্রায় কেউই হাজিরা দেয়নি। কলকাতার পথে পথে শোভাযাত্রা বের হয় যাতে মেয়েরাও অংশ নেয়। পরে বিকেলবেলা এক সমাবেশে ভাষণ দেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। এই সভায় উক্ত দুইটি কলেজের নীতির সমালোচনা করা হয়। ছাত্ররা কলেজ ধর্মঘট ছাড়াও ১২ই জানুয়ারী ১৯২৯-এ সাইমন কমিশন আসার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। অপর দিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর ডাকে হরতাল সফল হয়। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারী মাসের গণ্ডগোল এড়াবার জন্য বেশির ভাগ স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে। অবশ্য কয়েকটি সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা ছিল এবং এ. বি. এস.এ. কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে ছাত্ররা যাতে ক্লাসে না যায়। কলেজ স্কোয়ারে জোর কদমে পিকেটিং চলে। এদিকে সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু ও হেয়ার স্কুল-এ ক্লাস হয়নি। প্রেসিডেন্সি কলেজ আবার বিক্ষোভের কেন্দ্র হয়ে ওঠে তখনই—যখনই কয়েকজন ছাত্র সেখানে ক্লাসে যোগদান করে। এর ফলে অপর পক্ষের দলে দলে ছাত্র এসে 'বন্দে মাতরম্' স্লোগান দেয় এবং প্রেসিডেন্সি

কলেজের প্রধান ফটকে কালো পতাকা উত্তোলন করে। যদিও কোন অঘটন এক্ষেত্রে ঘটেনি। কর্তৃপক্ষ তাদের পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পেরেছিলেন যে ছাত্ররা দেশসেবার নেশায় মেতে উঠেছে।[৪৪]

এই আন্দোলনের পটভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। এটা স্বীকার করতেই হবে যে বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার আইনগত কাঠামোর মধ্যেই এই ধরনের বিশাল ছাত্র আন্দোলন সম্ভবপর হয়েছিল। যদি রাজনৈতিক ব্যবস্থা একনায়কতান্ত্রিক হত তাহলে আন্দোলন করা খুবই কঠিন অথবা একেবারে অসম্ভব হত। অবশ্য একথাও মনে রাখা দরকার যে প্রতিষ্ঠান-গুলির সাথে যুক্ত অনেক শিক্ষক ছিলেন ছাত্রদের পক্ষে। তবুও সাধারণ নিয়ম অনুসারে তারা শিক্ষাকে অবহেলা করে আন্দোলনকে অগ্রাধিকার দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পূর্ণ শিক্ষালাভের পরই ছাত্ররা সঠিক ভূমিকা নেবার উপযুক্ত হবে। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁরা ছাত্রদের রাজনীতি করার ব্যাপারে সহৃদয় ছিলেন। এই রকম একটি ঘটনা হল বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ হুইলার আন্দোলনকারীদের খোঁজে পুলিসকে কলেজ এলাকায় ঢুকতে অনুমতি দেননি। এছাড়াও জানা যায় যে, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ র‍্যামসবোথাম এক পত্রে মত প্রকাশ করেন যে, রক্তক্ষয় ছাড়া স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। মোটামুটিভাবে তারা সকলই চাইতেন যাতে ছাত্রদের পড়াশুনা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সহিংস আচরণকে সেই সময় কেউ সমর্থন করত না। তৎকালীন শিক্ষাজগতের শাসনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা যায় যে, ছাত্ররা কোনোভাবেই শাস্তি এড়াতে পারত না। একদিকে স্বদেশী আন্দোলন এবং অপরদিকে পড়াশুনা চালানো ছাত্রদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে বি. আর. খান বলেন—দৈনন্দিন গতানুগতিক পাঠ্যসূচী অনেক ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত রাজনীতিতে যোগ দেবার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় ইস্কুলের ছাত্রদের রাজনৈতিক বিশ্বাস সুদৃঢ় ছিল না। তারা বড়দের অন্ধ অনুকরণে মিছিল ও সমাবেশে যোগ দিত। সেই ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতার কোন মূল্য ছিল না। ভীড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে সস্তা চ্যাংড়ামি আর হুজুগে সবাই মেতে উঠত।[৪৫]

সুভাষচন্দ্র বোস এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মত আরো অনেক নেতা ছিলেন যারা ছাত্রদের প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন এবং তাদের সংগঠিত করে নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন। রাজনীতির কলাকৌশল তাদের ভালো রকম রপ্ত ছিল এবং সহজেই তারা সেইগুলি ছাত্রদের উপর প্রয়োগ করতে পারতেন। ছাত্রজীবনের সাথে যে সমস্যাগুলি একান্ত জড়িত ছিল (যেমন, মাইনে, পরীক্ষার টাকা, শিক্ষার ক্রমবর্ধমান খরচ ইত্যাদি) সেগুলিকে খানিকটা

গৌণভাবে দেখা হত, গুরুত্ব দেওয়া হত রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকেই। স্বদেশ প্রেমিকদের এ ব্যাপারে যুক্তি ছিল যে স্বাধীনতা কখনো অপেক্ষা করে থাকতে পারে না, কিন্তু শিক্ষা পারে। একটা বিপরীত মতও ছিল—রাজনৈতিক সামাজিক শিক্ষার কলুষতার দ্বারা শিক্ষার জগৎকে কলুষিত করতে দেওয়া উচিৎ নয়। তরুণদের উদ্দাম শক্তি দেশকে স্বাধীন করার দুর্জয় স্বপ্নে মেতে উঠল। সরকারী নথিপত্রে এদের এই প্রবণতাকে লক্ষ করে মন্তব্য করা হয়েছে ছাত্রসমাজকে উদ্দেশ্য করে কত যে বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে তাহা কল্পনাতীত। আশ্চর্য লাগে যে, সমর্থনের লোভে কতরকম ভাবে তাদের তোয়াজ করা হচ্ছে।[41]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ছাত্রদের সরিয়ে আনা ছিল বিপজ্জনক। এদিকে অর্থনৈতিক অবস্থা এতই খারাপ হয়ে পড়েছিল যে ছাত্ররা বাধ্য হচ্ছিল নিজেদের রুজি রোজগারের দিকে মন দিতে। বিশেষ করে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থা তখন খুবই শোচনীয় ছিল। তারা বুঝেছিল যে পড়াশুনা করেও চাকুরীর কোন নিশ্চয়তা নেই। সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রদের আন্দোলনে টেনে আনবার প্রয়াস সফল হয়েছে।[42] এক সময় ধারণা ছিল যে ইংরাজি শিক্ষা পেলেই ভালো চাকুরী পাওয়া যাবে। কিন্তু ক্রমে ইংরাজি জানা তরুণদের সংখ্যা বেড়ে যায় উপরন্তু অন্যান্য প্রদেশ থেকে লোক আসতে শুরু করে সরকারী ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি সকল স্থান দিতে অসমর্থ হয়। সময়টা বিংশ শতাব্দীর শুরু।[43] খাওয়া থাকার খরচা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রেও খরচা বাড়ে—শিক্ষা শেষে আয় বাড়াবার কোন পথ ছিল না। বেশির ভাগ ছাত্র বুঝতে পাড়ে যে স্নাতক হওয়ার পরেও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অপরিবর্তিত আছে। ফলে শিক্ষিত সমাজ এক জটিল আবর্তে ঘুরতে থাকে।[44] কিন্তু নেতারা এই সুযোগের পূর্ণ ব্যবহারকে কাজে লাগানোর জন্য এগিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান কনাস্টিটিউশনাল রিফর্ম-এর জয়েণ্ট কমিটি অবস্থা লক্ষ্য করে মন্তব্য করে—স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্য থেকে বাইরের লোকেদের পক্ষে আন্দোলনের জন্য কর্মী সংগ্রহ করার খুবই সুবিধে। তাদের পক্ষে পথ আরো পরিষ্কার হয়ে যায় যখন দেখা যায় ক্লাসের বাইরে ছাত্ররা কি করছে সেই ব্যাপারে শিক্ষকরা অজ্ঞ ও উদাসীন। ১৯৩০-এ ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটুটারি কমিশন-এ স্মারক লিপি পেশ করে বলে যে ইস্কুলগুলি ছাত্রদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে নজর দেয় না। তারা ছাত্রদের বোঝাতে পারে না আদর্শের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত। তার মানে স্কুলগুলি কোন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা নেই যার দ্বারা ছাত্রদের মনের নাগাল পেয়ে একতাবোধের সাড়া জাগিয়ে তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার দাবিদার হতে পারে।[45] রাজ সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের কঠিন মনোভাব ও আচরণের

জন্য অ্যাণ্ডারসন প্রাদেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এই অবস্থা যদি চলতে দেওয়া হয় এবং এর দ্রুত সমাধান না করলে কোন সুফল আশা করা যাবে না। স্মারকলিপিতে তিনি শিক্ষকদের স্বল্প বেতন সম্বন্ধে আক্ষেপ প্রকাশ করেন। মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশের তুলনায় অর্ধেক ও বম্বের চাইতে ছয় ভাগের এক ভাগ মাইনে বাংলার শিক্ষকরা পেতেন। এই প্রদেশে মাত্র শতকরা ১২জন শিক্ষক প্রশিক্ষিত। এর তুলনায় মাদ্রাজে শতকরা ৭৮ জন, পাঞ্জাবে শতকরা ৯৫ জন প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। অর্ধশিক্ষিত অসন্তুষ্ট এ শিক্ষকমণ্ডলী যে সমাজের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক তা বলাই বাহুল্য। স্কুলের ভবনগুলি ও যন্ত্রপাতির অবস্থা বেহাল ও তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল।[46]

কলকাতায় সব কলেজ ও ছাত্র কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে সমস্যা আরো জটিল হয়ে পড়ে। স্কুল ও কলেজের ছাত্র ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সময় প্রায় ১৬000 ছাত্র ছিল। এর মধ্যে চার ভাগের এক ভাগ মাত্র কলকাতায় নিজেদের বাড়িতে থাকত। বাকি সকলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে Mess অথবা Hostel-এ গাদাগাদি করে বসবাস করতে বাধ্য হত।[4] নতুন শহুরে জীবনে অভ্যস্থ হবার আগেই অনেকেই পঙ্কিল আবর্তে নিক্ষিপ্ত হত। শহরতলি ও গ্রাম থেকে আগত সহজ, সরল যুবকের দল বিভিন্ন রকম ফাঁদে ধরা পড়ত। অপরিচিত পরিবেশে তারা যে কোন রকম মানুষের কথাকে সরল মনে বিশ্বাস করত। এইভাবে হতভাগ্য যুবকের দল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে দলবন্ধ হয়ে তাদের হারিয়ে যাওয়া পারিবারিক একতাকে খুঁজে পেতে চাইত। সরকারী মতে আবেগে ভরপুর বাঙালী জাতি আত্মবিশ্বাসের অভাবে না পারে সৈনিক হতে, না পারে ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে। তাই তার রাজনৈতিক চালচলনে মনে হয় যেন সে তার হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে।[49] অবশ্য এই মত পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। যার আত্মবিশ্বাসের অভাব সে শামুকের মত নিজেকে গুটিয়ে রাখে। কিন্তু আমরা এখানে দেখছি বাঙালী ছাত্রসমাজ তাদের সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। আত্মসম্মানের ব্যাপারে ছাত্ররা ছিল খুবই সচেতন। মাতৃভূমির জন্য যথাসর্বস্ব ত্যাগ করে কাজের দ্বারা তারা নিজেদের আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী ছিল।

বাংলার ছাত্র আন্দোলন আর এক বিশেষ রূপ পায় কংগ্রেস নেতাদের বিশেষ আনুকূল্য পেয়ে। তরুণদের ভিত সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।[50] অনেক অভিভাবক স্বদেশী আন্দোলন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। যখন তাদের সন্তানরা মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ত তারা কোন আপত্তি জানাত না।[51] অবশ্য

লেখাপড়া যাতে একেবারে বন্ধ হয়ে না যায় তা তাঁরা কখনোই চাইতেন না। তাই দেখা যায় অসহযোগ আন্দোলনের সময় চিত্তরঞ্জন দাশ একমাত্র ছেলে ও স্ত্রীকে কারাবরণ করতে এগিয়ে দেন।[52] তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসী যাতে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে এগিয়ে আসে। সেই সময় চাকুরীর ক্ষেত্র ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে এবং শিক্ষার মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস পায়। রাজনৈতিক কর্মকর্তারা তাই সুযোগ পেয়ে গেলেন এই শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়কে কাছে পেতে। এই নেতাদের হঠাৎ ছাত্রদের দিকে আকৃষ্ট হবার কারণগুলি এখন মোটেই বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রথমতঃ যুব শক্তি হল ক্ষমতার উৎস। এরা সুস্থ, সবল এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। দ্বিতীয়তঃ সংসার বন্ধনহীন ছেলেরাই একমাত্র দিবারাত্র কাজে মনোযোগ দিতে পারে। তৃতীয়তঃ এই তরুণদের মন খুবই কাঁচা। তাই স্বদেশী আন্দোলনের স্বার্থ ও সুবিধে বুঝে তাদের কাজে লাগানো সহজ। তাছাড়া সেই সময় ভোটাধিকারকে কেন্দ্র করে রাজনীতি আরো প্রসারিত হয়েছিল। ফলে হাজার জন-সাধারণ এর সংস্পর্শে এসেছিল। কংগ্রেসের নেতারা ছিলেন শহরের মানুষ, তাদের চাইতে এবং ছাত্রদের সাথে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। ছাত্ররা যা পারত সমাজের অন্য কোন শ্রেণী তা পারত না।[53] কলকাতায় ২০শে সেপ্টেম্বর এক বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেস ছাত্রদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বয়কট করার আহ্বান জানায়। এর মাত্র তিন মাস পরেই ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে সব ছাত্রদের কাছে কংগ্রেস দলে নাম লেখাবার জন্য আবেদন জানানো হয়। ছাত্ররা আগেই মনস্থির করে ফেলেছিল। মাতৃভূমিকে সেবা করার সুযোগ পেয়ে তারা এও মনে করল যে এবার হয়ত নিজেদের অবস্থার উন্নতি হবে। ফলে এক বিরাট আশা নিয়ে তারা দেশসেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল।[54]

সমাজের অন্য স্তরগুলির পরিস্থিতি কিন্তু তখন ছিল অন্যরকম। ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের পারিবারিক কাঠামো মোটেই অনুকূল ছিল না। সমাজের ধাপগুলো ছিল গোঁড়া ও সনাতনপন্থী। দৈনন্দিন জীবন ধারায় এই প্রাচীন মূল্যবোধগুলি সম্পৃক্ত ছিল। ঘরের কোন ছেলে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিলে ধরে নেওয়া হত সে ছেলে না থাকারই সমান। সরকারের দমন নীতিকে বিভিন্ন পরিবার ভয় করত। অবশ্য পরবর্তীকালে দেখা যায় যে তাদের ভয়ের পিছনে যথেষ্ট কারণ ছিল। ক্রুদ্ধ রাজশক্তি আন্দোলনের গন্ধ পেলেই আন্দোলনকারীদের পৈতৃক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করত।

এই অনুকূল-প্রতিকূল জোয়ার ভাঁটার টানে ছাত্রসমাজ দুলতে থাকে। নেতা ও কর্মীদের মধ্যে ছিল নিকট সম্পর্ক। ১৯২০-২২ সালের মত এবারও

নেতারা ছাত্রদের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে আসার আবেদন জানায়। এই নেতাগণ অনুভব করলেন সামাজিক প্রশ্নগুলি না বাড়িয়ে রাজনৈতিক সমস্যাগুলি তুলে ধরাতেই বেশি সুবিধে হবে। গান্ধীর অনুকরণে সবাই বুঝতে পেরেছিল রাজনৈতিক দিকটা সবাইকে একত্রিত করবে, কিন্তু সামাজিক প্রশ্নগুলি ভাঙন ডেকে আনবে। ফলে তারা ছাত্রদের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা এড়িয়ে গেল—কারণ সমস্যার কোন সমাধান তাদের জানা ছিল না। তবে রাজনৈতিক নেতারা এটা বুঝিয়ে দিল যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেই শিক্ষা সংক্রান্ত জটগুলি আপনা-আপনি খুলে যাবে। অবশ্য বিশ্বাস ছিল যে ঔপনিবেশিক পরিবেশে শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল ও অপূর্ণ হতে বাধ্য। তাদের এই বিশ্বাসের পিছনে তেমন কোন কারণ ছিল না। রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশীয় অনেক মনীষীকেই অনুপ্রাণিত করেছে। যুক্তিবাদ ও প্রশ্নজিজ্ঞাসু মানসিকতা বাড়িয়ে দিয়ে পাণ্ডিত্যের মান বাড়ানো হয়েছিল। আর একথা অস্বীকার করা যায় না যে এই ছাত্ররাই সমকালীন ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থারই ফল।

বেশির ভাগ ছাত্রগোষ্ঠী শহর ও শহরতলির যুব সম্প্রদায়। তাই আধুনিক চিন্তাধারা বিষয়ে তারা ছিল ওয়াকিবহাল। শহরের শিক্ষিত তরুণরা অনুভব করেছিল তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবের সঙ্গে ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। ১৯২৯-৩০এ ছাত্রদের এই ব্যর্থতা এক বিরাট আন্দোলনের কাজে তাদের উৎসর্গ করতে শুরু করে। এই ব্যর্থতা পূর্ণতা পাবে কিনা সেই প্রশ্নটি তখনকার আবেগময় মুহূর্তে আন্দোলনের ঢেউয়ে চাপা পড়ে যায়।

এই ছাত্রদের নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের আর একটি সুবিধা ছিল। এই তরুণ সম্প্রদায় এবং রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক আলোচনা মঞ্চের মধ্যে এক ব্যবধান ছিল। কোথাও ছাত্রদের সরাসরি উপস্থিত থাকার দরকার হত না—নেতারাই সব কিছু মধ্যস্থতা করত। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলের ছাত্রদের রাস্তায়-রাস্তায়, সভা, বিক্ষোভ, বয়কট ও পিকেটিং নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হত। নীতি-নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ছিল তাদের আওতার বাইরে। ১৯২৯-৩০এ নেতারা ভাবেন নি যে এই পন্থার বিরুদ্ধে কোন অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। ছাত্ররা ছিল নেতাদের হাতের পুতুল মাত্র—তারা কখনো চিন্তা করেনি যে এরাই স্বাধীন ভাবে স্বদেশী আন্দোলনে সামিল হতে পারবে। ছাত্ররা অনুকরণ করে অনুসরণ করবে, কিন্তু তাদের নিজেদের থেকে চিন্তা করতে দেওয়া হবে না। সেই সময় যুবসমাজ অবস্থাটা একরকম মেনেই নিয়েছিল। মনে করা হয়েছিল যে ছাত্রদের দলে টানার জন্য তারা ধন্য মনে করবে—চুপ করে থাকবে। অন্য কোন প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবে না। একটা

গোষ্ঠীকে স্বাধীনতার স্বার্থে কাজে লাগানোর উদাহরণ পূর্বেও দেখা গেছে। জনসাধারণকে গান্ধী টেনে আনার সময় থেকে এই ধারা লক্ষিত হয়েছে। কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতি কংগ্রেসের আচরণে একই নীতি প্রমাণিত হয়।

১৯৩০ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হল এক নতুন অধ্যায়। ছাত্রসমাজকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করতেই, গান্ধীজীর সংগ্রাম সম্পর্কে এযাবৎ প্রচলিত ধ্যানধারণা এবং কার্যসূচীর পরিবর্তন ঘটাতেই এই নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছিল। এই পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে সেকালের পত্রপত্রিকা এবং সংবাদপত্রের গুরুত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য। কারণ এইগুলি বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ এবং সম্পাদকীয়র মাধ্যমে স্বদেশের প্রতি ছাত্রসমাজের নৈতিক কর্তব্য ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সক্রিয় হয়েছিল। আবার কিছু কিছু পত্রপত্রিকাতে এর বিরোধী মনোভাবও লক্ষ্য করা গেছে। যেমন কলকাতা শহরের বিশিষ্ট পত্রিকা 'বঙ্গবাণী' ১৯৩০ এর ২৫শে জানুয়ারী সম্পাদকীয়র মাধ্যমে রাজনৈতিক সংগ্রামে ছাত্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তির বিরূপ সমালোচনা করেছিল। তবে এই বিরূপতা খুব একটা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেনি। অন্যদিকে এই শহর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র 'এ্যাডভান্স'-এ একই বছরের ১২ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের উদাহরণের মাধ্যমে যুবশক্তিকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্রিয় হয়েছিল। ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা যায় যে কবিতা এবং গল্পগুলিতেও স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে ছাত্রসমাজের কর্তব্যের আবেদন প্রতিফলিত হয়েছে। এই সমস্ত প্রবন্ধগুলির আবেগপূর্ণ আবেদনই ছাত্রসমাজের প্রতি গান্ধীজীর আবেদনকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পেরেছিল এবং ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজকে আইন অমান্য আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছিল।

আইন অমান্য আন্দোলনকে প্রাথমিকভাবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা হলেও অল্পদিনের মধ্যেই আন্দোলনের পরিধি ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত ছাত্রসমাজ শিক্ষায়তন তথা শিক্ষাবর্জন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে। ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ গান্ধীজী তার শীর্ণ হাতে দীর্ঘ লাঠিটি তুলে নিয়ে সবরমতী থেকে সুদূর আরব সাগর উপকূলে ডান্ডি অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন, ফলে উত্তাল ভারতবর্ষ তাঁর সাথে পা মিলিয়েছিল।

এই সময় সারা বাংলা ছাত্র সভার (A. B. S. A) কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের অধিবেশনে স্থির হয় যে ছাত্রসমাজ সর্বতোভাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবে এবং যে কোন ধরনের আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকবে। এই অধিবেশনেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদের প্রস্তুত করা এবং আন্দোলনের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য এক বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[55] বলা

বাহুল্য যে '৩০এর দশকে ছাত্র-আন্দোলনের মূল কেন্দ্রভূমি ছিল কলকাতা শহর। এই যুক্তির সমর্থনে যে ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে তা হল ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ সালের ছাত্রদিবসে সারা বাংলা ছাত্রসভা ( A. B. S. A. ) স্বাধীন ভারত গঠনের প্রস্তাবটি পাশ করে এই কলকাতা শহরেই। এই প্রস্তাব পাশই প্রমাণ করে যে আনুষ্ঠানিকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল এবং ছাত্রসমাজ স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।[৫৬]

ডাণ্ডি অভিমুখে গান্ধীর পদযাত্রাকে রাজনীতি-সচেতন কলকাতাবাসী একটি বিশেষ দিন হিসাবে পালন করেছিল। ১২ই মার্চের প্রভাতী অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল জাতীয় পতাকা উত্তোলন। আইন অমান্য আন্দোলনের সাফল্য কামনা করে কংগ্রেসের জেলা অফিসগুলিতে প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। কলকাতা শহরের দক্ষিণে হাজরা পার্কে ৫০ জন ছাত্রের সমাবেশে এক মিনিট নীরবতা পালনের পর 'বন্দে মাতরম্' এবং 'গান্ধীজী কি জয়' ধ্বনিতে সভা মুখরিত হয়েছিল। পরে এই ছাত্রদের কয়েকজন আশুতোষ কলেজে প্রবেশ করে সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে সক্ষম হয়েছিল। ওই একই দিনের সকালে আশুতোষ কলেজের কিছু ছাত্র কলেজের প্রধান দরজায় দাঁড়িয়ে কলেজের অন্য ছাত্রদের সেদিনের ক্লাস বয়কটের আবেদন জানায়।[৫৭]

১৯৩০ সালের ৬-১৩ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহ পালন কালে সারা বাংলা ছাত্র সভার (A. B. S. A.) কার্যনির্বাহী সমিতি কলকাতার এ্যালবার্ট হলে ৬ই এপ্রিল এক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ৭০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে কলকাতার মেয়র এবং এই সভার সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সভা পরিচালনা করেছিলেন। এই সম্মেলনের সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা হল সারা বাংলা ছাত্রসভার ( A. B. S. A ) রাজশাহী জেলার সদস্য সন্তোষকুমার বাগচী মেদিনীপুর জেলার মহিষবাথানে সত্যাগ্রহীদের তৈরী একটি লবণের খণ্ড এনেছিলেন। আজকের দিনে আমরা গর্বিত হই যখন ১৯৩০-এর সংবাদপত্রে দেখি যে সেই লবণের খণ্ডটি ন্যাশন্যাল মেডিকেল শিক্ষায়তন-এর ছাত্ররা ১০০ টাকায় কিনে নিয়েছিলেন।[৫৮]

এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে এ. বি. এস. এ আইন অমান্য কাউন্সিলের জন্য সোদপুর আশ্রমে শিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদের নাম নথিভুক্ত করা শুরু করে। এই আইন অমান্য কাউন্সিল গঠনের উদ্যোক্তা ছিলেন গান্ধীজি এবং কাউন্সিলের কার্যকরী কমিটির কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করা। তবে এই সভার কিছু ছাত্র ও কর্মী আন্দোলনের জন্য স্বাধীন নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। এই সব ছাত্র এবং কর্মী সারা বাংলা ছাত্র সভার ( A. B. S. A. ) কার্যকরী কমিটির সম্মতিক্রমে ছাত্রদের কেন্দ্র করে

একটি আইন অমান্য কাউন্সিল গঠন করেছিল। এইসব ছাত্র এবং কর্মী ছাত্রসভার প্রাক্তন সদস্যদের সমর্থনে একটি সংস্থার সূত্রপাত করেছিল যার নামকরণ হয় বেঙ্গল মিলিশিয়া।

কলকাতায় গরমের ছুটির জন্য আইন অমান্য আন্দোলন আংশিকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়লেও পুনরায় তা শুরু হয় ২৩শে জুন আশুতোষ কলেজ খোলার পর। কলকাতার স্কুল কলেজগুলিতে ছাত্র উপস্থিতির হ্রাসের হারই এই আন্দোলনের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। ছাত্রসমিতিগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষা ভণ্ডুল করতে সক্ষম হয়েছিল।[59]

জুলাই মাসের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত স্কুল-কলেজে পিকেটিং আগের মতোই ছিল। ছাত্র পিকেটিং-এর ফলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ টাউন হলে আয়োজিত ইণ্টারমিডিয়েট আইন পরীক্ষা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।[60] স্কুল কলেজ বর্জন করা ছাড়াও ছাত্র বিক্ষোভের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিলাতী কাপড় এবং মদ বিক্রীর দোকানগুলি। এই দোকানগুলিতেও তারা ব্যাপক-ভাবে পিকেটিং করে। কলকাতা শহরে বিদেশী জিনিস বর্জন এবং স্বদেশী জিনিস ব্যবহারকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যই সারা বাংলা ছাত্রসভা তাদের প্রধান কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার প্রধান ক্ষেত্র ছিল বিদেশী কাপড়ের পাইকারী বাজার।[61]

১৯৩০-এর ৯ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় মীরা বেনের আগমন কালে স্তিমিত ছাত্রবিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। সরকারের আদেশ অগ্রাহ্য করে যে সব অসীম সাহসিকা মহিলা মীরা বেনের স্বাগত মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের কয়েকজন মহিলা সহ বিরাট জনতার মিছিল যখন কলেজ স্কোয়ারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পেঁাছায়, তখন পুলিসের লাঠি চালনায় বেশ কিছু লোক আহত হন। মীরা বেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশুতোষ বিল্ডিং-এর উপরতলায় দাঁড়ানো ছাত্ররা তীব্র প্রতিবাদে মুখরিত হয়ে উঠে।[62] বিক্ষোভের ফলে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট এবং কলেজ স্ট্রিটে যান চলাচল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়। বিক্ষোভকারীদের প্রতি পুলিসের অভিযোগ ছিল যে তারা পুলিসের দিকে কাচের বোতল এবং ইটের টুকরো ছুঁড়েছে। এর প্রতিবাদে পুলিস আশুতোষ বিল্ডিং-এ প্রবেশ করে ছাত্রদের মারতে থাকে।[63]

সেপ্টেম্বর মাসে এই বিক্ষিপ্ত ঘটনার পর থেকেই আইন অমান্য আন্দোলনের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। স্কুল-কলেজে ছাত্রদের উপস্থিতি বাড়তে থাকে।[64] এমতাবস্থায় সারা বাংলা ছাত্রসভার কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কলকাতায় এক সভায় শিক্ষা বর্জন কার্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করে এক বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছিল। তবে অন্যান্য ছাত্রসমিতিগুলি আইন অমান্য সম্পর্কিত

সভা, বক্তৃতা চালু রেখেছিল। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে সারা বাংলা ছাত্রসভা এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রসভা ১৯৩১-এর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করেছিল।

১৯৩১-এর ৬-৭ মার্চ সারা বাংলা ছাত্রসভার পরিচালনা উত্তর কলকাতা জেলা সভার অনুকুলে সারা বাংলা ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়। আর ৫ই মার্চ গান্ধী আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয়। গান্ধীর তরফ থেকে ভাইসরয়ের কাছে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ভগৎ সিং, রামগুরু এবং সুখদেবের ফাঁসি রদের আবেদন অগ্রাহ্য হওয়ায় ভারতের ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। উক্ত তিন অভিযুক্তের ফাঁসির প্রতিবাদে বাংলাদেশে সহস্রাধিক ছাত্র বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল আইনে গ্রেপ্তার হন। অন্যদিকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্ররা কারান্তরালে আন্দোলন সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। বাংলার যুবশক্তি আশা করেছিল যে গান্ধী-আরউইন চুক্তি হবে স্বল্পস্থায়ী এবং আন্দোলন শীঘ্রই তার নিজস্ব পথ ফিরে পাবে। এই রকম পরিবেশে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জাতীয় সংগ্রামের শৃঙ্খলা এবং জনগণের একতা নষ্ট হতে পারে এই জাতীয় কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তবে একথাও বলা প্রয়োজন যে গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করা হলেও এই চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করার কোন মনোভাব ছাত্র সমাজের ছিল না।[৪২]

ছাত্ররা একটি প্রস্তাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের প্রতি তারা তাদের সমর্থন জানালেও গান্ধী-আরউইন চুক্তির প্রতি হতাশ মনোভাবই ব্যক্ত করছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি তারা আবেদন জানাচ্ছে যে কোন ভাবেই যেন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর সঙ্গে আপোষ করা না হয়।[৪৩] তবে তারা একথাও ব্যক্ত করেছিল যে তাদের পক্ষ থেকে চুক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নটি রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির উপর নির্ভরশীল।[৪৪]

ছাত্রেরা ভগৎ সিং-এর ফাঁসির প্রতিবাদে তার শ্রাদ্ধের দিন ১৯৩১ সালের ৪ঠা এপ্রিল হরতাল, মিটিং এবং শান্তিপূর্ণ বক্তৃতা সভার আয়োজন করেছিল। কলকাতায় ৩রা মার্চ সারা বাংলা ছাত্র-সভা দীনেশ গুপ্ত এবং রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির হুকুম রদের দাবীতে মিটিং-এর আয়োজন করে। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের জনসমাবেশের উপস্থিতিতে সারা বাংলা ছাত্রসভা এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রসভা যুগ্মভাবে জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস পালন করে।

এছাড়াও ১০ই জুলাই সারা বাংলা ছাত্রসভা এলবার্ট হলে যে মিটিং-এর আয়োজন করেছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে সব ছাত্র আইন অমান্য

আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল তাদের প্রতি স্কুল এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের কঠোর মনোভাবের প্রতিবাদ জানানো। এমনকি এই ছাত্রসভা গান্ধীকে তারবার্তার মাধ্যমে এ ব্যাপারে ভাইসরয়ের হস্তক্ষেপের দাবী জানিয়েছিল। গান্ধী তাদের অভিযোগ লর্ড ওয়েলিংটনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরাজ সরকারের তরফ থেকে কোন ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায় নি।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের মধ্যেমিশ্রপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। কারণ জনগণের একাংশ এই চুক্তিকে সরকারের বিরুদ্ধে নিজ শক্তির জয় ধরে নিলেও অপর অংশ বিশেষতঃ যুব সম্প্রদায় এই চুক্তি সম্পাদনকে তাদের চিন্তাভাবনার প্রতি আঘাত হিসাবেই ধরে নিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।[68] ১৯৩১ সনের ২৬শে মার্চ জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে করাচী শহরে সারা ভারত ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রগণ তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে যে প্রস্তাবটি পাশ করেছিল তা হল 'সত্যাগ্রহ আন্দোলন' পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা গান্ধী এবং কংগ্রেস কমিটির প্রতি আস্থাবান হলেও গান্ধী-আরউইন চুক্তির প্রতি তারা হতাশ মনোভাবই ব্যক্ত করছে এবং জাতীয় কংগ্রেসের কাছে এই মর্মে দাবী জানাচ্ছে যে কোনভাবেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর সঙ্গে যেন কোনরকম আপোষ করা না হয়।[69]

বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ গান্ধী-আরউইন চুক্তির অনুকূলে না থাকলেও তারা চুক্তির প্রতিবাদ জানিয়েছিল শান্তভাবেই। কিন্তু কিছু কৌশলগত কারণেই তারা গান্ধীর নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেনি। কারণ তাদের ধারণা ছিল যে অচিরেই চুক্তি সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার অবসান ঘটবে এবং আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় শুরু হবে। বাস্তবিকভাবে সারা বাংলা ছাত্রসভা (A. B. S. A.) আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল।[70] এই সময়ে স্কুল এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রদের হয়রানি করাই ছিল ছাত্র আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং চরম আকার ধারণের প্রধান কারণ।

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্র সমিতিগুলির পরিচালনায় যে সমস্ত মিটিং আহূত হয়েছিল, সেগুলির প্রত্যেকটিতেই ছাত্রেরা গান্ধী-আরউইন চুক্তির প্রতি ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করে এবং সরকার কর্তৃক ভগৎ সিং-এর ফাঁসি রদ না হওয়ার দরুণ ছাত্র সম্প্রদায় জনগণকে আইন অমান্য অব্যাহত রাখতে অনুরোধ জানায়।[71] তবে ছাত্রদের দ্বারা আইন অমান্য আন্দোলনকে অপ্রতিহত রাখতে পিকেটিং বা ওই জাতীয় কার্যকলাপের বৃদ্ধি ঘটেনি। তবে মিটিং গুলিতে ছাত্রদের দেওয়া বক্তৃতাগুলি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা পূর্বের থেকে অনেক বেশী সংকটজনক হয়ে পড়েছিল। ছাত্র সম্প্রদায় তাদের বক্তৃতাগুলির মধ্য দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহমূলক মনোভাব বজায় রাখতে সমর্থ হলেও তারা তাদের অহিংস মনোভাবকেও প্রকট করে তুলতে পেরেছিল। কিন্তু ইংরাজ সরকার ছাত্র সমাজের প্রতি খুব একটা আস্থাবান ছিলেন না। তাদের এই আস্থাহীনতার প্রধান কারণ ছিল বাংলার একাধিক জেলাগুলিতে পরস্পরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক শ্লোগান সম্বলিত বক্তৃতা যা জনসাধারণকে সরকারের প্রতি বিক্ষিপ্ত করে তুলতে সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগপ্ত কলকাতায় গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে সরকার এবং ভারতীয়দের মধ্যে সাময়িক কলহশান্তির উপায় হিসাবে আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন যে, এই চুক্তি সম্পর্কে ছাত্র সমাজের মনোভাব যাই হোক্ না কেন আগামী ৫-৬ মাসের মধ্যে আমাদের দেশ হয় স্বরাজ লাভ করবে অথবা দ্বিগুণ উৎসাহে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করতে সক্ষম হবে। এই সময়ে লক্ষ্য করা গেছে যে ছাত্রসমাজ শরীর চর্চার বদলে একাধিক সংস্থা করেছিল যেখানে লাঠি এবং ছোরা খেলা শেখান হত।[72]

বাঙালী ছাত্র সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে অপছন্দ করলেও আন্দোলন পূর্ণপ্রস্তুতির জন্য তারা কংগ্রেস নেতৃত্বের দ্বারাই পরিচালিত হতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের জেলাগুলিতে কংগ্রেসের নীতি থেকে বিমুক্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। ১৯৩১ এর ১৯শে এপ্রিল ফরিদপুর ছাত্র সম্মেলন এই বিযুক্ত হওয়ার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ যেখানে ছাত্রেরা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে যে যেখানে কংগ্রেসের অহিংস মনোভাব গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, তখন ছাত্রসমাজকে সেই মনোভাবের প্রয়োজনীয়তা ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে যথাযথভাবে সচেতন করা হয়নি।

অন্যদিকে এই অহিংস মনোভাবের প্রতি ছাত্র সমাজের বিরুদ্ধাচরণ লক্ষ্য করা যায় যখন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ১৯৩১ সালের ২৭শে এপ্রিল ময়মনসিংহ জেলায় ছাত্র সম্মেলনে যোগদান করতে যান তখন একদল ছাত্র শ্রীসেনগুপ্তের অহিংসাত্মক নীতির প্রতিবাদস্বরূপ তাকে লাঠি নিয়ে আক্রমণ করে।[73]

এর পরবর্তী পদক্ষেপে গ্রামবাসীকে সংগ্রামী চেতনায় অনুপ্রাণিত করতে ছাত্রসমাজ যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল তা তুলনামূলকভাবে ছিল নতুন এবং অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত। এই পদ্ধতিতে বক্তা লন্ঠনের আলোতে ছবির সাহায্যে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে পুলিশী নির্মমতার ব্যাখ্যা করে গ্রামবাসীকে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে সচেতন করে তুলত।

আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে বাঙালী ছাত্রগণের গ্রেপ্তার এবং কারাবরণের বর্ধিত সংখ্যা এই আন্দোলনে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণের সাক্ষ্য বহন করে। এই ব্যাপকতা যে দুটি দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার একটি হল গান্ধীজীর অহিংস নীতির প্রতি ছাত্রদের পূর্ণ

সমর্থন জ্ঞাপন এবং অপরটি আন্দোলন চলাকালীন গান্ধীর নেতৃত্বে তারা যে পথ অনুসরণ করেছিল তার প্রতি আস্থা প্রকাশ। পরবর্তী ঘটনাবলী আইন অমান্য আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক প্রত্যাহার দ্বারা চিহ্নিত।

ছাত্রদের দ্বারা সংঘটিত বিদেশী কাপড়, মদ এবং গাঁজার দোকানগুলিতে পিকেটিং, মিটিং এবং বক্তৃতাই ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের অত্যাবশ্যক কর্মসূচী। এই সমস্ত কর্মসূচীর দ্বারা ছাত্রেরা বিতর্কের সম্মুখীন হলেও তাদের উৎসাহে বিন্দুমাত্র ঘাটতি দেখা যায়নি। গান্ধীজীর কর্মসূচীকে ছাত্রেরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিল এবং তা বাস্তবায়িত করার জন্য কারাবরণের ভয় এবং শারীরিক নির্যাতনকে অগ্রাহ্য করে আইন অমান্য আন্দোলনে সামিল হয়েছিল।

গান্ধীজীর দ্বারা এই আন্দোলনের প্রত্যাহার নিঃসন্দেহে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরাজয়, তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে কিছু সময়ের জন্য এই পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী কিন্তু সময় উপযোগী। ছাত্র এবং যুবসম্প্রদায়কে এই পরাজয় হতাশ করেছিল বটে কিন্তু বাংলার ছাত্রসমাজ উৎসাহে ছিল পরিপূর্ণ কারণ তারা উপলব্ধি করেছিল যে স্বাধীনতার লক্ষ্যটি সর্বদাই তীব্রতাপূর্ণ কঠোর পথ অনুসরণ করে। তবে ভবিষ্যতে অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৌশলেরও পরিবর্তন ঘটেছিল। আইন অমান্য আন্দোলনের গতি যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে সেই সময় আন্দোলন সম্পর্কে ভারতবর্ষের ছাত্র সম্প্রদায়ের সাময়িক হতাশা সত্ত্বেও গান্ধীজী ইংরাজ সরকারের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে আলোচনা করতেই আগ্রহী হন। তবে আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের ছাত্ররা গান্ধীজীব প্রতিবাদ করে আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে চায়নি। বস্তুত পক্ষে সারা বাংলা ছাত্রসভা ( A. B. S. A ) দৃঢ় ধারণার বশবর্তী হয় যে গান্ধীর সঙ্গে ইংরাজ সরকারের আলোচনা সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি ছাড়া সমাধান করতে সক্ষম হবে না। সেইজন্য বাংলাদেশের প্রধান ছাত্র সংস্থা সারা বাংলা ছাত্রসভা ( A. B.S. A ) কর্তৃক একটি 'ওয়ার কাউন্সিল' গঠন ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ধরনের নামকরণের প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় যে তারা বিশ্বাস করেছিল একমাত্র সম্মুখ যুদ্ধের মাধ্যমেই পূর্ণ স্বরাজের দাবীকে ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা অমানুষিক পুলিশী অত্যাচারের শিকার হয়েও স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল।

ছাত্র-প্রতিবাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল মিটিং, পদযাত্রা, যানবাহনে পুস্তিকা বিতরণ এবং স্কুল-কলেজে পিকেটিং। এছাড়াও জেলার ছাত্রসমিতিগুলির উত্তরোত্তর গুরুত্ব বৃদ্ধি এ যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বৈশিষ্ট্য

প্রমাণ করে যে মূল ছাত্র সমিতিগুলির শাখাগুলির প্রচেষ্টার ফলেই গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ঘটনাচক্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-প্রতিবাদের মূল ক্ষেত্রে পরিণত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে এবং বারান্দায় মিটিং ও পদযাত্রা এবং প্রচার অভিযান ছিল ৩০ এর দশকের পরিচিত দৃশ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন বা সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আংশিক ব্যর্থতাকে ছাত্রদের প্রচার অভিযানের সাফল্য হিসাবেই চিহ্নিত করা যেতে পারে।

এবার চলে আসা যাক ১৯৩৩ সালের ঘটনায়। ১৯৩৩ সালে কলকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশন আয়োজনের কৃতিত্ব বাংলাদেশের ছাত্রসমাজেরই প্রাপ্য। নির্মম পুলিশী নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও সারা বাংলা ছাত্র সভার ( A. B. S. A ) সদস্যরা কলকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশনের আয়োজনকেই তাদের একমাত্র কর্তব্য হিসাবে চিহ্নিত করেছিল।

আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে ছাত্রসমাজের কর্তব্যগুলি পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে ছাত্রেরা মৃত্যু ভয়কে জয় করেছিল। গান্ধী অনুমোদিত পথকেই তারা একমাত্র ধ্রুব সত্য বলে চিহ্নিত করেছিল সে কারণেই কোনরকম চাপ, নির্যাতন ছাত্র সম্প্রদায়কে সেই সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। সন্দেহ নেই যে একদা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কল্পনাপ্রসূত চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন ছিল এবং সেই কারণেই ছাত্রগণ প্রথমাবস্থায় রাজনীতি সম্পর্কে গান্ধীজীর যুক্তি তথা চিন্তা ভাবনাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

সর্বোপরি এই কথাই বলা যেতে পারে যে আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ তাদের নিজস্ব কর্মপন্থার প্রতি সমর্থন জানানোর অবস্থা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হতে পেরেছিল।

বাংলার ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানই গান্ধীবাদী এই আন্দোলনকে সফল করতে পেরেছিল যদিও বিরোধী দলের অস্তিত্বও লক্ষ্য করা গেছে। আইন অমান্য আন্দোলনের ছাত্রবিক্ষোভ আবর্তিত হয়েছিল শহরাঞ্চলকে কেন্দ্র করে। শহরাঞ্চলে শিক্ষায়তনগুলির প্রাচুর্যই আন্দোলনের শহরকেন্দ্রিক চরিত্রের প্রধান কারণ। তৎকালীন বাংলাদেশের দুটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা এবং ঢাকা শহরে অবস্থিত ছিল। এবং এই দুটি শহরে ছাত্রবিক্ষোভ চরম আকারে নিজ রূপ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। বিশেষতঃ কলকাতা শহরের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং স্কুল কলেজের আধিক্য আইন অমান্য আন্দোলনের প্রাণবন্ত চরিত্রকেই প্রকাশ করে। সেইসময়ে ছাত্র-আন্দোলন কোন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছিল না প্রকৃতপক্ষে তা ছিল একটি সংগঠিত প্রচেষ্টা। সারা বাংলা ছাত্রসভা (A. B. S. A) এবং

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রসভা (B. P. S. A) একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়েই ছাত্রদের কার্যকলাপকে প্রভাবিত করেছিল। বাংলার কংগ্রেস নেতাগণ বিশেষতঃ সুভাষচন্দ্র বসু এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এই প্রতিদ্বন্দ্বী সভার কার্যসূচীকে পৃষ্ঠপোষতা করতেন। ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রগণ ছিলেন বর্ণ হিন্দু গোষ্ঠীভূক্ত। তারা ছিলেন প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্যজাত গোষ্ঠীর মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাৎপর্যের বিষয় হল যে যারা বাংলা কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করতেন তারাও উক্ত পারিবারিক প্রেক্ষাপট থেকেই রাজনীতিতে এসেছিলেন। এই জাতিগত পরিচিত হয়তো কংগ্রেস আন্দোলনকে রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার শক্তি দিয়েছিল। ছাত্রদের দ্বারা নির্দ্ধিধায় বিশিষ্ট নেতা এবং তাদের নীতি অনুসরণ করতে জাতগত পরিচিতির এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। যে সব ছাত্রকে আইন অমান্য আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য স্কুল, কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল বা যে সব ছাত্ররা এই আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য গ্রেপ্তার এবং অভিযুক্ত হয়েছিলেন তাদের পরবর্তী পর্যবেক্ষণের দ্বারা যদি জাতগত প্রেক্ষাপটকে বোঝার চেষ্টা করা হলে দেখা যায় যে এদের মধ্যে ৬৩৯ জন ছিলেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য, ১৫ জন মাহিষ্য, ৩ জন বৌদ্ধ এবং ১৩ জন মুসলমান।

ছাত্র প্রতিবাদের মূল ভিত্তি ছিল স্কুল-কলেজে পিকেটিং করা, যা শিক্ষায়তনগুলির স্বাভাবিক কাজকর্মকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত করেছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে ছাত্রবিক্ষোভের ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। শহরের ছাত্রদল এই আন্দোলনের পরিধি ব্যাপ্ত করার উদ্দেশ্যে জেলার সহকর্মীদের মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যকে ছড়িয়ে দিতে সক্রিয় হয়েছিলেন। ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম-শহর, যুবা-বৃদ্ধ, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই যেন এই আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত হয়। মেদিনীপুর, রাজশাহী, ত্রিপুরা এবং কুমিল্লা জেলায় ব্যাপকভাবে পিকেটিং সংঘটিত হয়েছিল। মেদিনীপুর জেলার কালিকাপুর, মহিষবাথান, তমলুক এবং কন্টাই সাবডিভিশনের ছাত্ররা লবণ আইনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে প্রচার অভিযানে সামিল হয়েছিলেন। ছাত্রগণ কলকাতা সহ অন্যান্য জেলাগুলিতেও প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখেছিলেন।

এছাড়াও, ছাত্রসমাজ আইন অমান্য আন্দোলনের ভাবধারাকে চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত করার উদ্দেশ্যে সাময়িক পত্র এবং পুস্তিকা প্রকাশনায় নিজ উদ্যম নিয়োজিত করেছিলেন হাওড়া এবং হুগলী জেলার ছাত্র সমাজ সামাজিক ক্রিয়া এবং আনুষঙ্গিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন।

গান্ধীর দ্বারা আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে বাংলার ছাত্র আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। যেহেতু কংগ্রেস নেতারা ছাত্র সমিতিগুলি নিয়ন্ত্রণ করতেন সেই কারণে ছাত্রসম্প্রদায় কখনই কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণে সক্ষম হয়নি। কাজেই তাদের কার্যকলাপ সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

মহিলা আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের যে তফাৎ ধরা পড়ে তা হল ছাত্র আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করেনি। ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করলেও মুসলমান সম্প্রদায় প্রকাশ্যে আইন অমান্য আন্দোলনের সমালোচনা করেছিল। ছাত্র আন্দোলন সর্বদা মহিলা আন্দোলনের মত শান্তিপূর্ণ ছিল না। ছাত্র আন্দোলনে কিছু বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনার সাক্ষ্য মেলে। তবে এটা বলা যেতে পারে যে সাধারণভাবে পরিবেশ ছিল অহিংসাত্মক।

এই সময়ের ছাত্রসমিতিগুলি ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার প্রতিই বিশেষ উৎসাহী ছিল। এই অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলির একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল কারণ এই সম্মেলনগুলিতে ছাত্র, স্বেচ্ছাসেবক এবং নেতাদের মধ্যে এক তীব্র বিতর্কের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ের কর্মসূচী নির্দ্ধারিত হত। এই সম্মেলনগুলি প্রমাণ করে যে ছাত্ররা পূর্ণ উদ্যমে গান্ধীর আবেদনে সাড়া দিয়েছিল এবং ফলশ্রুতি হিসাবে আইন অমান্য আন্দোলনে তাদের সেই উদ্যমের প্রতিক্রিয়াও ধরা পড়েছিল।

## তথ্য ও সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১। পি. জি. এলব্যাচ, "ইন্ডিয়া এন্ড দি ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি ক্রাইসিস," ইন পি. জি. এলব্যাচ (এডিটেড) দ্য স্টুডেন্ট রেভোলিউশন ঃ এ গ্লোবাল এনালাইসিস, বোম্বে, ১৯৭০, পেজ ৫—৬.

২। সেমোর মার্টিন লিপসেট, "স্টুডেন্টস এন্ড পলিটিক্স ইন কমপ্যারাটিভ," ইন পি. জি এলব্যাচ (এডিটেড)

৩। প্রফুল্ল কুমার সরকার, জাতীয় আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ, ক্যালকাটা ১৯৪৫.

৪। অমৃতবাজার পত্রিকা, আগস্ট ৭, ১৯০৫.

৫। রিপোর্টস অন নিউজ পেপারস্ এন্ড পিরিওডিক্যালস ইন বেঙ্গল ফর উইকস্ এন্ডিং, জুলাই ২৯ এন্ড সেপ্টেম্বর ২, ১৯০৫. কোটেড ইন সুমিত সরকার'স, দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল (১৯০০-০৮), নিউ দিল্লী, ১৯৭৩, পেজ ১৬০.

৬। সুমিত সরকার।

৭। সান্ধ্য, অক্টোবর ১৯০৫ আর এন পি ; ফর উইক এন্ডিং অক্টোবর ২৮, ১৯০৫।

৮। অমৃতবাজার পত্রিকা, অক্টোবর ৫, ১৯০৫.

৯। ইবিড, নভেম্বর, ৫, ১৯০৫।

১০। হরিদাস এ্যান্ড উমা মুখার্জী, দ্য অরিজিনস অফ দি ন্যাশন্যাল এডুকেশন মুভমেণ্ট, ক্যালকাটা, ১৯৫৭, পেজ ২৭-৩১।

১১। সুমিত্র সরকার।

১২। হোম পলিটিকাল ( এ ), মার্চ, পেজ ৫-৭, ন্যাশনাল আরকাইভস অফ ইণ্ডিয়া।

১৩। রঞ্জিত রায়, সোস্যাল কনফ্লিক্ট এণ্ড পলিটিক্যাল আনরেষ্ট ইন বেঙ্গল, ১৮৭৫-১৯২৭, নিউদিল্লী, ১৯৮৪, পেজ ৫৫।

১৪ সুকুমার মিত্র, "শ্রীঅরবিন্দ আকরোড ঘোষ", মাসিক বসুমতী, ১৩৫৮ বি. এস.

১৫। তেণ্ডুলকর, মহাত্মা গান্ধী, II, কোটেড ইন এ. এন রায়, স্টুডেণ্টস্ ফাইট ফর ফ্রিডাম, ক্যালকাটা, ১৯৬৭, পেজ-৬।

১৬। রোনাল্ডসে টু চেমস্ফোর্ড, জানুয়ারি ১৯, ১৯২১, চেমস্ফোর্ড কালেকশনস্, এম.এস.এস, ইউরোপ, ই ২৬৪.২৬, নং ৪৭ আই ও আর

১৭। কোটেড ইন এ. এন রায়।

১৮। হোম পলিটিক্যাল, কনফিডেনসিয়াল, ফাইল নং ৩৯৫/১৯২৪, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আরকাইভস্।

১৯। রোনাল্ডসে টু জর্জ ভি, জুন ১, ১৯২১, জেটল্যাণ্ড কালেকসন, এম, এস, এস, ইউরোপ, ডি, ৬০৬১,৪ আই, ও, আর।

২০। অমরেন্দ্রনাথ রায়।

২১। অমৃতবাজার পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ৪, ১৯২৮.

২২। অমরেন্দ্রনাথ রায়।

২৩। অমৃতবাজার পত্রিকা, সেপ্টেম্বর ২৬, ১৯২৮।

২৪। ফরওয়ার্ড, সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯২৪।

২৫। ফর দ্য স্পিচ সী এ. এন. রায়.

২৬। বাজলুর রহমান খান, পলিটিক্স ইন বেঙ্গল ১৯২৭-৩৬, ঢাকা, ১৯৮৭ পেজ-১১০।

২৭। এ, এন, রায়।

২৮। দ্য স্টেটসম্যান, নভেম্বর ৮, ১৯২৯.

২৯। ইবীড, নভেম্বর ১০, ১৯২৯.

৩০। ইবীড, নভেম্বর ৮, ১৯২৯.

৩১। বেঙ্গল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট, ১৯২৮-২৯.
৩২। বি, আর, খান।
৩৩। দ্য স্টেটসম্যান, এপ্রিল ৭, ১৯৩০.
৩৪। পলিটিক্যাল নোটস্ কলম্, দ্য স্টেটস্ম্যান, ২৫ মে, ১৯২৮; ২২ জুলাই ১৯২৮ এবং ৯ আগষ্ট ১৯২৮.
৩৫। দ্য স্টেটসম্যান, আগষ্ট ৯, ১৯২৮.
৩৬। দ্য স্টেটসম্যান, ২২ আগষ্ট, ৩, ৪ এবং ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯.
৩৭। এ, এন, রায়।
৩৮। দ্য স্টেটস্ম্যান ; ২১, ২৩ আগষ্টস্, ৪ এবং ৬ সেপ্টেম্বর।
৩৯। এ, এন, রায়।
৪০। এলেন ডি. রোজ্, স্টুডেন্ট আনরেস্ট ইন ইন্ডিয়া : এ কমপ্যারেটিভ এপ্রোচ, মনট্রীয়ল, ১৯৬৯, পেজ ২৫০.
৪১। বেঙ্গল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট (১৯২৮-২৯), ভি/১০/৮১, আই. ও. আর.
৪২। ইবীড।
৪৩। এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, রিসলিউশন নং ১৯১৮, এডিন, গভঃ অফ্ বেঙ্গল, ৬, কুইন কুইনীয়ল রিভিউ অফ দ্য প্রগ্রেস অফ এডুকেশন ইন বেঙ্গল, আই ও আর।
৪৪। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটুটরি কমিশন, ভোল ১, রিপোর্ট অন দ্য আই. এস. সি. ভোল ১ : সার্ভে, ১৯৩০ সি এম ডি/৩৫৬৮, আই ও আর.
৪৫। রেকর্ডস অফ দ্য জয়েন্ট কমিটি অন ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউন্যাল রিফর্ম ১৯৩৪, ইক্সট্রাক্টস ফর্ম ভোল II, এম এস এস, ইউরোপ ই ২৪০/৭৭ টেম্পল উড কালেকশন আই ও আর।
৪৬। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটুটরি কমিশন ভোল VIII, মেমোরেন্ডাম্ সাবমিটেড বাই দ্য গভঃ অফ বেঙ্গল টু দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্যাটুটরি কমিশন, ১৯৩০ ভি/২৬ ২৬১/২৪ আই ও আর।
৪৭। মেমোরেন্ডাম বাই জে, এন্ডারসন অন দ্য জেনারেল সিচুয়েশন ইন বেঙ্গল, জুন ১৯৩২, এন্ডারসন কালেকশন এম এস এস, ইউরোপ, এফ ২০৭/১৪ (এ), আই ও আর।
৪৮। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্ট, ভোল II (স্যাডলার কমিশন). পেজ ৩০৪ সি এম ডি ৩৯০ (১৯১৯), আই ও আর।
৪৯। লেটার ফ্রম স্টীউয়ার্ট টু এন্ডারসন, মার্চ ৯, ১৯৩২ এন্ডারসন কালেক্সন, এম এস এস, ইউরোপ ২০৭/৫, আই ও আর।
৫০। এডওয়ার্ড শীলস্, "স্টুডেন্টস্, পলিটিক্স এন্ড ইউনিভার্সিটিস্ ইন

ইণ্ডিয়া," ইন পি. জি. এলব্যাচ ( এডিটেড ), টারময়েল এণ্ড ট্র্যান্সিসন, হাই এডুকেশন এণ্ড স্টুডেণ্টস্ পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া, বম্বে ১৯৬৮, পেজ ২.

৫১। জে ব্রুমফিল্ড, এলিট কনফ্লিক্ট ইন এ প্লুর‍্যাল সোসাইটি : টোয়েণ্টিয়েথ সেনচুরি বেঙ্গল, বার্কলে এণ্ড লস এঞ্জেলস্, ১৯৬৮, পেজ ৫৩।

৫২। সুভাষ চন্দ্র বোস, দ্য ইণ্ডিয়া স্ট্রাগল, ১৯২০-৪২, লণ্ডন, ১৯৬৪, পেজ ৬৪.

৫৩। সেমোর মার্টিন লিপসেট, "দ্য পসিবল্ ইফেক্টস অফ স্টুডেণ্ট এক্টিভিজম্ অন ইণ্টারন্যাশনাল পলিটিক্স," কুয়েস্ট ৬১, এপ্রিল-জুন, ১৯৬৯. পেজ ৩৮ কোটেড ইন বি. আর. খান।

৫৪। বি. আর. খান।

৫৫। অমৃতবাজার পত্রিকা, মার্চ ১৮, ১৯৩০

৫৬। ইণ্ডিয়ান এনুয়াল রেজিস্টার, জানুয়ারী-জুন, ১৯৩০

৫৭। রিপোর্ট অন দ্য পলিটিক্যাল সিচুয়েশন ইন বেঙ্গল ফর উইক এণ্ডিং ১২-৩-৩০ আই. বি. সি. আই. ডি রিপোর্ট।

৫৮। রিপোর্ট অফ দ্য কমিশনার অফ পুলিশ, ক্যাল, ফর্ট নাইট এণ্ডিং মার্চ ২৯, ১৯৩০, আই, বি, রেকর্ড'স।

৫৯। দ্য স্টেটসম্যান, জুলাই ৩, ১৯৩০.

৬০। বেঙ্গল লোক্যাল গভর্নমেণ্ট রিপোর্টস্, ২ এণ্ড হাফ অফ জুলাই, ১৯৩০, আই ও এল আর।

৬১। ইণ্ডিয়ান এনুয়্যাল রেজিষ্টার, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৩০.

৬২। ইবিড।

৬৩। গর্ডন পেপারস্, সেণ্টার ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ, কেমব্রিজ।

৬৪। দ্য স্টেটস্ম্যান, নভেম্বর ৭, ১৯৩০.

৬৫। এ. এন. রায়, "স্টুডেণ্ট মুভমেণ্ট ইন বেঙ্গল ১৯০৫-৩৪", ইন এন. আর রায় এট অল ( এডিটেড ) চ্যালেঞ্জ—এ সাগা অফ ইণ্ডিয়া'জ স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম্, নিউদিল্লী, ১৯৮৪, পেজ ৫৩১-৩২.

৬৬। এ. এন. রায়, ওপসিট পেজ, ৭৬.

৬৭। লিবার্টি, মার্চ ৮, ১৯৩১.

৬৮। এন অটোবায়োগ্রাফী, জহরলাল নেহেরু, পেজ ২৫৯.

৬৯। এ. এন. রায় ওপসিট, পেজ ২৬.

৭০। ইণ্টারভিউ উইথ এ. এন. রায়, ক্যালকাটা, ডেট ১৮/৪/৮৯.

৭১। আই, বি, রিপোর্ট ফর উইক এণ্ডিং মার্চ ২৮, ১৯৩১.

৭২। ইবিড, উইক এণ্ডিং এপ্রিল ১১, ১৯৩১.

৭৩। ইবিড, উইক এণ্ডিং এপ্রিল ২৫, ১৯৩১.

# স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙলার ছাত্রীসমাজ : একটি সামগ্রিক রূপরেখা

## সুস্নাত দাশ

সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে কমকিছু লেখা হয়নি। পাঠ্যপুস্তক থেকে গবেষণাগ্রন্থ, আঞ্চলিক ইতিহাস থেকে সামগ্রিক ইতিহাস, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কসবাদী ও নিম্নবর্গীয় সাব-অলটার্ন দৃষ্টিকোণ—নানাভাবে, নানা ধারায় ও নানা আঙ্গিকে দেশী-বিদেশী ঐতিহাসিক ও গবেষকেরা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে জানিনা, স্বাধীনতার সেই সংগ্রামে ছাত্রসমাজ যে-ভূমিকা পালন করেছিলেন সে-সম্পর্কে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম বা ইতিবৃত্ত রচনার প্রচেষ্টা আজ অবধি হয়নি বলেই আমার ধারণা। এর মধ্যে আবার পৃথকভাবে ছাত্রীদের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা বা আলোচনার প্রত্যাশা করা একটু যেন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে যে দেশের আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ধনতান্ত্রিক মধ্যযুগীয় সমাজ-জীবনে অধিকাংশ নারীর অবস্থান ( দেবী আরাধনা যতই করিনা কেন ) এখনো নিম্নবর্গীয় মানুষের স্তরেই প্রায় আবদ্ধ, সেই হতভাগ্য দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারীদের ( ছাত্রীরা তো খুবই তুচ্ছ এক অংশ ) ভূমিকার উপযুক্ত মূল্যায়নে ইতিহাসবিদেরা অধিকাংশই যে নীরব থাকবেন তা তো বলাই বাহুল্য। অবশ্য অতি সাম্প্রতিককালে এ বিষয়ে কোনো কোনো মহল যৎসামান্য উদ্যোগী হয়েছেন মাত্র, এটুকুই স্বীকার্য।

প্রকৃতপক্ষে, সামগ্রিক ছাত্র আন্দোলনের মূল ধারা থেকে ছাত্রী সমাজকে বিযুক্ত করার কোনো ইচ্ছাই এই নিবন্ধ লেখকের নেই। কারণ, ইংরাজী 'স্টুডেন্ট' শব্দের লিঙ্গভেদ করতে যাওয়া বোধহয় একান্তই অবৈজ্ঞানিক এবং অনুচিত কাজ। কিন্তু হায়! আমাদের পুরুষশাসিত ভারতবর্ষীয় সমাজে ইতিহাস রচনাতেও 'মেল শ্যভিনিজম্' বা 'পুং-প্রাধান্যের' যে আগ্রাসী ঝোঁক বিদ্যমান, তার অন্তহীন ভস্মরাশির নীচে কত অগ্নিকন্যার স্মৃতি যে লুপ্ত হতে বসেছে, কে তার খবর রাখে? এমন কি বাংলা তথা ভারতের সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম ইতিবৃত্তকাররূপে যাঁকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি সেই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর গ্রন্থাবলীতে ছাত্রীদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রায় মৌনব্রতই অবলম্বন করেছেন, যদিও এ বিষয়ে কিছু বলার পক্ষে তিনিই ছিলেন সম্ভবত যোগ্যতম ব্যক্তি। যাই হোক, জনসমাজের অর্ধেক অবহেলিত অংশ

রূপে নারীদের ভূমিকা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে কতটা ছিল সেই বিরাট প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ না করে, আমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙলার ছাত্রীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে যতটা জেনেছি তা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করছি। মৌলিক গবেষণা বা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রয়াস এটা নয়, বর্তমান নিবন্ধকার শুধুই অতীতের কথাকার।

## উনবিংশ শতাব্দীর পশ্চাৎপদতা :

বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বাঙালী ভদ্রলোক পরিবারের নারীরা যৌথ ভাবে সামাজিক ক্রিয়াকর্মে বা কোনো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। নারী সমাজের নিজস্ব সংগঠন গড়ার কোনো প্রয়োজনীয়তাই তারা তখনও অনুভব করেন নি। তৎকালীন পুরুষ-শাসিত সমাজে তাদের তা করতেও দেওয়া হয়নি। বস্তুত, ভদ্রলোক শ্রেণীর মহিলারা ধর্মীয় উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি ছাড়া। বাড়ির বাইরেই বেরুতে পারতেন না, এমনকি অমন যে প্রগতিশীল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, সেখানে পর্যন্ত পর্দানশীনতা বহুদিন পর্যন্ত বজায় ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "আগে আমাদের বাড়িতে অবরোধ প্রথা খুবই মানিয়া চলা হইত। মেয়েদের এবাড়ী ওবাড়ী যাইতে হইলেও ঘেরাটোপ ঢাকা পাল্কিতে চড়িয়া যাইতে হইত এবং পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে দুই একজন করিয়া দারোয়ানও যাইত। যেসকল পুরস্ত্রীগণ গঙ্গাস্নানে যাইতেন তাহাদিগকে পাল্কি করিয়া লইয়া গিয়া পাল্কিসুদ্ধ জলে চুবাইয়া আনা হইত।"[১] স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী চৌধুরাণীও নিজের স্মৃতিকথায় ওই একই বক্তব্য জানিয়েছেন। তবে এটাও লক্ষণীয়, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বিলেত ফেরৎ প্রথম আই. সি. এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটছিল অবশ্য সমগ্র সমাজেই। ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার-আন্দোলনের প্রভাবে একটি-দুটি করে বেশ কয়েকটি সামাজিক নারীসংগঠন সেইসময় আত্ম-প্রকাশ করতে শুরু করেছিল।

ব্রাহ্মসমাজ নেতা কেশবচন্দ্র সেন ইংল্যান্ড থেকে ফিরে ( নভেম্বর, ১৮৭০ ) এসে প্রতিষ্ঠা করেন 'ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন'। এর পাঁচটি শাখার মধ্যে অন্যতম ছিল 'স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন বিভাগ'। এরই ফলে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় 'বামা হিতৈষিণী সভা'। এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন কেশবচন্দ্র সেন এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। সম্পাদিকা হন রামতনু লাহিড়ির ভ্রাতুষ্পুত্রী কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী। বেথুন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী রাধারাণী দেবীর স্বদেশীমানসিকতার প্রভাব তাঁর ছাত্রীদের উপরেও পড়েছিল।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট স্বর্ণপ্রভা বসুকে সভাপতি ও কাদম্বিনী বসু ( গাঙ্গুলি )-কে সম্পাদিকা করে গঠিত হয় 'বঙ্গ মহিলা সমাজ'। এরপর ১৮৮৬সালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বর্ণকুমারী দেবীর নেতৃত্বে 'সখী সমিতি'। এই নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। শুধু ব্রাহ্ম মহিলারাই নয়, শিক্ষা বিস্তার ও স্বাবলম্বনের আদর্শে দীক্ষিত যে কোনো বাঙালী মহিলাই হতে পারতেন এই সংগঠনের সদস্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই 'নারী সংগঠন'গুলি বাঙলার সমাজজীবনে একদিকে যেমন শিক্ষিতা ছাত্রীর সংখ্যা বাড়িয়েছিল, অপরদিকে তেমনি মহিলাদের মধ্যে সমাজ-সচেতনতা বৃদ্ধিতেও সাহায্য করেছিল। এমনকি ১৮৮২তে কামিনী রায়ের 'ইলবার্ট বিল' আন্দোলনে যোগদান, ১৮৮৯ সালে বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী দেবী ও কাদম্বিনী গাঙ্গুলির যোগদান এবং পরের বছর কলিকাতা অধিবেশনে কাদম্বিনী দেবীর বক্তৃতাও ছিল শিক্ষিতা মহিলাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিরই পরিচায়ক।

## নারীশিক্ষার প্রসার ও সীমাবদ্ধতা :

বিখ্যাত বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৯ সালে। কিন্তু বলা চলে ১৮৫৪র উড্‌স ডেস্‌প্যাচের পরেই নারীশিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে। ১৮৭৮-এ কাদম্বিনী বসু ( গাঙ্গুলি ) ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ১৮৮২তে তাঁরা হলেন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট। ১৮৮৪ সালে চন্দ্রমুখী ইংরাজিতে এম.এ পাশ করেন। এরপর একে একে এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নির্মলা সেন, রাজকুমারী দাস, হৃদয়বালা বসু। বোটানিতে এম. এস-সি হলেন হেমপ্রভা বসু ( ১৮৯৭ )। ১৮৮০ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে পাশকরা মহিলা গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ছিল ক্রমবর্ধমান। ১৮৮৬তে প্রথম অনার্স গ্রাজুয়েট হলেন কামিনী সেন (রায়)। মেয়েদের মধ্যে একে একে ডাক্তার হলেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, বিধুমুখী বসু ও যামিনী সেন। ভারতবর্ষের প্রথম প্র্যাকটিসিং মহিলা ডাক্তার রূপে কাদম্বিনী গাঙ্গুলির নাম স্মরণীয়। সরলা-দেবী চৌধুরাণীকে দেখা গেল চরমপন্থী কংগ্রেসী রাজনীতির আঙ্গিনায় স্বচ্ছন্দে পদচারণা করতে। এইভাবেই ঘরের নারীরা বাইরে এলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের মেয়েরাই অবশ্য প্রথম সারিতে এবং তারা কেউই বিত্তহীনা নন। বরঞ্চ পারিবারিক-সামাজিক অবস্থান বিচারে তাঁদের উচ্চবর্গীয়ই ( Elite ) বলা চলে। যাইহোক, সংগঠিত ছাত্রী আন্দোলন দানা না বাঁধলেও বাঙলার সমাজ ও রাষ্ট্রিক জীবনে সুশিক্ষিতা মেয়েরা তখন থেকেই যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুরু করেছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

তবে এটাও অনস্বীকার্য যে, নারীশিক্ষা প্রসারের কাজ উনবিংশ শতাব্দীতে যতটা কাম্য ছিল, সেই পরিমাণে তা হয়নি বললেই চলে। এমনকি বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেও সর্বস্তরের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের কাজও আশানুরূপ ছিল না। ১৮৬৭ সালের শিক্ষা-সংক্রান্ত সরকারী কার্য-বিবরণী ( Home Education Proceedings and Home Education Consultation, 1867 ) থেকে তৎকালীন স্ত্রী-শিক্ষা এবং বিদ্যালয় শিক্ষার সাধারণ অবস্থা জানা যায়। সেইসময় সমগ্র দেশে শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয় ছিল বার্ষিক ৮২ লক্ষ টাকা মাত্র। পুরোপুরি সরকারী বিদ্যালয়ে পড়ত ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ছাত্রছাত্রী ( সহশিক্ষা চালু হয়নি ), মিশনারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার জন ছাত্রছাত্রী। এদের মধ্যে সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৮ হাজার ৬ শত জন এবং দ্বিতীয় ধরনের বিদ্যালয়গুলিতে ছিল ২৩ হাজার ৬ শত জন। অর্থাৎ, সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শতকরা ৫ জন ছিল ছাত্রী, তুলনায় বেসরকারী বিদ্যালয়ে পড়তো শতকরা ১০ জন ছাত্রী। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন কোনো অগ্রগতি ভারতবর্ষে পরবর্তীকালেও ঘটেনি। ১৮৮১ সালে সর্বভারতীয় হিসাবে দেখা যায়, প্রতি ১ হাজার ছাত্রের অনুপাত অনুসারে বিদ্যালয়গামী ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৬ জন ( অর্থাৎ ৫ শতাংশের কম )। সাক্ষরতার হার তখন দাঁড়িয়েছিল পুরুষদের মধ্যে প্রতি ১৬ জনে ১ জন, অর্থাৎ ৬ শতাংশ, আর নারীদের মধ্যে প্রতি ৪৩৪ জনে মাত্র ১ জন, অর্থাৎ ¼ শতাংশেরও কম। প্রতি ৮৫০ জন শিক্ষালাভের উপযুক্ত বালিকার মধ্যে তখন মাত্র ১ জন বিদ্যালয়ে যেত। বাঙলা দেশে সেইসময় ২৭০০ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাতে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ছাত্রীও পড়ছে। সর্বভারতীয় মান থেকে এই শিক্ষাচিত্র কিঞ্চিৎ উন্নত হলেও এটি অসাধারণ কিছু নয়।[২]

নারীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক দুর্বলতার এই চিত্র বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও অব্যাহত ছিল। তবু এর মধ্যে হিন্দু মেয়েরাই মুসলিম মেয়েদের তুলনায় শিক্ষার আঙিনায় আসার সুযোগ পেয়েছিলেন সবথেকে বেশি। ১৯১১ সালে প্রতি ১০০০ জন হিন্দু/মুসলিম মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল নিম্নরূপ ঃ[৩]

| | | হিন্দু | | মুসলিম | |
|---|---|---|---|---|---|
| বিভাগ | বৎসর | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা |
| | ১৯১১ | | | | |
| ঢাকা | | ২৩৮·৮ | ২৯·৫ | ৬০·১ | ১·৫ |
| প্রেসিডেন্সি | | ২৪৯·৮ | ৩৫·৫ | ৯৬·১ | ৩·২ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| বর্ধমান | ২০৮'৪ | ১১'৬ | ১৫০'৪ | ৭'০ |
| চট্টগ্রাম | ২৬২'৭ | ২০'১ | ৮০'৩ | ২'২ |
| রাজশাহী | ১০০'৫ | ৯'৪ | ৭৬'৭ | ১'৭ |

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম মেয়েরা সমগ্র বাঙলা-দেশেই যথেষ্ট পরিমাণে পিছিয়ে ছিলেন। সরকারী আনুকূল্য ও বেগম রোকেয়া প্রমুখের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়েছিল, কিন্তু উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথে তখনো ছিল দুস্তর বাধা। ১৯১৫ সালে হিন্দু / মুসলিম মহিলার মোট জনসংখ্যা ও শিক্ষিতের হার অবিভক্ত বাঙলায় ছিল নিম্নরূপ :[৪]

| জনসংখ্যা | *প্রথাগত শিক্ষিত | ইংরাজি শিক্ষিত | *শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| হিন্দু : ১ কোটি ৯৭ হাজার ১৬২ | ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ১৭৩ | ৮ হাজার ৮৭ | ১'৭% |
| মুসলিম : ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার ১৩ | ২৭ হাজার ৫০৬ | ৮৫৫ | ০'২% |

স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায়, দরিদ্রশ্রেণীর মেয়েরা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে শিক্ষার কোনো সুযোগই প্রায় পেত না। তবু মধ্যবিত্ত পরিবারের হিন্দু মেয়েরা মুসলিম মেয়েদের তুলনায় এক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে ছিল। তাই পরবর্তীকালের ছাত্রী আন্দোলনে বা স্বাধীনতা-সংগ্রামে হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা যেটুকু এগিয়ে এসেছিল সেই তুলনায় মুসলিম মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল সত্যিই নগণ্য।

## স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিভিন্ন ধারা ও পটভূমিকা :

বাঙলা তথা ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে তথা স্বাধীনতা-সংগ্রামে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়েই চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে ছাত্রীদের যে-প্রচেষ্টা ছিল কিছুটা বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত, তৃতীয় দশকে সেই ছাত্রীরাই হলেন সংগঠিত বিপ্লবী আন্দোলনের শরিক। বিবর্তনের তৃতীয় ধাপে, অর্থাৎ চতুর্থ দশকে রাজনীতি-সচেতন ছাত্রীসমাজ শুধুমাত্র সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলনেরই শরিক নন, সমাজ-তান্ত্রিক ও সাম্যবাদী আন্দোলনেরও অংশীভূত। অন্যদিকে ছাত্রীদের আর এক অংশ, অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী ছাত্রীরা গান্ধী-নির্দেশিত পথে জাতীয় কংগ্রেসের মূলস্রোতের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছিলেন। তবে এই যোগদান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল ইস্যুভিত্তিক।

প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিকভাবে বাঙলার ছাত্রীসমাজ মূলত তিনটি ধারাতেই স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

১. জাতীয় বিপ্লববাদী (সন্ত্রাসবাদী।) ধারা।

২. জাতীয় কংগ্রেসের গান্ধীবাদী ধারা।

৩. কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত সাম্যবাদী গণআন্দোলনের ধারা।

তিরিশের দশকের শেষার্ধ থেকেই জাতীয় বিপ্লববাদী ছাত্রীদের বৃহৎ একটি অংশ ক্রমশই সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারাতেই মিশে যেতে শুরু করেন। আবার ৪০-এর দশকের সূচনাতেই সুভাষচন্দ্র বসুর কংগ্রেস পরিত্যাগের ফলে ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে 'সুভাষবাদী' একটি স্বতন্ত্র ধারাতেও ছাত্রীদের একাংশ শামিল হন। তবে '৪০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তাল গণ-আন্দোলনের সময়কালে মূলত দুটি ধারার অস্তিত্বই উল্লেখযোগ্য। ১. কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয়তাবাদী ধারা এবং ২. কমিউনিস্টদের পরিচালনায় সাম্যবাদী ধারা। বলাই বাহুল্য, ছাত্রীরা এসব ক্ষেত্রে সর্বদাই মূল ছাত্র আন্দোলনের অংশরূপেই কাজ করতেন। মুসলিম লীগের ছাত্রসংগঠন থাকলেও মেয়েদের অংশগ্রহণ তাতে ছিল না বললেই চলে। তবে চল্লিশের দশকের এটাই একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, ছাত্রীরা এই সময় স্বাধীনতা-সংগ্রামের অংশরূপে সংগঠিত মহিলা আন্দোলনেও বহু ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে বাঙলাদেশ যখন উত্তাল হয়ে উঠেছিল এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নেমে এসেছিলেন রাখীবন্ধনের শোভাযাত্রায় তখন 'বাঙলার মাটি বাঙলার জল···পুণ্য হোক, পুণ্য হোক' সঙ্গীতে আকাশ-বাতাস যাঁরা মুখরিত করে তুলেছিলেন তাঁরা হলেন বাঙলারই ছাত্রী সমাজ। 'অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি'তে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য না হলেও, তারা নির্লিপ্ত ছিলেন না। 'যুগান্তর' পত্রিকায় বিপ্লববাদ প্রচারের অভিযোগে ১৯০৭-এর ২৪ আগস্ট ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত দণ্ডিত হন। এই কারাদণ্ডের প্রতিবাদে মুখর হয় সমগ্র বাঙলাদেশ। কলকাতায় ডাঃ নীলরতন সরকারের বাড়ি ৬১ নং হ্যারিসন রোডে লীলাবতী মিত্র-র পৌরোহিত্যে প্রায় দুইশত মহিলা প্রতিবাদ সভায় মিলিত হন এবং ভূপেন্দ্রনাথ ও তাঁর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীকে অভিনন্দিত করেন। এঁদের মধ্যে তৎকালীন বাঙলার সুশিক্ষিতা ছাত্রীদের উপস্থিতিও কম ছিল না।

১৯০৮-০৯ থেকে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন যখন তীব্র হয়ে উঠতে থাকে তখন বাঙলার নারীসমাজও তাতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক এবং ব্রাহ্ম নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র-র পত্নী লীলাবতী এবং তাঁদের বিদুষী কন্যা 'সুপ্রভাত'-সম্পাদিকা কুমুদিনী মিত্র ছিলেন সক্রিয়ভাবে বিপ্লবপন্থায় বিশ্বাসী। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (পরবর্তীকালের স্বামী

প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী) বিধবা ভগিনী সরোজিনী দেবী বরিশালে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ প্রচারে অংশ নেন। 'যুগান্তর' দলের যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) দিদি বিনোদিনী দেবীও তাঁর ভাইকে 'নৈতিক সমর্থন' জানাতেন। যেমন জানাতেন অনুশীলন দলের জীবনতারা হালদারের মা রাধারানী দেবী।[৫] এইরকম আরো অনেক বাঙালী বীরাঙ্গনা কখনো বিপ্লবীদের গৃহে আশ্রয়দান, কখনো অস্ত্র লুকিয়ে রাখা বা যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া, কখনো পুলিশকে বিভ্রান্ত করা বা বিপ্লবীদের পলায়নের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি দেশপ্রেমিক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতেন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পুলিশী অত্যাচার, গ্রেপ্তার, নির্বাসন প্রভৃতি বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও বিপ্লববাদী কাজে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও বাঙালী নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি পায়। হাওড়া জেলার বালির সূর্যকান্ত ব্যানার্জীর বালবিধবা কন্যা ননীবালা দেবী ভারত-জার্মান বিপ্লবী ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয়ে ১৯১৮ সালে পলাতক অবস্থায় ধরা পড়েন সুদূর পেশোয়ারে। একই বিপ্লবী ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে সিন্ধুবালা দেবী পাশবিক পুলিশী অত্যাচারের শিকার হন। রডা কোম্পানীর পিস্তল লুঠের মাল পাওয়ার কারণে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন বীরভূমের নলহাটির দুকড়িবালা দেবী। অনুরূপ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ঢাকা জেলার বগলাসুন্দরী দেবী, বিন্দুবাসিনী দেবী এবং বরিশালের দুর্গামণি পাইনের নামও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।[৬]

বাঙলার এইসব দুঃসাহসী বিপ্লবী নারীদের দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করত বাঙলার ছাত্রীদেরও। বিপ্লবী ওই রমণীরা শুধুমাত্র বিপ্লবী পরিবারের সদস্যারূপে নিকটজনকে পুলিশী অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচানোর তাগিদেই যে বিপ্লবী আন্দোলনে পা বাড়িয়েছিলেন—এমনটা বলা যায় না। বরং সচেতন দেশপ্রেমিক, রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী মানসিকতার দ্বারাও তাঁরা অনেকাংশেই পরিচালিত হতেন। এক্ষেত্রে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা কিছু কম নয়। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষিতা এবং পরবর্তীকালের ছাত্রী আন্দোলনে তাঁদের একটা প্রভাব পরোক্ষভাবে থেকেই গিয়েছিল।

## দীপালি সংঘ: ছাত্রীসংগঠনের আদিপর্ব

১৯২০-এর দশকের সূচনাপর্বেই গান্ধীজীর আহ্বানে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত পরিবারের এবং জীবন-জীবিকার সঙ্গে যুক্ত নিম্নবর্গের গ্রামীণ নারীরাও এই ব্রিটিশ-বিরোধী উত্তাল আন্দোলনের শরিক হন। স্কুল-কলেজের

সচেতন ছাত্রীরাও কমবেশী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। গান্ধীবাদী গণআন্দোলনের জোয়ারে বেশ কিছুদিনের জন্য থমকে যায় বিপ্লবী দলের সশস্ত্র কার্যকলাপ। কিন্তু অকস্মাৎ ১৯২২-এ চৌরিচৌরার বিচ্ছিন্ন একটি গণরোষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান্ধীজী যখন দেশব্যাপী এই বিশাল আন্দোলনকে প্রত্যাহার করে নিলেন, নিঃসন্দেহে তখন বিক্ষুব্ধ তরুণ দল, ছাত্র-যুবকেরা কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রতি হতাশ হয়ে পুনর্বার বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে নবীন উৎসাহে সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। স্বভাবতই বাঙলার সচেতন শিক্ষিতা মেয়েরাও এগিয়ে এলেন এই কাজে।

বাঙালী ছাত্রী ও শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে দেশপ্রেমের যে অংকুর-উদ্‌গম লক্ষ্য করা গিয়েছিল ১৯০০—১৯২০ পর্বে, বিশের দশকে (১৯২০-৩০) তা পরিপূর্ণ ভাবে শাখায় পল্লবে বিকশিত হয়ে ওঠে। এই প্রস্ফুটিত চেতনাসম্পন্ন নারীসমাজের পুরোভাগে ছিলেন অবশ্যই বাঙলার ছাত্রীসমাজ। বিভিন্ন ধরনের নারী সংগঠন, নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ, বিপ্লবী নেতাদের সংস্পর্শ ও তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ, নিষিদ্ধ পুস্তিকা এবং লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে বিপ্লবী ভাবধারা তখন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছিল। ছাত্রীসমাজের এই পরিব্যাপ্ত রাজনৈতিক চেতনা শুধুমাত্র শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, তাদের নিজস্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও তা রূপায়িত হতে শুরু করে। এক্ষেত্রে **'দীপালি সংঘ'**-র ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'দীপালি সংঘ'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন লীলা নাগ (রায়)। বাঙলাদেশে অপূর্ব সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে যে দু'চারজন সুশিক্ষিতা তরুণী বাঙলার ছাত্রীদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে প্রতিভাদীপ্ত ছিলেন এই লীলাবতী নাগ। ঢাকার এক বিখ্যাত ধনী পরিবারের তরুণী কন্যাকে ১৯২১ সালে যখন 'নিখিল বঙ্গ নারী ভোটাধিকার কমিটি'র সহসম্পাদক পদে গ্রহণ করা হয়, তখন লীলাবতী মাত্র বি. এ. পাশ করেছেন। এই সময়েই কংগ্রেসের আহ্বান তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯২৩ সালে এম. এ. পাশ করার পর যখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত গণ-আন্দোলনের রোমাঞ্চকর স্মৃতি ম্লান হয়ে আসছে, স্বরাজ হাতের মুঠোয় আসেনি, যখন শুধু 'চরকা কাটো' আর 'তাঁত বোনো' মন্ত্রে তরুণ-চিত্ত আর উদ্বুদ্ধ হয় না—সেই সময়ে লীলাবতী নাগ বারোজন সঙ্গী নিয়ে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'দীপালি সংঘ'। ক্রমশ লীলা নাগ তাঁর সহপাঠী বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ের সমাজসেবী সংগঠন 'শ্রীসংঘ'-র সহযোগিতায় গড়ে তুললেন 'দীপালি স্কুল' (পরে কামারুন্নেসা গার্লস হাইস্কুল), দুটি বারো ফ্রি প্রাইমারী স্কুল এবং পরে 'নারীশিক্ষা মন্দির', 'শিক্ষা ভবন' প্রভৃতি ইংরাজী উচ্চবিদ্যালয়। ঢাকায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে ও প্রসারের ব্রতে লীলা নাগ এভাবেই উদ্যোগী হন।

১৯২৬ সালে বিপ্লবী অনিল রায়ের 'শ্রীসংঘ' (এটি ছিল বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ পন্থীদের একটি বিপ্লবী সংস্থা, যদিও সমাজসেবাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য ) এবং লীলা নাগ-এর 'দীপালি সংঘ' মিলে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দীপালি ছাত্রী সংঘ'। ১৯৩০ থেকে লীলা নাগের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে 'জয়শ্রী' পত্রিকা। শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, নারী জাতির সার্বিক বিকাশ ও শিক্ষার প্রসারও এঁদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেইসময় ঢাকাতে 'দীপালি ছাত্রী সংঘ'-র অন্যতম সদস্যা ছিলেন রেণুকা সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শকুন্তলা রায়, বীণাপাণি রায়, উষারাণী রায় প্রমুখ।[৭]

ইতিমধ্যে 'দীপালি ছাত্রী সংঘ'-র শাখা বাঙলার বিভিন্ন জেলাতেই অল্প-বিস্তর ছড়াতে শুরু করেছে। ১৯২৮-এর কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'ছাত্রীসংঘ'। কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য), সুরমা মিত্র, মমতা দাশগুপ্ত, লীলা রায় ( মজুমদার ) প্রমুখের উদ্যোগে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। কুমিল্লায় প্রতিভা ভদ্র, পারুল মুখার্জি, ত্রিপুরায় শান্তি ঘোষ, প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম, বরিশালে শান্তিসুধা ঘোষ, অপরাজিতা ঘোষ প্রমুখ ছাত্রীনেত্রীরা ছিলেন সংগঠনের মুখ্য স্থপতি। এঁরা নানাভাবে হেমচন্দ্র ঘোষ পরিচালিত গ্রুপের নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বিপ্লবী অনিল রায় ছিলেন ( পরে লীলাবতী নাগের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ) 'ছাত্রীসংঘ'-র প্রধান পরিচালক।[৮] একটি জনকল্যাণকামী সমাজসেবী সংগঠনরূপে গড়ে উঠলেও 'দীপালি ছাত্রী সংঘ' শিক্ষিতা তরুণীদের মধ্যে গোপনে কাজ করে চলতো বিপ্লবী নারী কর্মী রিক্রুট করার জন্য। এঁদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার কাজও গোপনে চালিত হতো এই সংঘের মাধ্যমে। ১৯৩০ সালে দীপালি সংঘ কলকাতায় মেয়েদের একটি হোস্টেলও ('ছাত্রীভবন') খুলেছিল। উল্লেখ্য, ঐ বছর থেকেই প্রকাশিত হতে শুরু করে রবীন্দ্রস্নেহধন্য 'জয়শ্রী' পত্রিকা, যা উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সেই সময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

## সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী বিপ্লবে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ :

১৯২৮ সালে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে লতিকা ঘোষের ( ইনি মনমোহন ঘোষের কন্যা ও অরবিন্দ ঘোষের ভাইঝি ; 'মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ'-র প্রতিষ্ঠাতা নেত্রী ) নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্রর নির্দেশে ১২৮ জন ছাত্রী স্বেচ্ছাসেবিকার সামরিক পোশাকে সুসজ্জিতা হয়ে পুরুষদের সঙ্গে শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন, যা ছিল তৎকালীন পটভূমিকায় একটি দুঃসাহসিক কাজ।

এর পূর্বেই অবশ্য 'সাইমন কমিশন' বিরোধী আন্দোলনে সর্বপ্রথম

বাঙলার ছাত্রীসমাজ ছাত্রদের সঙ্গে মিলিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন পুরনো নিয়ম-শৃংখল ছিন্ন করে। ১৯২৮-এর ৩রা ফেব্রুয়ারি কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে 'সাইমন কমিশনের' বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্রধর্মঘট পালিত হয়। পুলিশ প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করে ছাত্র-ইউনিয়নের সম্পাদক প্রমোদ ঘোষাল ও অন্যান্য ছাত্রদের উপর লাঠিচালনা করে। প্রতিবাদে কলকাতার অন্যান্য কলেজেও ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে এসে সমবেত হন কলেজ স্কোয়ারে। বেথুন কলেজের ছাত্রীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেদিন শামিল হয়েছিলেন এই ঐতিহাসিক ছাত্রধর্মঘটে। বলা যায়, ওই দিনই সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের বীজ প্রোথিত হয় বাঙলার মাটিতে। ছাত্রীরা ছিলেন এর অন্যতম প্রধান শরিক।[৯]

কলকাতা কংগ্রেসের পর (১৯২৮) জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের লজ্জাজনক 'গান্ধী-প্রস্তাব' জাতীয় বিপ্লবী ও বামপন্থীদের হতাশ করেছিল। ঘরে বসে শুধু চরকা কাটলেই যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্তি আসে না, এই উপলব্ধি বাঙলার নারীসমাজের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। ছাত্রীদের বিপ্লববাদী সশস্ত্র আন্দোলনে যোগদান তাই 'অসংগঠিত' হলেও ছিল অত্যন্ত বাস্তব ঘটনা। ১৯৩১-এ গান্ধী-আরুইন বৈঠকের লজ্জাজনক পরিণতি এবং গান্ধীজীর আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা বাঙলার স্বাধীনতা-কামী তরুণ মানসে কংগ্রেস নেতৃত্বের আপোসকামিতার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সঞ্চার করে এবং বাঙলায় পুনর্বার সশস্ত্র বিপ্লববাদকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেয়।

১৯৩০-এর দশকে যে গুপ্তসমিতিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তারা নারী-সমাজকে সশস্ত্র বৈপ্লবিক প্রয়াসে যুক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহ দিতেন। নারী জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের জন্য এই বিপ্লবী সমিতিগুলি উৎসাহ থাকলেও বিপ্লবী কাজে বা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে (এ্যাকশন্) মেয়েদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেওয়া তাঁরা অনেকেই পছন্দ করতেন না। এমনকি বিপ্লবের কাজে ও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁরা আদৌ নারী-পুরুষের সমঅধিকার স্বীকার করতেন কিনা সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন ইতিহাসের গবেষক অধ্যাপিকা মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মতে দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া বিপ্লবী নেতাদের দ্বারা মেয়েরা প্রায়শই ব্যবহৃত হতেন তাঁদের নির্দেশ পালনের কাজে।[১০] তবে এটা অস্বীকার করা যায় না যে, 'অনুশীলন', 'যুগান্তর', 'শ্রীসংঘ', হেমচন্দ্র-র 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স', 'বেণু গোষ্ঠী' ('চলার পথে' ছিল এই গোষ্ঠীর মুখপত্র), মাষ্টারদা সূর্য সেন পরিচালিত 'চট্টগ্রাম বিপ্লবী দল'—এইসব গুপ্ত সমিতিতেই নারী সমাজ বা ছাত্রীদের জন্য একটি করে পৃথক বিভাগ বা সেল গঠিত হয়েছিল। দায়িত্বপ্রাপ্ত বিপ্লবী নেতারা

অনেকেই প্রধানত ছাত্রীদের মধ্য থেকে নারী-বিপ্লবী সংগ্রহ বা রিক্রুট করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতেন বিপ্লবী কাজের যোগ্য করে ছাত্রীদের গড়ে তোলা, মানসিক ও শারীরিক ভাবে প্রস্তুত করে গুপ্ত কাজে ব্যবহার, অস্ত্রশিক্ষা দান, রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশ নেওয়া এবং ক্ষেত্রবিশেষে বড় অপারেশনে নেতৃত্ব দানের যোগ্য করে তোলাও ছিল গুপ্ত সমিতিগুলির প্রধান কাজ। ছাত্রী সমাজের ( স্কুল ও কলেজ ) একাংশ এই বিপ্লবী প্রচেষ্টায় যুক্ত থাকলেও তা ছিল একান্তই ব্যক্তিগত ভাবে অংশগ্রহণ ; সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের শরিক তাঁদের বলা চলে না।

ছাত্রী ও তরুণীদের যাঁরা বিপ্লবী কাজে টেনে এনেছিলেন তাঁদের অন্যতমা কয়েকজন হলেন 'যুগান্তর' দলের কমলা চট্টোপাধ্যায় ( মুখার্জি ), চট্টগ্রামের ইন্দুমতী সিংহ, কল্পনা দত্ত ( যোশী ), শ্রীসংঘের রেণুকণা সেনগুপ্ত, অনুপমা বসু, হেলেনা বল প্রমুখ। বিপ্লববাদী নেত্রী বলতে তখন সুপরিচিত ছিলেন বিমলপ্রতিভা দেবী, লীলা নাগ, কল্যাণী দাস ও প্রতিভা ভদ্র ( রায় )। এঁরা অনেক তরুণী ও ছাত্রীকে সশস্ত্র বিপ্লবী কাজে টেনে এনেছিলেন। যেমন, লীলা নাগ ( রায় )-এর সহকর্মীদের মধ্যে সেইসময় রেণু সেন, বীণা রায়, শকুন্তলা চৌধুরী, সুশীলা দাশগুপ্ত, হেলেনা দত্ত, ঊষা রায়, সীতা সেন, অনুপমা বসু, লতিকা দাস ( সেন ), রেণুকণা দত্ত প্রমুখ বিপ্লবী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের সকলেই যে তখনও ছাত্রী ছিলেন এমন নয়, কিন্তু স্কুল-কলেজের ছাত্রীসমাজকে এঁরা বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে প্রভাবিত করতে পারতেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সিলেট শহরের 'তরুণ সংঘ'-র অন্যতম নেত্রী সুজাতা দত্ত ( সিংহ রায় )-র নাম। সিলেট ( শ্রীহট্ট )-এর অন্যতম বিশিষ্ট আইনজীবী ক্ষীরোদচন্দ্র দত্ত র গোটা পরিবারই ছিল বিপ্লবী ও পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত। তাঁর ছোট কন্যা সুজাতা ( সিলেটে 'সু' নামেই সুপরিচিতা ) তিরিশের দশকে আইনী, বে-আইনী সবরকম শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে শ্লোগানে শ্লোগানে রাস্তা মুখরিত করে তুলতেন। দুঃসাহসী প্রচেষ্টাতেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। শ্রীহট্ট-র ছাত্রী-সমাজে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল।[১১]

ঢাকার লীলাবতী নাগের মতো কলকাতার কল্যাণী দাসের সহকর্মীদের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সুলতা কর, সুহাসিনী দত্ত, শান্তিসুধা ঘোষ, প্রভাতনলিনী দেবী, লীলা কামাল, সুতপা দেবী, অমিয়া দেবী প্রমুখ এঁদের অন্যতম। ১৯২৮ সালে বি. এ. পাশ করার পর কল্যাণী দাস (পরে ভট্টাচার্য) যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ার সময় যখন 'ছাত্রীসংঘ' গঠন করেছিলেন (যুগান্তরদলের বিশিষ্ট বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারের সঙ্গে ছাত্রীসংঘের

ঘনিষ্ঠতা ছিল ) তখন তাঁর সহযোগী ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন সুরমা মিত্র, কল্পনা দত্ত, সুহাসিনী গাঙ্গুলি, কমলা দাশগুপ্ত, ইলা সেন, বীণা দাস, মমতা দাশগুপ্ত প্রমুখ।

কুমিল্লার প্রতিভা ভদ্র-র সহকর্মীদের মধ্যে বনলতা সেন, কল্যাণী মুখার্জি, কিরণ চক্রবর্তী, কিরণ দুগার, নির্মলা রায়, সুষমা রায়, উমা চক্রবর্তী প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক গৌতম নিয়োগী তাঁর গবেষণা নিবন্ধে এবিষয়ে সঠিকভাবেই বলেছেন ঃ[১২] "দেশপ্রেমের যে অংকুর উদ্গম হয়েছিল ১৯০০—১৯২০ পর্বে, সেই সময়েই তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। ১৯২০—৩০-এর দ্বিতীয় পর্বে তা শাখায় শাখায় বিকশিত হয়ে ওঠে। এই বর্ধিত চেতনার নারীসমাজের পুরোভাগে ছিল অবশ্যই ছাত্রী সমাজ।" নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিপ্লবী ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগ, বিপ্লবীদের সংস্পর্শ ও তাদের সঙ্গে কথোপকথন, 'নিষিদ্ধ পুস্তিকা বা 'লিফলেট' ইত্যাদির মাধ্যমে। ছাত্রীসমাজের এই পরিব্যাপ্ত চেতনা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, তাদের নিজস্ব সংগঠনের প্রতিষ্ঠার মধ্যেও তা রূপায়িত হতে শুরু করে। তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে গৃহের অভ্যন্তরেও।

বস্তুপক্ষে এরই প্রতিক্রিয়ায় কলকাতার বেথুন স্কুল থেকে বরাবরই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ছাত্রীরা বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যোগ বজায় রেখেছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এছাড়া কলকাতার ভিক্টোরিয়া বা ডায়াসেশানের মতো ভাল স্কুলেও এই ভাবধারার সংক্রমণ ঘটে। পূর্ব বাংলার স্কুলগুলিতেও এর প্রভাব পড়ে। সেখানে চট্টগ্রামে ডাঃ খাস্তগির গার্লস স্কুল, কুমিল্লার ফৈজুন্নিসা গার্লস স্কুল, ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী স্কুল, ঢাকার এডেন ফিমেল স্কুল ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করে বিপ্লবী আন্দোলনের সুযোগ্যা নারী কর্মীদের। রেণুকা রায়ের আত্মজীবনীতেই[১৩] জানা যায় যে বেশ কয়েকটি কলেজের, বিশেষতঃ ডায়াশেসনের ছাত্রীরা গান্ধীজী কলকাতায় এলেই তাঁর বক্তৃতা শুনতে যান। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে লতিকা ঘোষের স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীতে বিভিন্ন কলেজের প্রায় ২০০ জন ছাত্রী যোগ দেন। এই সালেই সুরমা মিত্রকে ও কল্যানী ভট্টাচার্য ( দাশ )-কে সম্পাদিকা করে কলকাতায় যে 'ছাত্রীসংঘ' গড়ে ওঠে তাতে ব্রাহ্মবালিকা, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিট্যুশন, বেথুন স্কুল ও কলেজের বেশ কিছু ছাত্রী সক্রিয় সদস্যা রূপে যোগদান করেন।[১৪] এই সময় থেকেই কলকাতায় শিক্ষিতা মেয়েরা ও নামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরাও সাংগঠনিক কাজে একা একা ট্রামে বাসে ঘুরতে থাকেন, ঘরে ঘরে প্রচার ও চাঁদা তোলার কাজে ক্রমশই অসংকোচে যুক্ত হন।[১৫]

দেশবন্ধু জায়া বাসন্তী দেবী নিঃসন্দেহে ছিলেন এক্ষেত্রে সুশিক্ষিতা

ছাত্রীসমাজের কাছে অন্যতম প্রেরণা। যদিও বাসন্তী দেবী ছিলেন কংগ্রেসী ধারার অনুসারী তথাপি গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে বাসন্তী দেবী, ঊর্মিলা দেবী ও অন্যান্য নেত্রীরা প্রায়শই ছাত্রীদের স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে ডাক দিতেন। কলেজ স্ট্রিট, ওয়েলিংটন স্কোয়ার এবং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট এলাকা দিয়ে স্বেচ্ছাসেবিকাদের মিছিল প্রায়ই বের হতো। ছাত্রীসমাজকে স্বাধীনতা সংগ্রামে আকৃষ্ট করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ছাত্রীরাও এই আহ্বানে উল্লেখযোগ্য ভাবেই সাড়া দিত।[১৬]

কলকাতার তথা বাংলার রাজনীতি সচেতন শিক্ষিত এমন কি সম্পন্ন পরিবারের মেয়েদের উপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস-জায়া বাসন্তী দেবীর বেশ কিছুটা প্রভাব ছিল। সি. আর. দাশের কারাবন্দীর সময় বাসন্তী দেবী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি (১৯২১-২২) রূপে কাজ করেন এবং ১৯২২ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বলতে গেলে বাসন্তী দেবীই ছিলেন প্রথম মহিলা নেত্রী যিনি বাংলার শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিলেন। এর পরবর্তীকালে অবশ্য 'মহিলারাষ্ট্রীয় সংঘ' গড়ে উঠলে (১৯২৭) সুভাষচন্দ্রের মা প্রভাবতী দেবী হন সভাপতি ও সম্পাদিকা লতিকা ঘোষ।[১৭] স্বভাবতই মেয়েদের শিক্ষিত অংশের মধ্যে এঁদের আকর্ষণ ছিল অনস্বীকার্য। মেয়েরাও যে দেশকে ভালবাসতে পারে এবং রাজনৈতিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেই দেশপ্রেমের প্রমাণ রাখতে পারে ২০শের দশকে বাঙলার ছাত্রী-সমাজের কাছে এই দৃষ্টান্তই তুলে ধরেছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের বাঙালী নেতৃবৃন্দ। উনিশশো ত্রিশের দশকের সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামে শিক্ষিতা নারীসমাজের ও ছাত্রীদের অংশগ্রহণে তাই কংগ্রেসী ধারার অবদান কম নয়।

## সশস্ত্র-সংগ্রামে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ : ঘটনাবলী

১৯৩০-এর দশকেই দেখা গেল সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিপ্লবী নেতৃত্ব বাঙলার দামাল ছাত্রী ও শিক্ষিতা মেয়েদের হাতে ব্রিটিশ প্রশাসনিক কর্তাদের নিধনের জন্য তুলে দিচ্ছেন আগ্নেয়াস্ত্র। বস্তুত ত্রিশের দশকেই ডিরেক্ট অ্যাকশানে নামতে দেখা গেল বাঙলার মেয়েদের। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন স্কুল কলেজের ছাত্রী কিংবা সদ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে আসা সুশিক্ষিতা মেয়ে। বয়সে সকলেই তরুণী বা যুবতী এবং ছাত্রীসংগঠনগুলির মাধ্যমেই তারা বিপ্লবী আন্দোলনে প্রধানতঃ সামিল হন।

১. ১৯৩০-এর ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ এবং অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সমগ্র

দেশে অনুপ্রেরণার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এর পরিণতিতে নারী ও ছাত্রীসমাজও উদ্বুদ্ধ হন প্রত্যক্ষ ভাবে বিপ্লবী কাজকর্মে অংশ নিতে। মাত্র ১৭ বছরের তরুণী কল্পনা দত্ত ছিলেন এক্ষেত্রে মাষ্টারদা সূর্য সেনের অন্যতমা সহকারী।

২. ১৯৩১-এর ৫ মে কল্পনা দত্ত মাষ্টারদার নির্দেশমতো ডিনামাইট ষড়যন্ত্রে অংশ নেন। চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের নেতা সূর্য সেন তখনও মুক্ত ছিলেন। যদিও তাঁর দলের অনেকে ধরা পড়েছিল। ডিনামাইট দিয়ে জেলখানা উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর করা সম্ভব হয় নি।

৩. ১৯৩১-এর ১৪ ডিসেম্বর দুই স্কুল ছাত্রী শান্তি ঘোষ এবং সুনীতি চৌধুরী কুমিল্লার জেলাশাসক স্টিফেন্সকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেন তারই কামরায়। স্কুলে পরীক্ষা দিতে যাবার অছিলায় এই দুই বীরাঙ্গনা কিশোরী ছাত্রী অভিভাবকদের লুকিয়ে এই অসমসাহসী কাণ্ড ঘটায়।

৪. ১৯৩২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গভর্নর স্টানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন ২১ বছর বয়সী সদ্যস্নাতক বীণা দাস। তিনি কারাবদ্ধ হন।

৫ ১৯৩২-এর ২৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে ২১ বছর বয়স্কা তরুণী বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা বহু ইংরাজকে হতাহত করেন। ধরা পড়ার আগেই প্রীতিলতা আত্মহত্যা করেন। তাঁর মৃত্যুকালীন জবানবন্দী একটি চিঠিতে তিনি লিখে গিয়েছিলেন যার ছত্রে ছত্রে আগ্নেয় ভাষায় মেয়েদের আত্মশক্তি উদ্বোধনের আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট। প্রীতিলতা সমগ্র দেশকে দেখিয়ে দিয়ে যান যে দেশপ্রেমিক বাঙালী ললনাও স্বাধীনতার জন্য শত্রুর প্রাণ নিতে এবং নিজের প্রাণ দিতে পিছপা নয়।

৬. ১৯৩৪-এর ৮ মে দার্জিলিঙের লেবং মাঠে গভর্নর জন এ্যান্ডারসনকে গুলি করার পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষ অংশ নেন উজ্জ্বলা মজুমদার। এ্যান্ডারসন প্রাণে বেঁচে যান, কিন্তু ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য ভবানী ভট্টাচার্য এবং রবীন্দ্র ভট্টাচার্যকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তরুণী উজ্জ্বলা মজুমদারকে দেওয়া হয় ১৪ বছরের দীর্ঘ কারাদণ্ড। রবীন্দ্রর মৃত্যুদণ্ড অবশ্য পরে রদ হয়েছিল।

৭. ১৯৩৩ থেকে আন্তঃপ্রাদেশিক টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় যুক্ত থাকার জন্য অনেক অনুসন্ধানের পর ১৯৩৫-এর ২০ জানুয়ারি ধরা পড়েন পারুল মুখার্জি। তাঁকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়।

৮. মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট বার্গ-কে হত্যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন উষা সেন।

এরকম আরো অনেকেরই নাম করা যায়। এঁরা ছিলেন হয় ছাত্রী, নয়তো ছাত্রীদল থেকেই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন।[১৮]

বস্তুত সেই ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই যে ভাবে বাঙালী রমণী পরাধীনতার শৃংখল মোচনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন অনেকটা তারই অনুপ্রেরণায় বলা যায় ১৯৩০-৩২-এর সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে শিক্ষিতা বাঙালী মেয়েদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ঘটে। এরই পটভূমিকা ব্যাখ্যা করে অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী নেতা অমরেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন :[১৯]

> "More and more women came forward to join the movement. The pioneering move of Basanti Devi and Urmila Devi ( Sister of Deshbandhu ) in 1921 brought in a number of educated ladies into the Stormy Political life of the Province. Santosh Kumari Gupta, Dr. Prabhabati Dasgupta and Latika Ghosh worked in the Congress as well as in the trade union movement. Jyotirmoyee Ganguli and Indumati Goenka ( belonging to the Orthodox Marwari Community ) Courted imprisonment in the initial Stages of the Civil Disobedience Movement. Kalyani Das and Ila Sengupta, both Postgraduate Students were active workers. The latter made history on one occasion when she refused to move away before a charge of mounted Police."

এছাড়াও আইরিশ ও রাশিয়ান নারী বিপ্লবীদের ( ভেরা প্রমুখ ) জীবনী ও অন্যান্য দেশের মুক্তি সংগ্রামের গল্পও শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতো সন্দেহ নেই। তাছাড়া 'পথের দাবী'-র ভারতী চরিত্রের আকর্ষণও ছিল অমোঘ। ছাত্রীসমাজের মধ্যে এইসময় বিপ্লবী কাজে এবং দেশের পরাধীনতা মোচনের সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষভাবে প্রেরণা যুগিয়েছিল ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত দুটি পত্রিকা এবং একটি গল্প সংকলন গ্রন্থ। ১৯৩০ সালেই দীপালি সংঘের নেত্রী লীলা নাগ-এর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'জয়শ্রী' নামক মহিলাদের পত্রিকা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য এই পত্রিকা প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণতই পরিচালিত হত মহিলাদের দ্বারা। এর লেখকগোষ্ঠীও প্রধানতঃ ছিলেন সমাজের উচ্চশিক্ষিতা প্রগতিশীলা মহিলারা। লীলা নাগের অবর্তমানে অথবা তাঁর বর্তমানেও বিশেষ কারণে যাঁরা জয়শ্রীর সম্পাদিকার দায়িত্ব গ্রহণ

করেছিলেন তাঁদের নাম হল শকুন্তলা দেবী, বীণাপাণি রায় ও উষারাণী রায়। শিক্ষিতা বাঙালী রমণীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও সমাজ সচেতনতা সঞ্চারে 'জয়শ্রী' ত্রিশের দশকে বিশেষ অবদান রেখে গেছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত অপর মাসিকপত্র 'বেণু' ছিল বকলমে হেমচন্দ্র ঘোষের 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স" দলেরই মুখপত্র। প্রথমে ১৯২৬ সালে ৯৩।১।এফ, বৈঠকখানা রোড থেকে রেবতী বর্মণের (পরবর্তী কালের কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক নেতা) চেষ্টায় 'বেণু' একটি কিশোর-মাসিকপত্র রূপে প্রকাশিত হয় (বৈশাখ, ১৩৩৩) সতীকান্ত গুহ, মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় নামক তিন কিশোরের সম্পাদনায়। শেষোক্ত কিশোর ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের নিকট আত্মীয়। যাইহোক হেমচন্দ্র কিন্তু পরের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকেই বেণুকে শুধুমাত্র 'কিশোর সাহিত্য পত্রিকা' রূপে সীমাবদ্ধ না রেখে বিপ্লবী দলের মুখপত্রে পরিণত করলেন। ঢাকা থেকে ভূপেন রক্ষিত রায় এসে 'বেণু'র সম্পাদনায় ব্রতী হলেন।

অচিরেই 'বেণু'র লেখাগুলি দেশের কিশোর সাহিত্যে এক বিপ্লব এনে দিল। অভূতপূর্ব এক জীবনোন্মাদনায় বাঙলার কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীর প্রাণ দুলে উঠলো। এক সময়ে 'বন্দেমাতরম্,' 'যুগান্তর', বা 'সন্ধ্যা' কাগজ যেমন বাঙালীকে স্বাধীনতা কামনায় উন্মাদ করেছিল—ঠিক তেমনি 'বেণু'ও তরুণ মানসে বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দেশপ্রেমের দাবানল সৃষ্টি করেছিল। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'বেণু'কে সাহায্য করতেন। বিনা পারিশ্রমিকে বেণুতে লিখতেন। রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের সহযোগিতাও লাভ করেছিল এই অসাধারণ পত্রিকাটি। কিন্তু মাত্র ছয় বছর চলার পর ১৯৩২ সালে রাজরোষে 'বেণু' বন্ধ হয়ে গেল। তবে নিছকই একটি শিশু পত্রিকা না হয়েও, বাঙলার শিশু ও কিশোর সাহিত্যে 'বেণু' নতুন পথ নির্দেশ দিয়ে গেল।

এ প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য যে 'বেণু' ছিল অল্পবয়সী মেয়েদের কাছেও ভীষণ প্রিয়। তবে 'বেণুর' আহ্বান নারীপুরুষ প্রত্যেক তরুণ প্রাণের কাছেই অপ্রতিহত আবেগে পেঁছালেও বাঙলার মেয়েদেরকে বোমা-পিস্তল হস্তে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমে পড়বার আহ্বান বিশেষ করে জানিয়েছিল 'বেণু' সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর লিখিত ছোট গল্পের একখানা সংকলন গ্রন্থ। তার নাম 'চলার পথে'। বইটির প্রচ্ছদে ছিল এক ভয়ংকর সুন্দর শৃঙ্খলমুক্তা নারীর চিত্র। তার দুহাতে তখনো টুকরো হয়ে যাওয়া শৃঙ্খলখণ্ড জড়িয়ে আছে। পায়ের শৃঙ্খলও দ্বিখণ্ডিত। চিত্রের নীচে লেখা, "ভাঙনের পালা শুরু হল আজি, ভাঙ্গ ভাঙ্গ শৃঙ্খল।" ১৯২৯-এর ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় 'চলার পথে'। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকার

গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেছিল, কিন্তু তাতে ফল হয়েছিল উল্টো। গোপনে বাঙলার সচেতন ছাত্রী সমাজের হাতে হাতে স্কুল-কলেজে ছড়িয়ে গেল সেই গল্পগ্রন্থ। 'চলার পথে'র নায়িকাবৃন্দ বাঙলার যৌবন ধর্মের আদর্শ প্রতীক হয়ে বাঙালীর কন্যাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাক দিল। সেই ডাক উপেক্ষা করা বড় সহজ নয়। পরবর্তীকালে 'চলার পথে' নামে একটি মাসিক মুখপত্র প্রকাশ করেন বি, ভি, নেতৃবৃন্দ।[২০]

জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে বাঙলার নারীসমাজের যে অংশটি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল তার অধিকাংশই ছিলেন অল্পবয়স্কা তরুণী এবং ছাত্রী বা সদ্য ছাত্রজীবন শেষ করা শিক্ষিতা ভদ্রপরিবারের মেয়ে। মধ্যবিত্ত এমন কি ধনী ভূস্বামী পরিবার থেকেই প্রধানতঃ এরা আসতেন। দরিদ্র শ্রেণীর অংশগ্রহণ খুব স্বাভাবিক ভাবেই ছিল অত্যন্ত কম। বিশেষ করে মুসলিম পরিবারের মেয়েরা বিপ্লবী আন্দোলনে তো বটেই এমনকি কংগ্রেসী বা মুসলিম লীগ প্রভাবিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও প্রায় একেবারেই অংশগ্রহণ করতেন না। রক্ষণশীলতার নিগড়ে তারা তখন সম্পূর্ণভাবেই বাঁধা। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে শিক্ষার প্রসার হিন্দু নারীদের মধ্যে যে গতিতে হয়েছিল সেই তুলনায় মুসলিম নারীসমাজ ছিল (বেগম রোকেয়ার ও অন্যান্য সংস্কারকদের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও) অনেকটাই পিছিয়ে।

তথাপি বিপ্লবী আন্দোলনের ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনাপর্বে নারীর ভূমিকা অনেকাংশেই ছিল গৌণ এবং তাদের চৈতন্য প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ছিল পুরুষ প্রভাবিত। নারী আন্দোলনের বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপিকা মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়ের মতে; বিপ্লবী আন্দোলনে পুরুষ বিপ্লবী-নেতৃত্ব নারীদের পার্শ্বভূমিকাতেই রাখতে বেশি অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিতে নয়।

অবশ্য দ্বিতীয় পর্বে লক্ষ্যণীয় যে নারী সমাজের চেতনা অনেক প্রসারিত এবং তারা আর পূর্বের মতো সর্বদা পুরুষ সমাজের উপর তেমন নির্ভরশীল নয়। পুরুষ বিপ্লবী নেতারা এক্ষেত্রে তাদের সহযোগীর ও সহযোদ্ধার ভূমিকায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে—তা সে কংগ্রেস-আন্দোলনই হোক বা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাই হোক, বাঙলার শিক্ষিত নারীসমাজ নিজেদের ভূমিকাকে মোটেই গৌণ মনে করছেন না; এক্ষেত্রে তাঁরা পূর্বের তুলনায় এগিয়ে আসছেন অনেক প্রত্যক্ষভাবে। এই অগ্রসরমান ও বিস্তৃত চেতনার রূপ লক্ষ্য করা যায় 'দীপালি সংঘ', 'ছাত্রী সংঘ', 'রাষ্ট্রীয় মহিলা সংঘ' ইত্যাদি নানা সংগঠনের জন্ম ও ক্রমশ বাঙলার নানা জেলায় ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে। লীলা নাগ, কল্যানী দাস, প্রতিভা ভদ্র, লতিকা ঘোষ প্রমুখের নেতৃত্ব এই পর্বে উল্লেখযোগ্য।

চূড়ান্ত পর্বে দেখা যায় যে বর্ধিত রাজনৈতিক চেতনা নারীসমাজের শিক্ষিত অংশকে টেনে এনেছে একেবারে স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্মুখসারিতে।

তাঁরা অংশ নিচ্ছেন সশস্ত্র ডাইরেক্ট এ্যাকশন বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। শিক্ষিতা তরুণী ও ছাত্রীরা এই শেষ পর্বে পূর্বের তুলনায় আরো অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেছিলেন বিপ্লবী কাজে। বিপ্লবী নেত্রী কমলা দাশগুপ্তর মতে,[২২] "অভিভাবকদের অনেকেরই ভয় ছিল সমাজের নিন্দার, ভয় ছিল কন্যার বিবাহ না হওয়ার, ভয় ছিল পুলিশের অত্যাচারের, ভয় ছিল নিজের চাকরি যাবার, ভয় ছিল কন্যার উপর রাজরোষের।" তবু কোনো বাধাই শেষপর্যন্ত প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারেনি বিপ্লবী কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে। এক বলিষ্ঠ আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসচেতনতাবোধ জন্ম নিচ্ছিল বাঙালী মেয়েদের মধ্যে। 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'—এই আশা পোষণ করে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার জোর গলায় বলেন[২৩]: "যত কঠিন বা ভয়ংকর কাজই হোক না কেন, ভারতের নারী সমাজকে তাদের ভাইদের থেকে পিছিয়ে থাকবে না। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের কম উপযুক্ত বা দুর্বল মনে করা নিছক অন্যায়।" এই সাহসী উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক গৌতম নিয়োগী তাঁর এক নিবন্ধে সঠিকভাবেই বলেছেন, এই গভীর আত্মপ্রত্যয়ের পিছনে ছিল সামাজিক মূল্যবোধ ও সম্পর্কের ক্রম-বদল, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির বিবর্তন, শিক্ষার প্রসার এবং নারীজাতির আত্মনির্ভর হয়ে ওঠা। বাঙালী হিন্দু যৌথ পরিবারের যাবতীয় রক্ষণশীলতা ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের স্বর্ণশৃংখল ছিন্ন করে ক্রমশই মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত মেয়েরা অধিক সংখ্যায় ঘর থেকে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশ ও দশের কাজে। পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ ও গোয়েন্দাবাহিনী বাঙালী পরিবারগুলির রক্ষণশীল সামাজিক নিয়মবিধির উপর আস্থা রেখে অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেন না। প্রথমদিকে বাঙালী মেয়েদের বা স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের উপর পুলিশের তেমন সন্দেহ পড়েনি, গুপ্ত বিপ্লবী দলগুলিও অবাধে তাঁদের ব্যবহার করার সুযোগ পেতো। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা ডিরেক্ট এ্যাকশনগুলি শাসকশ্রেণীর ধারণাকে আমূল বদলে দেয়। ফলে ১৯৩১ সালের পুলিশ রিপোর্টেই তারা লিখতে বাধ্য হয়:

"To the authors of the (terrorist) propaganda may be attributed the responsibility for the descent of Hindu bhadra-loke girls to deeds of cowardly assassination. The participation of women in terrorist conspiracy is no new development but until 1931 they had not stopped to assassination."[২৪]

যাইহোক এর ফলে বাঙলার নারীবিপ্লবীদের উপর নেমে আসে ব্রিটিশ সরকারের চরম দমন-পীড়ন। শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী নাবালিকা বলেই ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পেলেন। ন'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

দেওয়া হল বীনা দাসকে। ছ'বছরের জন্য কল্পনা দত্ত [ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ] চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড পান উজ্জ্বলা মজুমদার। বন্দী বা অন্তরীণ হন শত শত নারী। বিপ্লবী বাঙালী বীরাঙ্গনাদের ভূমিকা এক্ষেত্রে গৌরবময়। কিন্তু অচিরেই ব্যক্তিগত সন্ত্রাস সৃষ্টির রাজনৈতিক হঠকারিতা পরিত্যাগ করে বাঙালী দেশপ্রেমিক ও রাজনীতি সচেতন নারীসমাজ ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ফিরে আসতে শুরু করলেন জাতীয়তাবাদী গণআন্দোলনের মূল ধারায় এবং নিঃসন্দেহে সংগঠিত ছাত্রী-আন্দোলন ছিল এই প্রচেষ্টায় তাঁদের অনুপ্রেরণা প্রধান।

## স্বরাজ-এর ডাক ও সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলনের গোড়া পত্তন

সশস্ত্র বিপ্লববাদী ধারার পাশাপাশি ১৯২০ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের কাছে জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত ও গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আহ্বানও কিন্তু কম উন্মাদনা সৃষ্টি করেনি। বরঞ্চ বলা চলে বাঙলাদেশে অন্তত সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের গোড়াপত্তনে জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত অসহযোগ-আন্দোলন ( ১৯২০-২১ ) ও আইন অমান্য-আন্দোলনের ( ১৯৩০-৩১ ) অবদান ছিল বিশেষ উল্লেখ্য।

১৯২০-তে জাতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে গান্ধীজীর নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হল। ১৯২১-এর ৩১ আগস্ট এর মধ্যে তিনি স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করলেন। খিলাফৎ কমিটির সঙ্গে একত্রে ডাক দিলেন অসহযোগ আন্দোলনের। ১৮৫৭-র পর পরাধীন ভারতে পুনরায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা ঘটলো।

ছাত্রসমাজও পিছিয়ে থাকলো না। বলা যায় ভারতবর্ষে প্রথম সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলনের গোড়াপত্তন ঘটলো এই অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই। নাগপুর অধিবেশন চলাকালীনই ( ১৯২০ ) সেখানে অনুষ্ঠিত হল সারা ভারত ছাত্র সম্মেলন। গান্ধীজী ছাত্রদের উদ্দেশে সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানালেন। তাঁর মতে 'শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজ নয়।' ১৯৪৬-এর ভারতব্যাপী উত্তাল গণআন্দোলনের সময় কিন্তু গান্ধীজী আর ভুলেও একথা বলেননি। যাক্, সে অন্য প্রসঙ্গ।

১৯২০-র অক্টোবর-নভেম্বর থেকেই দলে দলে ছাত্র-ছাত্রী স্কুল কলেজ শূন্য করে বেরিয়ে আসতে শুরু করলো সারা ভারত জুড়ে। সব থেকে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখালো বাঙলার ছাত্রসমাজ। স্কুল-কলেজে বয়কটকে তারা এক স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলনের স্তরে উন্নীত করলো। কলকাতার

বিদ্যাসাগর, রিপন (পরে সুরেন্দ্রনাথ) ও সিটি কলেজের ছাত্ররা হাজারে হাজারে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো সত্যাগ্রহ আন্দোলনে। ১৯২১-এর ২০ জানুয়ারি স্বরাজের দাবিতে পরিপূর্ণ ধর্মঘট হল কলকাতার সমস্ত স্কুল-কলেজে। প্রায় তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রী ধর্মঘট করে জমায়েত হলো মীর্জাপুর (শ্রদ্ধানন্দ) স্কোয়ারে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বয়ং সেই সভাতে ছাত্রদের অভিনন্দন জানিয়ে বললেন: "বাংলার ছাত্রসমাজ, আমি তোমাদের নমস্কার করি।"[২৫] বাঙলার ছাত্রশক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে গান্ধীজীও বাণী পাঠালেন: 'এবিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহই নেই যে বাঙলার ছাত্রসমাজই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে।' ১৯২১-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী কলকাতায় এসে এরপর 'জাতীয় মহাবিদ্যালয় (National College)'-এর উদ্বোধন করেন।[২৬] প্রায় ৫০ হাজার স্কুল ছাত্র এবং ৩০ হাজার কলেজ ছাত্র সারা বাঙলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে সত্যাগ্রহ ও বয়কট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। স্বেচ্ছাসেবক রূপে তারা নগরে মহকুমা অঞ্চলের বিদেশী বস্ত্র ও মদের দোকানে পিকেটিং করতো। ১৯২১-এর ১৭ই নভেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলস-এর ভারত আগমনে সারা দেশের সঙ্গে বাঙলার ছাত্র-ছাত্রীরাও সর্বাত্মক হরতাল ও ধর্মঘটে সামিল হন। বহু ছাত্র সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে বিতাড়িত হন, অনেকে কারাবরণ করেন। গান্ধীর ডাকে ইতিমধ্যেই গোটা দেশে উল্লেখযোগ্য অংশে নারী সমাজ সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। বাঙলাতেও বিভিন্ন জেলা শহরে ছাত্রীরাও ছাত্রদের পাশাপাশি এই জাতীয়তাবাদী গণআন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিল, যদিও যথেষ্ট মাত্রায় রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব সত্যিই সেইসময় তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

যাইহোক সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলনের এটুকু ইতিহাস বিকৃত না করলে কংগ্রেসীধারার জাতীয় আন্দোলনে ছাত্রীদের অংশগ্রহণের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তীকালে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জেলায় ও কলেজে ছাত্রসংসদ ও সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু তার স্থায়ী কোনো সাংগঠনিক কাঠামো ছিল না। ১৯২৪ সালে বীরেন দাশগুপ্ত 'ক্যালকাটা স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেছিলেন। ১৯২৬ সালে বাগবাজারের পশুপতি বসুর বাড়িতে সর্বপ্রথম 'Students Association' গঠিত হয় কিন্তু সেটাও ছিল অস্থায়ী? ১৯২৮ সাল ছিল বাঙলার ছাত্র-আন্দোলনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওই বছর ৩রা ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশনের ভারতে আসার প্রতিবাদে কলকাতায় সর্বাত্মক ছাত্রধর্মঘট পালিত হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রনেতা প্রমোদ ঘোষাল পুলিশের লাঠিতে গুরুতর আহত হন। এর প্রতিবাদে সর্বস্তরের ছাত্র-ছাত্রীর এক ঐতিহাসিক সমাবেশ

ঘটে কলেজ স্কোয়ারে। বেথুন কলেজের ছাত্রীরা ওইদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। কলেজে ছাত্রী ধর্মঘট পালিত হয়। যাইহোক প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ স্টেপলটন্ হিংস্র দমননীতির পথ গ্রহণ করেন। প্রমোদ ঘোষাল সহ বেশ কয়েকজন ছাত্রকে বিতাড়িত করা হয় কলেজ থেকে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ ও ইডেন হিন্দু হোস্টেল।

প্রেসিডেন্সীর পর সব থেকে জোরালো ধর্মঘট হয়েছিল স্কটিশচার্চ কলেজে। সেই কলেজের ছাত্রনেতা শচীন্দ্রনাথ মিত্রকেও বিতাড়িত করেন স্কটিশচার্চ কলেজ কর্তৃপক্ষ। স্কটিশচার্চ কলেজেও অব্যাহত থাকে ছাত্র ধর্মঘট। সরকার ও স্বৈরাচারী কলেজ কর্তৃপক্ষের হিংস্র দমননীতির সামনে দাঁড়িয়ে ছাত্রসমাজের সবচেয়ে সচেতন অংশ অনুভব করলেন যে তাঁদের সংগ্রামী ঐক্যকে একটি স্থায়ী রূপ দিতে হবে।

১৯২৮-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি অ্যালবার্ট হলে জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সংগ্রামী ছাত্রদের একটি সম্মেলন হল। ৬ই মার্চ প্রমোদ ঘোষালের সভাপতিত্বে হল আরো বড় ছাত্র সমাবেশ। প্রাদেশিক সংগঠন গড়ার জন্য গঠিত হল একটি আহ্বায়কমণ্ডলী প্রমোদ ঘোষাল, শচীন মিত্র, বীরেন দাসগুপ্ত, রেবতী বর্মণ ও অক্ষয় সরকারকে নিয়ে। ১৯২৮ এর ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ( মীর্জাপুর স্কোয়ার ) অনুষ্ঠিত হল প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন সদ্য রাশিয়া প্রত্যাগত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে। প্রায় ৫০০ জন ছাত্র প্রতিনিধি যোগ দিলেন এই সম্মেলন। গঠিত হল 'নিখিলবঙ্গ ছাত্র সমিতি' বা A. B. S. A। সভাপতি প্রমোদ ঘোষাল, সম্পাদক বীরেন দাশগুপ্ত।[১৭] ওয়ার্কিং কমিটিতে নেওয়া হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনেত্রী কল্যাণী দাসকে। ইতিমধ্যেই লতিকা ঘোষের নেতৃত্বে স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা জাতীয় কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনে স্বেচ্ছা-সেবিকার দায়িত্ব পালনের প্রশিক্ষণও শুরু করেছে। ছাত্রীরা এইভাবেই ধীরে ধীরে আসতে শুরু করলেন সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের প্রথম সারিতে।

এ. বি. এস. এ. জন্মলগ্ন থেকেই গঠনমূলক কর্মসূচীর ভিত্তিতে জেলায় জেলায় ছাত্র-সম্মেলন-এর দ্বারা তাদের সংগঠনকে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হল। ছাত্রনেতারা ছাড়াও এইসব ছাত্রসম্মেলনে বক্তৃতা করতেন প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ও মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। রেবতী বর্মণ-এর মতো মার্কসবাদী ছাত্রনেতা তো ছিলেনই। ১৯২৯ সালেই ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধে শুরু করেন দীর্ঘ চারবছর ব্যাপী মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। অপরদিকে ছিল জওহরলাল নেহরুর সমাজতন্ত্রের সপক্ষে মত

প্রচার। সব মিলিয়ে সংগঠিত ছাত্রকর্মীদের একাংশের মধ্যে বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

কিন্তু এই বিপ্লবী পরিস্থিতিতে বাঙলার সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন তার উপযুক্ত ভূমিকা কিন্তু পালন করতে পারল না। ১৯২৯-এর সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ ছাত্রসংগঠন দু'টুকরো হয়ে গঠিত হয়—'নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি' (A.B.S.A) এবং 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রসমিতি' (B.P.S.A)। অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: অবশ্য অধিকাংশ সাধারণ ছাত্রকর্মী এই ঝগড়াতে বিক্ষুব্ধ হ'ল ও নেতাদের নির্দেশ মতো সংকীর্ণ উপদলীয় কলহের বাঁধা ছকে চলতে রাজী হ'ল না। হাজার হাজার ছাত্র আইন অমান্য করল, নির্ভয়ে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করল।[২৮]

১৯৩০-৩১-এ গান্ধীজীর আহ্বানে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল বাঙলার জেলায় জেলায়। বিশেষ করে মেদিনীপুরে তা উত্তাল রূপ ধারণ করে। স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছেলে মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই আন্দোলনে। বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার তাঁর স্মৃতি-কথায় লিখেছেন: "অসহযোগ আন্দোলনেও মেয়েরা যোগ দিয়েছিল। কিন্তু এবার তারা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে বিপুল সংখ্যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার মেয়েদের নতুন মর্যাদা দান করে। তারা আর অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠিত নয়। বীরাঙ্গনার বেশে সমান মর্যাদায় পুরুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। আমাদের শহরেও তার ঢেউ লাগে।"[২৯] [ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ]। শুধু রাজশাহী নয় আইন অমান্য আন্দোলনে সম্ভবতঃ সবথেকে বেশি ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণ ঘটে। ছাত্রীর সংখ্যা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই চিত্র যেমন মেদিনীপুরের তমলুক শহরে, তেমনি যশোরে, বরিশালে, খুলনায়, ঢাকায়, চট্টগ্রামে, কলকাতায় এবং অন্যত্র জেলা সদরে। এর ফলে বাঙলাদেশের ছাত্র ও যুবশক্তির বিরুদ্ধে কার্যতঃ যুদ্ধ ঘোষণা করতে হ'ল ইংরেজ শাসকদের। সেই যুগের এক জীবন্ত বর্ণনা দিয়ে জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: "বাঙলার বহু অঞ্চলে তখন এক অভূতপূর্ব অবস্থা। যেসব ছেলে বা মেয়ের বয়স ১২ থেকে ২৫-এর মধ্যে, তাদের প্রত্যেককে সর্বদা সঙ্গে রাখতে হ'ত সরকারি পরিচয়পত্র। হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে বিতাড়িত হল, স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হল।...পুলিশের কাছে বহু ছাত্রকে নিয়মিত হাজিরা দিতে হত, সূর্যাস্তের মধ্যে বাড়ি ফিরতে হত।"[৩০] যেন গোটা অঞ্চল এক বন্দী শিবির।

এই সময়কালে বরিশালের ছাত্রীরা এক চাঞ্চল্যকর আন্দোলনের সূত্রপাত করে। ১৯৩০ সালের ৬ এপ্রিল গান্ধীজী লবণ আইন ভঙ্গ করবার জন্য

পায়ে হেঁটে ডাণ্ডি যাত্রা শুরু করেন। ১২ এপ্রিল তিনি গ্রেপ্তার হন। এর পর থেকেই বরিশাল শহরে স্কুল-কলেজে, রাস্তায়, মদের ও বিলাতী বস্ত্রের দোকানে ছাত্র-ছাত্রীরা পিকেটিং চালাতে থাকে। বরিশাল কলেজেও জুলাই মাসের কোনো একদিন কলেজের প্রবেশ পথের মাটিতে শুয়ে পড়ে ছাত্রীরা ছাত্র-শিক্ষকদের পথ রোধ করে। খবর পেয়ে একজন পুলিশ সার্জেণ্ট (যিনি নিজে ছিলেন একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান) মোটর সাইকেলে বৃটিশ পতাকা (ইউনিয়ন জ্যাক্) লাগিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। উপস্থিত সিপাইদের দিয়ে তিনি কলেজপথে প্রতিরোধকারী ছাত্রীদের সরানোর চেষ্টা করলে মেয়েরা সমস্বরে শ্লোগান দিতে থাকে 'up up national flag, down down union Jack'। ঠিক এমনি সময়েএক দুঃসাহসী ছাত্রী এসে সার্জেণ্টের মোটর সাইকেল থেকে 'ইউনিয়ন জ্যাক'টি, দূরে ছুড়ে ফেলে দেয় এবং সেখানে কংগ্রেসের একটি ত্রিবর্ণ পতাকা লাগিয়ে দেয়। সার্জেণ্ট দৌড়ে এসে ছাত্রীটির গালে একটি চপেটাঘাত করে পতাকাটি ছিঁড়ে ফেলে। ঘটনা পরম্পরায় ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণও এসে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। তুমুল হৈ-চৈ ও বিক্ষোভের মুখে পুলিশ ব্যাটন চার্জ শুরু করলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। এইভাবেই বরিশালে শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়, ছাত্রীরাও ছিলেন যার অন্যতম শরিক।[৩১]

সেই সময়ে তমলুক শহরের ছাত্র-আন্দোলনের কর্মী প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা বিশ্বনাথ মুখার্জি স্মৃতিচারণে লিখেছেন:[৩২] বঙ্গদেশে আইন-অমান্য আন্দোলন প্রবলতম আকার নিয়েছিল মেদিনীপুর জেলায় এবং তারও মধ্যে তমলুক ও কাঁথি মহকুমাতেই সবচেয়ে প্রবল হয়েছিল।···আমরা এই মহকুমার ছাত্র সমাজকে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল করতে পেরেছিলাম। শহরে এবং গ্রামে সব ক'টি হাইস্কুলে আমরা সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত করতে পেরেছিলাম এবং ব্রিটিশ শাসকদের প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও একাদিক্রমে প্রায় ৬ মাস সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখতে পেরেছিলাম।"

আন্দোলন সংগ্রামে মেয়েদের অংশগ্রহণের প্রশ্নে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন তৎকালীন ছাত্র নেতা অমরেন্দ্রনাথ রায়: "More and more women came forward tojoin themovement···JyotimoyeeGanguliandIndumati Goenka (belonging to the orthodox Marwari Community) Courted imprisonment in the initial Stages of the Civil Disobedience Movement Kalyani Das and Ila Sen Gupta both post-graduate students were active workers. The latter made history on one occation when She refused to move away before a

charge of mounted police.''৩৩ সেইসময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ-গ্রহণের মধ্য দিয়ে ছাত্রীসমাজ এরকমই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন।

যাইহোক কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের এই জোয়ার বেশিদিন চললো না। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯৩১-এর ২৩ মার্চ লাহোর জেলে ফাঁসি দেওয়া হল তরুণ বিপ্লবী নায়ক ভগৎ সিং ও তাঁর দুই সহযোদ্ধা রাজগুরু ও শুকদেবকে। আর ঠিক সেই সময় আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলেন গান্ধীজী। স্বাক্ষরিত হল বিতর্কিত গান্ধী-আরউইন চুক্তি। দারুণ রোষে ফেটে পড়ল ভারতের ছাত্রসমাজ। করাচী কংগ্রেসে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কালো পতাকা নিয়ে তারা মিছিলে শ্লোগান তুললো: 'নওজোয়ান কো কেয়া মিলা? ভগৎ সিং কা ফাঁসী মিলা।' ভারত সহ বাঙলার ছাত্রসমাজও উপলব্ধি করলো জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ-এর পথ নিয়েছে। তিরিশের দশকের প্রথমার্ধে সেই আশাহত কিন্তু সংগ্রামী বাঙলার ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ ঝাঁপিয়ে পড়লেন সশস্ত্র বিপ্লববাদী সন্ত্রাসে। সে প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

## সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলনের শরিক বাঙলার ছাত্রীসমাজ:

১৯৩৫ সালে জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে বহু তরুণ-বিপ্লবী কমিউনিজমে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। ছাত্রদের মধ্যে তখন একদল মানবেন্দ্রনাথ রায়পন্থী, কেউ সৌম্যেন ঠাকুরপন্থী, কেউ লেবার পার্টির সমর্থক, আবার কোনোদল সোস্যালিস্টদের সপক্ষে। তবে যে গোষ্ঠীরই হোক না কেন প্রত্যেকেই অনুভব করে সন্ত্রাসবাদী পথে নয়, স্বাধীনতা আসবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জঙ্গি ছাত্র আন্দোলনের পথে। ইতিমধ্যেই (১৯৩৪) সদ্য গড়ে ওঠা A. B. S. A. এবং B. P. S. A. ছাত্র সংগঠন দুটির বিলোপ ঘটে। 'কমিউনিস্ট ছাত্রলীগ' নামক সংগঠনটিও নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হওয়ায় ফলে বিলুপ্ত হয়। ঐক্যবদ্ধ একটি ছাত্রসংগঠনের পতাকার তলে মিলিত হবার দাবি ও প্রত্যাশা তখন সব গ্রুপের সংগ্রামী ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যেই প্রতিফলিত হচ্ছে। ১৯৩৫-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র লীগ'। এর সম্পাদক নির্বাচিত হলেন বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। এর বয়েকমাস পরেই লক্ষ্ণৌতে যখন জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলছে তখনই সেখানে অনুষ্ঠিত হল 'সারা ভারত ছাত্র সম্মেলন'। এতে সভাপতিত্ব করলেন মহম্মদ আলি জিন্না, উদ্বোধন করলেন জওহরলাল নেহরু। জাতীয়তাবাদী ছাত্র নেতা প্রেম নারায়ণ ভার্গবকে সম্পাদক করে জন্ম নিল 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' (১৯৩৬)। এরপরই বাঙলার সমস্ত ছাত্র গ্রুপগুলি একত্রিত হয়ে ১৯৩৬ এর অক্টোবরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের

সমাবেশ থেকে গড়ে তুললেন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' (B.P.S.F.), সভাপতি কে. এম. আহ্মেদ এবং সম্পাদক হলেন কালীপদ মুখার্জি। বাঙলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের এটা একটি যুগ সন্ধিক্ষণ। বছর খানেকের মধ্যেই বি. পি. এস. এফ-এর সম্মেলনে (ডিসেম্বর, ১৯৩৭) কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ মুখার্জিকে সম্পাদক পদে নির্বাচিত করে সংগঠনের সুস্পষ্ট গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচী প্রণীত হল যা ছিল কার্যতঃ বে-আইনী কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক দলিলেরই ছাত্রসংস্করণ। অবশ্য এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব দাবি-দাওয়ার বিষয়টিও এতে গুরুত্ব পায়। একইভাবে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন ও বামপন্থী ছাত্রদের দ্বারাই মূলতঃ পরিচালিত হতে থাকলো।

১৯৩৮, '৩৯ ও '৪০ সালই ছাত্রফেডারেশনের স্বর্ণযুগ। সারা ভারতেই ছাত্র ফেডারেশন এই সময় এক বিশাল ছাত্র আন্দোলনের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় জীবনে এক বিশিষ্ট শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে সারা ভারতের মধ্যে অখন্ড বঙ্গদেশের ছাত্র আন্দোলন এবং ছাত্র ফেডারেশনই ছিল সবচেয়ে অগ্রণী ও সবচেয়ে শক্তিশালী। এই অভিমত স্বয়ং বিশ্বনাথ মুখার্জির।[৩৪]

আইন অমান্য আন্দোলনের পর ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই চার বছর সময়কাল ছিল বাঙলার ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাসে ভাটার যুগ। ছাত্রীরা এই সময়ে তেমন ব্যাপকভাবে ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেনি যদিওসশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলনের নারীকর্মীরা তাদের উদ্বুদ্ধ করতো। যাইহোক ইতিমধ্যে কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও স্কুলে ছাত্রীদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। শুধুমাত্র অভিজাত বা উচ্চ মধ্যবিত্তরাই নয় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এলো অসংখ্য মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরাও। তাদের একটা বড় অংশ প্রত্যক্ষভাবে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনে সামিল হয়ে গেল ১৯৩৭-এর 'বন্দীমুক্তি আন্দোলন'কে কেন্দ্র করে।

১৯৩৭-এর ২৪ জুলাই আন্দামান-বন্দী ১৮৭ জন বিপ্লবী অনশন ধর্মঘট শুরু করেন—দেশে ফেরার ও মুক্তির দাবিতে। কিন্তু এই বন্দী মুক্তির প্রশ্নে বাঙলার কৃষক-প্রজাদল ও মুসলিম লীগ কর্তৃক গঠিত কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা বন্দীমুক্তির প্রশ্নে নীরব থাকে। আন্দামানে নির্বাসিত রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে ধর্মঘটে মিছিলে উত্তাল হয়ে ওঠে বাঙলার ছাত্রসমাজ। ২ আগস্ট টাউন হলে বন্দীমুক্তির দাবিতে যে জনসভা হয়, তাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্রী এইদিনের ছাত্র মিছিলে ও টাউন হলের সভায় যোগদান করে। সমকালীন সংবাদপত্র-

গুলিতেই এর সাক্ষ্য রয়েছে। বিশেষ করে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র (ইংরাজি) তৎকালীন ছাত্রআন্দোলনের বিস্তৃত রিপোর্ট পাওয়া যেত।

১৫ই আগস্ট ( ১৯৩৭ )-এর অমৃতবাজার-এ প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায় ১৪ আগস্ট সারা বাঙলা তথা ভারতে আন্দামান-বন্দীমুক্তি দিবস পালিত হয়। ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে সেদিন কলকাতার সমস্ত স্কুল ও কলেজে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট হয় উত্তর ভারতের বহু শহরের কলেজগুলিতেও। কলকাতায় ছাত্রদের দীর্ঘ এক মাইল লম্বা মিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে যাত্রা করে স্ট্রান্ড রোডে এলে, পুলিশ তাদের উপর বর্বর লাঠিচালনা করে। ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, উমাপদ মজুমদার ও আরো ২০ জন ছেলেমেয়ে আহত হন।[৩৫]

এই লাঠি চালাবার প্রতিবাদে পরদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিরাট জনসভা হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন শরৎচন্দ্র বসু। প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী ধর্মঘট ও মিছিল করেন ( দ্র. অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৮ আগস্ট, ১৯৩৭ )। ছাত্রদের সমর্থন আইন সভার কংগ্রেস, কৃষক-প্রজা ও কমিউনিস্ট দলের সদস্যরা বুকে কালো ব্যাজ পরিধান করেন। ১৭ আগস্ট শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ছাত্রদের আর একটি বিরাট সভা থেকে ঘোষণা করা হয় যে আন্দামান বন্দীরা দেশে ফেরৎ না আসা পর্যন্ত ছাত্র সংগ্রাম চলতেই থাকবে। ২৮ আগস্ট বন্দীমুক্তির দাবিতে আবার সারা বাঙলায় ছাত্র ধর্মঘট সংগঠিত হয়। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ছাত্র সভাতে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রনেতা নন্দলাল বসু। কিছু-দিনের মধ্যেই ছাত্রদের এই আন্দোলন শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলির অংশ-গ্রহণের মাধ্যমে গণআন্দোলনের রূপ পেল। স্বয়ং গান্ধীজী আন্দামান বন্দীদের অনশন ভাঙার আবেদন জানালেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার। বন্দীরা অনশন প্রত্যাহার করলেন। তাদের দেশের কারাগারে ফিরিয়ে আনা হল, যদিও সম্পূর্ণভাবে বন্দীমুক্তি হল আরো পরে। এইভাবে বন্দীমুক্তি আন্দোলন পরিচালনার মধ্য দিয়েই সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হল।

ছাত্র আন্দোলনের অন্যতমা নেত্রী গীতা রায়চৌধুরী ( পরে মুখার্জি ) ছাত্র আন্দোলনে সামিল হন এই বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই। এক সাক্ষাৎকারে[৩৬] তিনি বলেছেন : "মনে পড়ে একটা গরমের ছুটির পর স্কুল খুলল।...রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে কতকগুলো ছেলে চেঁচাচ্ছে—আন্দামান বন্দীদের মুক্তির দাবিতে। তাঁরা বক্তৃতা করছিলেন আন্দামান বন্দীদের মুক্তির দাবি করে, মর্মস্পর্শী বিবরণ দিচ্ছিলেন কিভাবে তাঁদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ।···আন্দোলনের এবং অত্যাচারের চিত্রকল্প বর্ণনা শুনতে শুনতে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি, অনুভব করি আন্দামান বন্দীদের

মুক্তির দাবিতে ছাত্রধর্মঘট অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করে সেদিন আমরাও স্কুলে ধর্মঘট করলাম। এই ভাবে প্রথম নামলাম সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের ময়দানে। অন্তরের টানে, স্বদেশের টানে। ঔৎসুক্য বোধ করলাম, ছাত্র আন্দোলনের কর্মী হয়ে গেলাম যশোর জেলায়।"

এরপর একের পর এক ছাত্র আন্দোলনের আর ধর্মঘটের তরঙ্গ সৃষ্টি হল। ১৯৩৮। স্কটিশ চার্চ কলেজ, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ, খুলনার দৌলতপুর কলেজ, ঢাকার জগন্নাথ কলেজে একের পর এক স্বেচ্ছাচারী কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন। এতে বহুসংখ্যক ছাত্রীও যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৩৯ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে বি. পি. এস. এফ. গণ-সাক্ষরতা অভিযান সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিল। ইউনিভারসিটি ইনস্টিটুটে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে বয়স্ক সাক্ষরতা দান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ দিয়ে ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালে ব্যাপক সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীকে গ্রামে পাঠাতে পেরেছিল 'ছাত্র ফেডারেশন'।[৩৭]

যাইহোক বলা চলে, ১৯১৩-৪০ সালে বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই বাঙলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছিল। অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেত্রী ( পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট কর্মী ) কমলা চ্যাটার্জি (মুখার্জি) স্কুলে থাকতেই যোগ দিয়েছিলেন টেররিস্ট আন্দোলনে। ১৯২৯ সালে পড়তে এলেন কলকাতার কলেজে। জড়িয়ে পড়লেন আইন অমান্য আন্দোলনে। কিন্তু তাঁর ভাষায়, "সেকেণ্ড ইয়ারের শেষে মনে প্রশ্ন জাগল। তখনকার দিনে শ্রমিক—কৃষকদের কথা নিয়ে একটা কাগজ বেরোতো। আমরা পড়তাম। মনে হল এর মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের নতুন পথের সন্ধান আছে। সম্পাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়ে চিঠি লিখলাম। কিন্তু জবাব আসার আগেই ধরা পড়ে গেলাম। জেলে রইলাম ৬ বছর। ফিরে যখন এলাম তখন নতুন পথে পা বাড়ালাম। তখনকার দিনে কমিউনিস্ট পার্টি তার হাতে-গোণা মহিলা কর্মীদের পাঠাত শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে। স্কুলে পড়াতাম, নিজে পড়তাম, ছাত্রসংগঠনের মধ্যেও কাজ করতাম,আর সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় যেতাম খিদিরপুরে শ্রমিক বস্তিতে। সুধা রায়, মলিন-এরাও ছিল। তারপরের দিকে যেতাম ধাঙর বস্তিতে।...

"এই সময়ে বের করলাম মেয়েদের কাগজ 'মন্দিরা।' সেকালের মহিলা ও ছাত্রী রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে কমিউনিস্ট আদর্শ প্রচারে এক বছর ধরে তা খুব সাহায্য করেছিল। ওই সময়ে মেয়েদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রসার ছিল বড় একটা কাজ। '৩৯-'৪০ সালে আমাদের কেবলই মেয়েদের ক্লাস হত। ভবানীবাবু, হীরেনবাবু এঁরা সব ক্লাস নিতেন। আবার আমরা গিয়ে

মেয়েদের হস্টেলে হস্টেলে ক্লাস নিতাম। ইতিমধ্যে আমাদের মহিলা কর্মীর সংখ্যাও বাড়তে শুরু করলো।"[৩৮]

এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধা কমিউনিস্ট নেত্রী রেণু চক্রবর্তী তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন "বৃটিশরাজ 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়ে যেসব বিপ্লবীদের জেলে বন্দী রেখেছে তাদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তিশালী হচ্ছে এবং মেয়েরাও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। এই আন্দোলনের ফলে কিছু বন্দী ছাড়া পেলেন কিন্তু অনেকেই জেলখানায় আটকে রইলেন। নানা রাজনৈতিক মত-বাদের মেয়েরা, কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন মেয়েরা এই বন্দী-মুক্তি আন্দোলনে একত্রে সমবেত হলেন। ৯১নং প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে একটা অফিস খোলা হল। ওখান থেকেই মহিলা রাজনৈতিক কর্মীরা তাদের আন্দোলন সংগঠিত করতেন। একত্র হয়ে সকলে মিলে কংগ্রেস মহিলা সংঘ গড়ে তুললেন। ওতে ছিলেন শ্রীসঙ্ঘের লীলা রায়, যুগান্তর গ্রুপের বীণা দাস ও কমলা দাসগুপ্ত, যুগান্তরের ভূতপূর্ব সদস্য কমলা চ্যাটার্জী যিনি পরে গোপন যুগের কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যা হলেন এবং আরও নানা মতের মেয়েরা। সম্মিলিত মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার এই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা। রাজনৈতিক মহিলা কর্মীরাই ছিলেন এর পুরোভাগে। কংগ্রেস মহিলা সংঘের মুখপত্র হিসাবে 'মন্দিরা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হোল। এটি ছাপা হোত সরস্বতী প্রেসে এবং এর সম্পাদিকা ছিলেন কমলা চ্যাটার্জী। বছর খানেক কমলা চ্যাটার্জী এটা চালালেন। কিন্তু তার পরেই কমিউনিস্ট বিরোধী মনোভাব শুরু হওয়ায় তিনি ছেড়ে দিলেন। নতুন সম্পাদিকা হলেন কমলা দাশগুপ্তা।[৩৯]

এই স্মৃতিকথাগুলি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বাঙলার নারী আন্দোলনে একদিকে যেমন মার্কসবাদী বা কমিউনিস্ট চিন্তাধারার প্রসার ঘটছিল, তেমনি অপরদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজনীতি সচেতন ছাত্রী-সমাজ ও নারীসমাজের অংশগ্রহণও দুটি সুস্পষ্ট পৃথক ধারায় বিভক্ত হয়ে যাচ্ছিল। একটি কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ধারা (যাতে নানা গ্রুপের বিপ্লবী মেয়েরা অংশগ্রহণ করছিল) এবং অপরটি জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয়তাবাদী ধারা। তবে বন্দীমুক্তি আন্দোলনের ক্রমশই শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছিল এবং বে-আইনী ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল তার পুরোধা। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রী ও নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েদের সংখ্যাও বাড়তে থাকলো।

### ছাত্রী-সংগঠনে কমিউনিস্ট প্রভাব :

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে দিল্লীতে 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডা-

রেশনের (এ. আই. এস. এফ.) জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সদ্য কংগ্রেস-ত্যাগী সুভাষচন্দ্র বসু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এখানে স্থির হল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং একই সঙ্গে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতেও আন্দোলন চলবে। এই সম্মেলনে যোগদানকারী সদ্য বিলেত প্রত্যাগত মহিলা নেত্রী রেণু রায় (চক্রবর্তী) এর স্মৃতিচিত্রণ উল্লেখযোগ্য : "এ আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ছাত্রদের ডাকা বড় বড় সভা ও মিছিলে ছাত্রীরাও বহুসংখ্যায় যোগ দিতে লাগলো। এ চিত্র ছিল সারা ভারত ব্যাপী। এ অবস্থায় ছাত্রীদের একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হোল। ছাত্র ফেডারেশনে ছাত্র সংখ্যা স্বভাবতঃই বেশী। ছাত্রীরা বহু সংখ্যায় এতে যোগ দিতে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। ছেলে মেয়েদের এক সঙ্গে পড়াশুনা করতেও অভিভাবকদের মনে বাধা ছিল। স্কুল কলেজে সহশিক্ষা তখনও সচল হয়নি। যাঁরা কন্যাদের উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে দিতে চাইতেন তাঁরাও ছেলেরাই যেখানে বেশী তেমন কলেজে মেয়েদের পড়তে দিতে আপত্তি করতেন। সুতরাং এ. আই. এস. এফ. সিদ্ধান্ত নিল ছাত্রীদের জন্য একটি পৃথক কমিটি করবার।...১৯40 সনে লক্ষ্মৌতে ভারতের সব প্রদেশ থেকে আগত ছাত্রী মেয়েদের একটি সমাবেশ হোল। এটি ছিল ছাত্রীদের প্রথম সারাভারত সম্মেলন।"[৪০]

অবশ্য এর পূর্বেই বাঙলায় ১৯৩৭-এ বি. পি. এস. এফ. (বিশ্বনাথ মুখার্জি'র নেতৃত্বাধীন)-এর রাজ্যকমিটির অনুমোদনে ছাত্রীদের সংগঠিত করার জন্য 'গার্লস স্টুডেন্টস্ কমিটি' তৈরী হয়েছিল। শান্তি সংকার, উমা ঘোষ, গীতা রায়চৌধুরী (মুখার্জি), অনিমা ব্যানার্জি, শোভা মজুমদার, কল্যাণী মুখার্জি এবং কনক মুখার্জি ছিলেন এই কমিটির সংগঠক। এরমধ্যে শোভা মজুমদার ছিলেন এম. এন. রায় গ্রুপের, অনিমা ব্যানার্জী ছিলেন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি'র লোক। ১৯৩৮-এ প্রধানতঃ এঁদেরই উদ্যোগে 'গার্ল স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়। প্রীতি ব্যানার্জি ছিলেন এর অন্যতম উদ্যোক্তা। কনক দাশগুপ্ত (মুখার্জি) ছিলেন এর প্রথম সম্পাদিকা। তিনি তখন বেথুন কলেজের ছাত্রী।

লক্ষ্মৌতে যে প্রথম সারাভারত ছাত্রী সম্মেলন হয় তাতে সভানেত্রী হন রেণু চক্রবর্তী। বিলাতে থাকাকালীনই তিনি কমিউনিজমে আস্থাশীল হয়েছিলেন। এই সম্মেলন উদ্বোধন করে শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু ছাত্রীদের সম্বোধন করে বলেন,[৪১] "দেশের ভবিষ্যৎ তোমাদেরই হাতে, যদি তোমরা গৃহাভ্যন্তরের একঘেয়েমী অলসতায় জীবনের অপচয় না করো।" তিনি আরো বলেন, "ছাত্রদের সঙ্গে সম্মিলিত হও এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান প্রবাহ ধারার সঙ্গে যুক্ত হও।" সভানেত্রীর ভাষণে রেণু চক্রবর্তী লক্ষ্মৌ

সম্মেলনে ছাত্রী সমাজের সামনে তুলে ধরেছিলেন ফ্যাসিবাদের বিপদের কথা। লক্ষ্ণৌ কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতের অন্য প্রদেশগুলিতে ছাত্রী সংঘ স্থাপনের মাধ্যমে পৃথক ভাবে ছাত্রীদের সংগঠিত করার কাজ শুরু হয়।

এ প্রসঙ্গে বর্তমানের প্রবীণা কমিউনিস্ট নেত্রী কনক মুখার্জি'র স্মৃতিচারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন:[৪২] "জি. এস. এ (গার্লস স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন্)-এর আলাদা গঠনতন্ত্র না থাকলেও আলাদা নিয়মাবলী ছিল। আমাদের লক্ষ্ণৌ কনভেনশন ১৯৪০-এর জানুয়ারীতে হয়েছিল। আমাদের দাবির মধ্যে ছিল মেয়েদের জন্য আরও স্কুল, আরও কলেজের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তখন রাজনৈতিক অবস্থা অন্যরকম ছিল। এখনও সমস্যা অনেক। কিন্তু তথাপি কাজের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা অনেক বেড়েছে। ...এখনকার মতই ছাত্রীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে গিয়ে ছাত্রীদের সামনে আমরা কিছু আশু নিজস্ব কলেজ ভিত্তিক দাবি তুলতাম। একদিকে যেমন মেয়েদের পড়াশুনা শেখাতে হবে—এটা নিয়ে আমাদের দাবি ছিল, সেই সঙ্গে সামাজিক নিপীড়ন, অত্যাচার ইত্যাদির বিরুদ্ধেও আমাদের দাবি ছিল, আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

"১৯৩৮-এ গার্লস স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন তৈরী হবার পর ১৯৩৯-এ যুদ্ধ বাধে। এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের কাজ স্বভাবতই খুব বেশী অগ্রসর হয়নি, যা উল্লেখ করার মত। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আমরা যে উদ্যোগ নিয়েছিলাম সেটাই বোধ হয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হবার দাবি রাখে।...

"লক্ষ্ণৌতে জি. এস. এ-র কনভেনশনের পর বিভিন্ন প্রদেশে এর বিভিন্ন শাখা গড়ে তুলতে আমরা উদ্যোগ নেই।...আমরা ছাত্রীদের স্কুল কলেজে আসবার জন্য তাদের বাড়ী গিয়ে অভিভাবকদের ছাত্রীদের শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোঝাতাম।" 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক গার্লস স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশনে'র পুরোভাগে ছিলেন কমিউনিস্ট মেয়েরাই।

১৯৪০ সালের একটি স্মরণীয় ছাত্র ধর্মঘট হয়েছিল 'স্কটিশ চার্চ কলেজে'। নির্বাচিত ছাত্র সংসদের দাবিতে এই ধর্মঘট-আন্দোলন চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে। সহ-শিক্ষামূলক কলেজ স্কটিশের অনেক ছাত্রীই এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন বিদেশী কলেজ কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে। অমৃতবাজার পত্রিকায় তখন নিয়মিত সেই আন্দোলন সংগ্রামের বিবরণ প্রকাশিত হত। সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব তখন ছিল সম্পূর্ণতই কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ছাত্র নেতাদের হাতে। অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য, দিলীপ রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মৃণাল সেন প্রমুখ আজকের অনেক বিখ্যাত বাঙালী বুদ্ধিজীবীই তখন ছিলেন স্কটিশ আন্দোলনের নেতৃত্বে। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিশ্বনাথ মুখার্জি

প্রমুখ ছাত্র নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়। যাহোক স্কটিশ কলেজ আন্দোলন আপাত দৃষ্টিতে একটি ছাত্র আন্দোলন হলেও তাৎপর্যগত ভাবে তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্যণীয়। ছাত্রীরা এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীকালের অধ্যক্ষা মৃণালিনী দাশগুপ্তর স্মৃতিচারণ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য :[৪৩]
"আমাদের মহিলা ছাত্রীনিবাস ডান্ডাস হোস্টেল। মিস্ স্টুয়ার্ট, মিস্ রবি ছিলেন সুপার ও সহসুপার। তাঁদের চোখে ধুলো দিয়ে আমরা কয়েকজন সান্ত্বনা, অলকা (চট্টোপাধ্যায়), সুশীলা (একজন মাদ্রাজী ছাত্রী), শক্তি, মেহরউন্নিসা কখনও কখনও শোভনা এবং আমি কত রাত্রে মোমবাতি জেলে চৌকির তলায় শুয়ে Red Star Over China পড়েছি, লাল কালি দিয়ে খবরের কাগজে পোষ্টার লিখেছি—সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকিয়ে গিয়ে কলেজের দেয়ালে আটকে এসেছি। আমার কাজের দায়িত্ব ছিল একটু বেশী, নিতাইদার বোন আমি। নিতাইদা তখন হাজতে, পরে বিচারাধীন কয়েদী। তখন কমিউনিস্ট পার্টি অখণ্ড এবং banned। ছাত্র অভিযানও (বি. পি. এস. এফ.-এর মুখপত্র) banned করে দিয়েছিল সরকার। যতদূর মনে পড়েছে ১৯৪০ সালেই। সেজন্য অনুদা, আমি এবং আরো কেউ কেউ গোপনে 'ছাত্র অভিযান' বিক্রির কাজ করতাম। ভাল বিক্রী করতে পারতাম না বলে অন্নদা (অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য—ছাত্রনেতা, কবি সুকান্তর অগ্রজ) ছোট হলেও আমাকে বকে দিত। কেন কি জানি ঐ কাজটা আমার ভাল লাগত না। গোপনে পুস্তিকা প্রচার ও বিতরণ করা কাজটি আমরা ছাত্রীরা কয়েকজন বেছে নিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত মিস্ স্টুয়ার্ট আমাকে হোস্টেলে থাকার অনুমতি আর দিলেন না।...

"১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারীর ছাত্র আন্দোলন ও সেই আন্দোলনের জয় আমাদেরই শুধু নয় বাংলার সমগ্র তরুণ ছাত্রছাত্রী মহলে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। আমরা একটি ছাত্রীসংস্থা গড়ার চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের ডান্ডাস হোস্টেলে রেণুদিকে নিয়ে (বর্তমানে রেণু চক্রবর্তী) এক একদিন এক একজনের ঘরে বসে ছোট ছোট গোপন বৈঠক হতো। শ্রীনিখিল চক্রবর্তী মাঝে মাঝে কোথাও Study circle পরিচালনা করবেন সংবাদ আসত। গোপনে সে সংবাদ বিদ্যুতের মতন ছড়িয়ে যেত। ঠিক সময়ে আমরা বেশ কয়েকজন সম্মিলিত হতাম নির্দিষ্ট স্থানে। এইভাবে নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে banned Party-এর সংশ্লিষ্ট ছাত্র ফেডারেশন।" [বন্ধনী অংশগুলি নিবন্ধ লেখকের—সু-দা]

ইতিমধ্যে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় ১লা সেপ্টেম্বরে। ব্রিটিশ সরকার দেশের বামপন্থী, বিশেষতঃ কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর

নামিয়ে আনে প্রচণ্ড দমনপীড়ন। কলকাতা শহরে জারী করা হয় ১৪৪ ধারা। তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধে প্রথম সামিল হন কলকাতার ছাত্র-সমাজ—মূলতঃ ছাত্র ফেডারেশন এবং বেআইনী ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি'র আহ্বানে সাড়া দিয়ে। ১৯৪০-এর জানুয়ারি মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র কলকাতা সংগ্রামী ছাত্র-সমাজের কাছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণসংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে একটি ইংরাজি ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয় যে বাঙলা সরকার যুদ্ধের সুযোগে দেশবাসীর সমস্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতা কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র করেছে। তার বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকেই সংগ্রামী প্রতিরোধের পথে এগিয়ে আসতে হবে, কারণ কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব আপসের পথে পা বাড়িয়েছেন, আর ফরোয়ার্ড ব্লক গরম গরম বুলি ছাড়লেও, কার্যক্ষেত্রে কিছুই করছেন না। ছাত্রদেরই তাই ছড়িয়ে পড়তে হবে কারখানার গেটে, বস্তিতে, গ্রামে সর্বত্র—সংগঠিত করতে হবে ধর্মঘট ও মিছিল, বানচাল করে দিতে হবে দমন-নীতির রাজতন্ত্রকে—প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। ইস্তাহারটি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বাজেয়াপ্ত করে ইংরাজ সরকার। (হোম/পল / এফ. এন, ৩৭ / ২৭, ১৯৮০)।[৪৪]

কলকাতার ছাত্রসমাজ কমিউনিস্ট পার্টি' ও ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে বিপুলভাবে সাড়া দিয়ে ১৯৪০-এর ২৬ জানুয়ারীকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করেন। ইংরেজ সরকারের আদেশ অমান্য করে সভা মিছিল করা তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিষেধ করলেন। কিন্তু ছাত্র ফেডারেশন এ নিষেধ মানতে অস্বীকার করে বিরাট বিরাট সভা ও জঙ্গী মিছিল করে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করতে পেরেছিল। কলকাতায় তার আগের দিনই, ২৫শে জানুয়ারি স্কটিশচার্চ, বিদ্যাসাগর, সিটি কলেজের ছাত্ররা শত শত সশস্ত্র পুলিশের বেষ্টন ভেঙে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে বিরাট ছাত্র মিছিল করেছিল এবং পরদিন বিপুল ছাত্র সমাবেশের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেছিল। দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর দৃপ্ত মিছিলের সামনে সেদিন পিছু হটতে বাধ্য হয় সাম্রাজ্যবাদী পুলিশবাহিনী, অকেজো হয়ে যায় ১৪৪ ধারা ও দমনমূলক ফতোয়াগুলি।[৪৫]

১৯৪০-এর আগষ্ট মাসে কুখ্যাত হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের দাবিতে সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের যে ঐক্যবদ্ধ ও জঙ্গী গণ-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, ছাত্র ফেডারেশন যোগ্যতার সঙ্গে তাতে নেতৃত্ব দেয়। হলওয়েল মনুমেণ্ট তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। ১৯৪১-এ ভারতের বিভিন্ন বন্দী শিবিরে আটক বামপন্থী রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন ধর্মঘট করেন এবং তাঁদের দাবিপূরণের সপক্ষে বাঙলার ছাত্র সমাজকে 'বন্দীমুক্তি-আন্দোলনে' অংশগ্রহণের কাজে নেতৃত্ব দেয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন।

বস্তুত ১৯৩৮ থেকে ১৯৪১-এর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিশ্বনাথ মুখার্জির নেতৃত্বে পরিচালিত বি. পি. এস. এফ মূলতঃ ছিল অন্তত নেতৃত্বের দিক থেকে কমিউনিস্ট ছাত্রছাত্রীর সংগঠন, যদিও অসংখ্য সাধারণ ছাত্রসমাজ দলমত নির্বিশেষে বি. পি এস. এফকে তাদেরই মুখপাত্র মনে করতো। গার্লস স্টুডেণ্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে এই সময় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপক অংশের ছাত্রীরাও সমবেত হতেন বি. পি. এস. এফ-এর আন্দোলনের ময়দানে। এদের সংগঠিত করার দায়িত্ব ছিল একগুচ্ছ প্রতিভাময়ী, উচ্চশিক্ষিতা, নিবেদিত প্রাণ ছাত্রী কর্মীর। কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় এই কমিউনিস্ট মেয়েরা ছাত্রী ও মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। এঁরা অধিকাংশই ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা। ধনী, অভিজাত ও ভূস্বামী পরিবারেরও কেউ কেউ ছিলেন। বিয়ে-থা করে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এরা অনায়াসেই কাটাতে পারতেন। হতে পারতেন সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের একজন। কিন্তু কিছুই এই নবযুগের অগ্নিকন্যাদের প্রলুব্ধ করতে পারেনি। সুখী গৃহকোণের একান্ত স্বাচ্ছন্দ্যকে সরিয়ে রেখে এই অতুলনীয়ারা শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের সাথী হয়েছিল। এঁরা যদি দেশ-প্রেমিক না হল তো দেশপ্রেমী কারা?

১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ সালের শেষ পর্যন্ত যে সকল ছাত্রী ও মহিলা কর্মী কলকাতা ও জেলায় জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির কাজে যোগ দেন এবং ছাত্রী ফ্রণ্টে সক্রিয় থাকেন তাঁদের জেলাভিত্তিক একটি নামের তালিকা পাওয়া যায় সরোজ মুখার্জির স্মৃতিকথা থেকে। কিছুটা সম্পাদিত আকারে তুলে দেওয়া হল যতদূর সম্ভব পারিবারিক পরিচিতি সহ।[৪৬]

**কলকাতা:** লতিকা দাস (১৯৩৬ সালে প্রথম পার্টি সদস্যা। কমিউনিস্ট নেতা ডাঃ রণেন সেন-এর সঙ্গে পরে বিবাহ হয়। ১৯৪৯-এর ২৭ এপ্রিল আন্দোলনের শহীদ। কনক দাসগুপ্ত (১৯৩৭ সালে পার্টি সদস্যা, কমিউনিস্ট নেতা সরোজ মুখার্জির সঙ্গে বিবাহ ১৯৪২-এ; বর্তমানে বিশিষ্ট মহিলা নেত্রী)। সুধা রায় (১৯৩৭ সালে লেবর পার্টি থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন, বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী। ছাত্রী ফ্রণ্টেও কাজ করতেন)। কমলা চ্যাটার্জী (১৯৩৮ সালে কারামুক্তির পর প্রথম রাজ বন্দিনী পার্টি সদস্যা হন। ছাত্রীফ্রণ্ট ও মহিলা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। পরে ডঃ নীরোদ মুখার্জির সঙ্গে বিবাহ হয়)। এঁরা ছাড়া ১৯৩৮ সালে কয়েকজন ছাত্রী কলকাতায় পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন। এঁরা হলেন: শান্তি সরকার (বসু), কল্যাণী মুখার্জি (বিশ্বনাথ মুখার্জির ভাইঝি, পরে কংগ্রেস নেতা মোহন কুমারমঙ্গলম-এর সঙ্গে বিবাহ হয়), প্রীতি লাহিড়ি

( ব্যানার্জি, পরবর্তীকালের বিশিষ্ট গণসঙ্গীত গায়িকা )। এঁরা সকলেই ছিলেন গার্ল স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন-এর অন্যতম সংগঠক।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ এর মধ্যে কলকাতায় পার্টির কাজের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হন তাঁদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন বিলেত থেকেই কমিউনিস্ট হয়ে আসা রেণু রায় ( ডাঃ বিধান রায়ের ভাইঝি, নিখিল চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহ হয় )। এছাড়া ছিলেন অশ্রু দাস ( পরে আব্দুল হালিমের সঙ্গে বিবাহ হয় ), প্রীতিলতা মজুমদার ( সামসুল হুদার সঙ্গে বিবাহ হয় )। প্রতিভা গাঙ্গুলি ( '৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল আন্দোলনের শহীদ ), নাজিমুন্নিসা আহমেদ ( কুতুবুদ্দিন সাহেবের কন্যা ) উমা চক্রবর্তী ( চিন্মোহন সেহানবীশের সঙ্গে বিবাহ হয় ), গীতা রায়চৌধুরী ( ডাঃ ভাস্কর রায়চৌধুরীর বোন, বিশ্বনাথ মুখার্জির সঙ্গে বিবাহ হয় বর্তমানে কমিউনিস্ট সাংসদ) ; বেলা চাটার্জি ( পরে সোমনাথ লাহিড়ির সঙ্গে বিবাহ হয় ) ; শান্তি রায় ( বিপ্লবী পবিত্র রায়ের বোন, গণনাট্য আন্দোলনের নেতা সুধী প্রধানের সঙ্গে বিবাহ হয় )। এঁরা ছাড়াও শচী লাহিড়ি, উষা দত্ত ( বিশিষ্ট গণনৃত্যশিল্পী ; কমিউনিস্ট নেতা মেজর জয়পাল সিং এর সঙ্গে বিবাহ হয় ) মলিনা দত্ত, প্রভা চ্যাটার্জি, মাধুরী ঘোষ প্রমুখরা কম বেশী ছাত্রী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

**হুগলী :** চন্দননগরে কালিচরণ ঘোষের উদ্যোগে ১৯৩৮ সালে গড়ে ওঠে 'চন্দননগর মহিলা সমিতি।' কৃষ্ণ ভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দিরের সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায় সহ কয়েকজন ছাত্রী 'ছাত্র ফেডারেশন' গড়ার কাজে এগিয়ে আসেন। প্রথম দিকে যাঁরা মহিলা সমিতির কাজ শুরু করেন এবং একই সঙ্গে ছাত্রী সংগঠনকেও গড়ে তোলায় উদ্যোগী হন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন সন্ধ্যা ( পরে চ্যাটার্জী ) ; শেফালী ( পরে নন্দী ), কৃপাকণা দাস, আরতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

**বরিশাল :** এই জেলায় প্রথম পার্টি সদস্যা জুঁইফুল বসু ( কলকাতায় এসে কমিউনিস্ট নেতা সুধীন ( খোকা ) রায়ের সঙ্গে বিবাহ হয় ) পরে পার্টির সভ্য হন মণিকুন্তলা সেন ( ইনি সৌমেন ঠাকুরের গ্রুপে ছিলেন, জলিমোহন ক'ল-এর সঙ্গে বিবাহ হয়, বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেত্রী। ) এই দুইজন বিশেষ করে মণিকুন্তলা অন্যতম ছাত্রী সংগঠক ছিলেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।) এছাড়া শোভা সেন, সীতু মুখার্জি, বেলা চক্রবর্তী প্রমুখরাও ছিলেন। বরিশালে পরে একটি 'নারী কল্যাণ ভবন'ও গড়ে উঠেছিল।

**২৪ পরগণা :** এই জেলায় যাঁরা ছাত্রী সংগঠন ও মহিলা সংগঠনে সক্রিয় ভাবে কাজ করতেন তাঁরা হলেন নিবেদিতা চৌধুরী ( নাগ ), শোভা গাঙ্গুলি (ছাত্র নেতা ধরিত্রী গাঙ্গুলির সঙ্গে বিবাহ হয় ), গীতা ব্যানার্জি ( কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ হয় ) প্রমুখরাই উল্লেখযোগ্য।

**মেদিনীপুর ঃ** সাধনা পাত্র, বিমলা মাজি, প্রমীলা পাত্র, নির্মলা সান্যাল প্রথমদিকে পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। পরে উষা গুপ্তা, ছায়া বেরা প্রমুখরা ছাত্রী ও মহিলা আন্দোলনে অংশ নেন।

**দিনাজপুর ঃ** এই জেলায় আশা চক্রবর্তী প্রথম দিকের পার্টি কর্মী। পরে সতী সেন, রাণী মিত্র (দাশগুপ্ত), বীণা সেন (গুহ), সাবিত্রী দে প্রমুখরা ছাত্রী ও মহিলা সংগঠনে কাজ করেন। বিশেষ করে অলকা মজুমদার (পরে বিশিষ্ট মার্কসবাদী অধ্যাপক দেবী প্রসাদ চ্যাটার্জির সঙ্গে বিবাহ হয় এবং বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা হন) ছিলেন ছাত্রী আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী।

**পাবনা ও রাজশাহী ঃ** এই দুই জেলাতেও মায়া সান্যাল (লাহিড়ি), মায়া গোস্বামী (মৈত্র), প্রতিমা দাশগুপ্ত, প্রীতি লাহিড়ি প্রমুখ মহিলা ও ছাত্রীরা প্রথম দিকে পাবনা জেলায় এবং প্রীতি সরকার (ব্যানার্জী), কমলা চৌধুরী, রেখা চৌধুরী, রেখা রায়, পংকজ আচার্য রাজশাহী জেলাতে মহিলা ও ছাত্রীফ্রণ্টের কাজে যোগ দেন। এছাড়া ইরা সান্যাল, তুলসী ও পারুল চক্রবর্তীও সে সময় পাবনা কলেজের ছাত্রফ্রণ্টে সক্রিয় ছিলেন।

**সুর্মাভ্যালী (সিলেট ও শিলচর জেলা) ঃ**

শ্রীহট্টের প্রথম মহিলা সংগঠনের নাম ছিল 'শ্রীহট্ট মহিলা সংঘ'। মহিলা সংঘের সম্পাদিকা সরলাবালা দেব জেলা কংগ্রেসের সভানেত্রী হন। তিনি কমিউনিস্টদের সঙ্গেই কাজ করতেন। প্রথম দিকে কমিউনিস্ট পার্টির কাজে যাঁরা আসেন তাঁরা হলেন শশীপ্রভা দে, অঞ্জলি দাস, সরলাবালা দেব, হেনা দত্ত, মায়া গুপ্ত, শান্তা সেন প্রমুখ ছাত্রী নেত্রীরা। তাছাড়া পার্টি সংগঠন ও মহিলা আন্দোলনে আরো যাঁরা সক্রিয় ছিলেন তাঁরা হলেন ঃ ইলা ভট্টাচার্য, মণি দত্ত, ছায়া চৌধুরী, সাধনা গুপ্ত, কণিকা দাস, গৌরী শর্মা, অসিতা পাল চৌধুরী। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের নাতনী কল্যাণী দাস, অপর্ণা ধর, তুলসী ভট্টাচার্য, মানসী ভট্টাচার্য, মাধুরী ভট্টাচার্য, চঞ্চলা ভট্টাচার্য প্রমুখ। এঁদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা ১৯৪২ সালেই পার্টিতে যোগ দেন এবং সক্রিয়ভাবে মহিলা ও ছাত্রী ফ্রণ্টে কাজ করেন।

**রংপুর ঃ** রংপুর জেলায় শহর এবং গ্রামে ছাত্রী ও মহিলা ফ্রণ্টে যুক্ত হন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু সংখ্যক নেত্রী। ১৯৩৮-৩৯ সাল থেকে গোপন যুগের মহিলা কর্মীদের মধ্যে ছিলেন ঃ লিলি দে, মানসী দাশগুপ্তা, রেবা রায় (বিশিষ্টা অভিনেত্রী ; গণনাট্য আন্দোলনের নেতা সজল রায়চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হয়), সরলা রায়, রেখা রায় প্রমুখ। কনক মুখার্জি,

শান্তি প্রধান প্রমুখ নেত্রীরা কিছুদিন এই জেলাতে ছাত্রী ও মহিলা ফ্রন্টে কাজ করেছিলেন।

অবশ্য প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা শ্রদ্ধেয় সরোজ মুখোপাধ্যায়ের প্রদত্ত জেলাভিত্তিক নামের এই তালিকায় আরো কিছু সংযোজন হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিম্নে যতটা সম্ভব তা দেওয়া হল :

**যশোর ও খুলনা :**[৪৭] তিরিশের শেষে যশোরে সমাজ ও রাজনীতি সচেতন মহিলা, তরুণী ও ছাত্রীরা সমবেত হয়ে লাবণ্যপ্রভা মিত্রকে সভানেত্রী এবং চারুশীলা ধরকে সম্পাদিকা করে 'নারী মঙ্গল সমিতি' গঠন করেন এবং তার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আন্দোলন, নাট্যাভিনয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মধারার সাহায্যে যশোর, ঝিনাইদা, নড়াল, মাগুরা, বনগ্রাম, পাঁজিয়া, রাজঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে সমিতির ক্রিয়াকলাপ প্রসারিত করেন। ...তরুণী ও ছাত্রীদের মধ্যে প্রীতিলতা গণ, কনক দাশগুপ্ত, সাধনা দাশগুপ্ত, গৌরী মিত্র, গীতা রায়চৌধুরী, পরিমল ঘোষ, নিভা মজুমদার, রেণু দত্ত প্রমুখেরা অনেকে সমিতিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন এবং সমিতির সভ্যা হন। এই সব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মধারার মধ্য দিয়েই ১৯৩২ থেকে ১৯৪২ এর মধ্যে মহিলার বিপুল সংখ্যায় রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হন। ক্রমে একদিকে মনোরমা বসু, চারুবালা ধর, অমিতা [ বেলা ] মিত্র প্রমুখের নেতৃত্বে কংগ্রেস আন্দোলনে মহিলাদের যোগদান যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনি অন্যদিকে বামপন্থী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ কৃষক সমিতি, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশনের পতাকাতলে মিলিত হয়ে বহু তরুণী ও ছাত্রী ব্যাপকভাবে বামপন্থী আন্দোলনগুলিতে যোগ দিতে থাকেন।

১৯৩৭ সালে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যশোর জেলা ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হয়। তাতে গৌরী মিত্র, গীতা রায়চৌধুরী ( মুখার্জি ), রেণু দত্ত ( মিত্র ), নিভা মজুমদার, সুধা পিপলাই ( চ্যাটার্জি ), বেলা ঘোষ ( মিত্র ) প্রমুখ ছাত্রীরা সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। ১৯৩৮-এর বন্দী মুক্তির দাবিতে আন্দোলন এবং যশোর জেলা 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র আন্দোলনে এই ছাত্রী কর্মীরাই নেতৃত্ব দেন।

খুলনা ও যশোর পাশাপাশি জেলা বলে যশোরের ছাত্রীকর্মীরাই আবার খুলনাতেও আন্দোলন সংগ্রামে সাহায্য করতো। তথাপি তিরিশের দশকের সূচনায় খুলনায় ছাত্র-আন্দোলনে অনুপমা সেন ( বসু ), অমলা মিত্র ( দত্ত ) প্রমুখরা যুক্ত ছিলেন। জগদীশচন্দ্র ঘোষ, শান্তিশরণ রায়চৌধুরীরা ছিলেন সেসময়ে খুলনা জেলা ছাত্র সমিতির ( এ. বি. এস. এ ) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশন' প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে খুলনা জেলা ছাত্র-আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়। বি. পি. এস. এফের

দ্বিতীয় প্রাদেশিক ছাত্রসম্মেলন হয় ( ১৯৩৯ ) খুলনা শহরেই। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিও সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিপ্লবী অনিলকুমার সেনগুপ্তর ভাগ্নী অঞ্জলি রায়চৌধুরী ( ছাত্রনেতা শান্তিশরণ রায়চৌধুরী পত্নী ) ছিলেন খুলনার বিশিষ্ট ছাত্র তথা মহিলা নেত্রী।

**চট্টগ্রাম :**[৪৮] চট্টগ্রাম ছিল সুতীব্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জেলা রূপে পরিচিত। কল্পনা দত্ত ( যোশী ) ও জ্যোতি দেবী ছিলেন প্রথমযুগের দুই মহিলা সংগঠক। গ্রামে ও শহরে স্কুলগুলিতে যে সকল ছাত্রী ছাত্র-ফেডারেশনের সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন আরতি দাশ ( পরে দত্ত এবং বাংলাদেশের বিশিষ্টা মহিলা নেত্রী ), গায়ত্রী ও প্রভা দত্ত ( দাশ )। সাধনা মজুমদার, প্রীতি দত্ত, আরতি পালিত (বিশ্বাস) গীতা পালিত, রেণু চৌধুরী ( লোকনাথ বলের ভগ্নী ), পুষ্প ও সুপ্রভা সেন। হাই স্কুলের দাবিতে ১৯৪০-৪২ সালে ছাত্রী সংগঠকরা তীব্র আন্দোলন করেন। বিশেষ করে নন্দন কানন স্কুলে। সিনেমা হলে বিরতির সময়ে ছাত্রীরা গিয়ে দর্শকদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার পত্র বিলি করতেন। এর জন্য অভিভাবক ও পুলিশের পক্ষ থেকে ছাত্রীদের অশেষ নির্যাতনও সহ্য করতে হয়। প্রীতিলতার আত্মদান ছিল ছাত্রীদের অনুকরণীয় আদর্শ।

১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত যে সকল নারীকর্মীরা ছাত্রীদের নানাভাবে সংগঠিত করার চেষ্টা করতেন, তাঁদের প্রধান কয়েকজন নেত্রীর নাম এই জেলাওয়ারি তালিকায় আছে। কিন্তু এই তালিকার বাইরে রয়ে গেছে আরও অনেক অখ্যাত নারী-কর্মীর নাম, সংগঠিত ছাত্রী-আন্দোলনে যাঁদের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সেই সময় কালে এই নারী সংগঠকরা ছাত্রী ও মহিলা সংগঠনে একই সঙ্গে কাজ করতেন। পরবর্তীকালে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র কাজে রাজনৈতিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছাত্রী-আন্দোলনের কর্মীরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় আরো একটি বৈশিষ্ট্য সেই যুগের ছাত্রী-আন্দোলনের কর্মীদের ছিল, তা হ'লো মতাদর্শের প্রতি অটুট বিশ্বাস ও তার জন্য যে কোনো স্বার্থ ত্যাগ ও বিপদ বরণে প্রস্তুত থাকা। কুড়ি-একুশ বছরের তরুণীরা অনেকেই নিরাপদ গৃহকোণ এর নিরাপত্তা ত্যাগ করে, আত্মীয় পরিজনের থেকে বহু দূরে কায়ক্লেশে দিন কাটাতো শুধু নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে সংগঠিত রূপ দেবার জন্য ও দেশপ্রেমের তাগিদে।

তৃতীয়ত, সকল প্রকার গোঁড়ামী, কুসংস্কার ও কুপ্রথা থেকে মুক্ত ছিলেন এই নতুন যুগের শিক্ষিতা মেয়েরা। নিজেদের সংগ্রামের সাথীকে তাঁরা যেমন জীবন-সঙ্গী রূপে বরণ করে নিয়েছেন নিজেদের পছন্দ মতো, তেমনি সেক্ষেত্রে

কোনোরূপে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত হতেন না। তৎকালীন সামাজিক বাধা অতিক্রম করে অবিচল চিত্তেই ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু-পরিবারের সন্তান কমিউনিস্ট মেয়েরা মুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়া কোনো কমরেডের হাতধরে জীবন সংগ্রামে ( রাজনৈতিক সংগ্রামে তো বটেই ) ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এই নবচেতনার যুগে মুসলিম পরিবারের মেয়েরাও পিছিয়ে পড়েননি। সংখ্যায় স্বল্প হলেও ছাত্রী ও নারী আন্দোলনের উত্তাল সময়ে তাঁরাও সামিল হয়েছিলেন স্বাধীনতার সংগ্রামে।

## বিশ্বযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাঙলার ছাত্রসমাজ :

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। একদিকে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদী আক্রমণ এবং অপর দিকে স্বদেশের মাটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন—উভয়ের বিরুদ্ধেই সংগ্রামে আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছিল বাঙলার ছাত্রসমাজ বিশেষ করে ছাত্র-ফেডারেশন। বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষেই তখন ছাত্র-ফেডারেশন ও ছাত্র-আন্দোলনের মধ্যে বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের প্রভাব উত্তরোত্তর বাড়ছিল। এই বিষয়ে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যেও 'কমিউনিস্ট জুজু'র আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বেই সংগ্রামী ছাত্রদের বৃহত্তম অংশ ছাত্র-ফেডারেশনের পতাকার নীচে জমা হচ্ছে দেখে, কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃত্ব প্রয়োজন হলে ঐক্যবদ্ধ এই ছাত্র সংগঠন ভাঙার সিদ্ধান্ত করলেন। ১৯৪০-এর ডিসেম্বরে নাগপুরে নিখিল ভারত ছাত্র-ফেডারেশনের বার্ষিক সম্মেলনে কার্যতঃ নিখিল ভারত ছাত্র-ফেডারেশন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। এম-এল শাহর নেতৃত্বে কংগ্রেস-সমাজ-তন্ত্রী দলের অনুগত ছাত্ররা স্পষ্টতই জানিয়ে দিলেন তাঁরা পৃথক সংগঠন গড়ছেন। কমিউনিস্ট ছাত্রদের নেতৃত্বে ছাত্র-ফেডারেশন কিন্তু নাগপুরে তার সম্মেলন যথারীতি অনুষ্ঠিত করল, ডাক দিল সংগ্রামী ছাত্র ঐক্যের সপক্ষে। তাদের প্রকাশ্য সমাবেশে দৃপ্তভাষণ দিলেন দুই বিশিষ্ট বামপন্থী প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ডাঃ কুনওয়ার মহম্মদ আশারফ ও অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।[৪৯]

নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিলভারত ছাত্র সম্মেলনের মূল্যায়নকরে সাম্রাজ্য-বাদী গোয়েন্দা দপ্তর লিখেছিল : "১৯৪০-এর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে ব্যাপক ছাত্রধর্মঘট হয়, যার অন্যতম লক্ষ্য ছিল ছাত্রফেডা-রেশনের নেতৃত্বে কমিউনিস্টদের প্রতিষ্ঠিত করা। সোস্যালিস্টরা, কমিউনিস্ট ছাত্র আন্দোলনের ঘাঁটি বাংলা, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ শাখাগুলিকে বিতাড়নের চেষ্টা করেছিল, পারেনি। কমিউনিস্টরা অনেক বেশি আঁটঘাট বেঁধে তৈরী ছিল। তারা এখন প্রত্যেক কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ফেডারেশনের একটি

করে শাখা তৈরি করার চেষ্টা করছে। আগামী (১৯৪১) ২৬ জানুয়ারি তারা সর্বত্র ডাক দিয়েছে স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য।" ৫০

[ হোম / পল / এফ-এম ৭/১/১৯৪১ ]

১৯৪১-এর শুরু থেকেই সারা ভারতে ও বাঙলাতে এ. আই. এস. এফ সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দুটি সংগঠন পৃথকভাবে কাজ করতে শুরু করলো। বাঙলাদেশে কমিউনিস্ট ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের দপ্তর রইলো পুরানো ঠিকানা ৮।২ ভবানী দত্ত লেনে। আর ১৮নং মির্জাপুর স্ট্রীটে সাইনবোর্ড টাঙ্গানো হল অপর বি. পি. এস. এফ-এর ( মির্জাপুর ছাত্র ফেডারেশন নামে পরিচিত ) এর নেতৃত্বে রইলো প্রধানত বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের ছাত্ররা। অবশ্য পৃথক সংগঠন হলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছাত্র-ধর্মঘট ও সংগ্রামে কার্যক্ষেত্রে এরা উভয়েই বেশির ভাগ সময় একত্রে লড়েছে। কিন্তু ১৯৪১-এর ২২ জুন হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে মতভেদ তীব্রতর হল। কমিউনিস্ট ছাত্ররা প্রকাশ্যে সৌহার্দ্য জানাল সোভিয়েতের সঙ্গে। ছাত্র-ছাত্রীদের জঙ্গী মিছিলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ধ্বনির সঙ্গে উচ্চারিত হতে থাকলো ফ্যাসিস্ট-বিরোধী রণধ্বনিও। আওয়াজ উঠলো, "হাম ভারত কা নওজোয়ান, সোভিয়েত কি সাথ হ্যায়।" ৫১

নাৎসী জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪১ এর নভেম্বর-ডিসেম্বর নগাদ আন্তঃ পার্টি আলোচনার মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে এই জনযুদ্ধকে পূর্ণ সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিল। কমিউনিস্ট ছাত্ররা এই জনযুদ্ধনীতিকে ছাত্রসমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য মঞ্চ রূপে ব্যবহার করলো আসন্ন পাটনা সম্মেলনকে (এ. আই. এস. এফ-র এই সম্মেলন ১৯৪১-এর ডিসেম্বর নাগাদ হয়েছিল)। সম্মেলনে তীব্র বিতর্ক ও ভোটাভুটির পর প্রতিনিধিরা ( ৬৪০ জনের মধ্যে ৫৯৫ জন ) রায় দিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত করার পক্ষে। ফলে, 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' থেকে কমিউনিস্ট পার্টির অনুগামীরা ছাড়া অন্যরা বেরিয়ে যান। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই ভাঙ্গন তীব্র হয় এবং এই সময় থেকেই এ. আই. এস. এফ ছাড়াও ছাত্রকংগ্রেস প্রভৃতি একাধিক ছাত্রসংগঠনের জন্ম হয়। এই বিতর্ককে কেন্দ্র করে সেই সময় ছাত্র-ফেডারেশনের ( কমিউনিস্টপন্থী ) ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক এমনকি শারীরিক আক্রমণের সম্মুখীনও হতে হয়েছিল।

এই সময় থেকেই স্পষ্টত সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার ছাত্র আন্দোলন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে সমান্তরাল ধারাতেই অগ্রসর হয়। একটি প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ সরকার-বিরোধী জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগ্রামের ধারা এবং

অপরটি ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিকতাবাদী ধারা। কমিউনিস্ট পন্থী ছাত্রফেডারেশন ছিল এই শেষোক্ত জনযুদ্ধের ধারারই সমর্থক ও সংগঠক। জাতীয়তাবাদী ছাত্র সমাজের নেতৃত্বে ছিল, কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের (বা পূর্বের অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর গ্রুপের) অনুগামী ছাত্র নেতৃত্ব।

## আগষ্ট আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়া :

১৯৪২-এর ৯ আগষ্ট ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজী সহ ভারতের প্রায় সমস্ত জাতীয় নেতাকেই কারারুদ্ধ করলো। কংগ্রেসের আহ্বান না থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণ সারা দেশে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধে ও ক্ষোভে ফেটে পড়লো। শুরু হয়ে গেল আগস্ট আন্দোলন বা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। বিশেষ করে বাঙলায় এই আন্দোলন কয়েকমাসের জন্য হিংসাত্মক ও জঙ্গীরূপ ধারণ করলো। ব্রিটিশ সরকার সভা-সমিতির উপর নিয়ন্ত্রণ চালু করলো। আন্দোলন রত জনতার উপর নামিয়ে আনা হল সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতন। যদিও কমিউনিস্ট প্রভাবিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন নীতিগত ভাবে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী জনযুদ্ধের সেই সময়ে সরকার বিরোধী কোনো আন্দোলনে সামিল হয়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার বিরোধী ছিল এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে দেশে একটি জাতীয় সরকার গঠনের জোরালো দাবি উত্থাপন করছিল তথাপি জাতীয় নেতৃত্বকে কারাগারে নিক্ষেপ করার ঘটনাকে তারা কোনো মতেই মেনে নেয়নি। ১০ই আগস্ট কলকাতা সহ সারা বাঙলায় সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে বিরাট ছাত্র মিছিল সমগ্র কলকাতা পরিভ্রমণ করে আওয়াজ তোলে : জাতীয় নেতাদের অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি চাই।[৫২] ১৩ই আগস্ট পুলিশ কলকাতায় ছাত্র-মিছিলের উপর নৃশংস লাঠি চালনা করল। ১৫ আগস্ট ঢাকাতে ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট হল। ধর্মঘটী ছাত্রদের উপর গুলি চালিয়ে পুলিশ ৫ জন ছাত্রকে হত্যা করলো। প্রতিবাদে পরদিন সারা বাঙলার সমস্ত স্কুল-কলেজে সর্বাত্মক ছাত্রধর্মঘট পালিত হল।[৫৩] অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : ১৮ থেকে ৩০ আগস্ট, বাঙলাদেশের সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির প্রতিবাদে, নিজেদের প্রকাশ বন্ধ রাখল। ৩১ আগস্ট কাগজগুলি আবার যখন ছেপে বের হল, তখন স্পষ্ট বোঝা গেল যে সমগ্র আগস্ট মাস ধরে, শুধু বাঙলা নয়, সারা ভারতেই প্রায় একটানা ছাত্রধর্মঘট চলেছে। বিহার ও বাঙলায় আগস্ট আন্দোলন কিছু কিছু জেলাতে প্রায় গণ অভ্যুত্থানের রূপ নিয়েছিল। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী এইসময়ে ব্যক্তিগত ভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই উত্তাল

গণআন্দোলনে। আগস্ট আন্দোলনে সারা দেশেই তরুণ ছাত্র সমাজের ব্যাপক অংশ গ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সারা দেশে সমস্ত বয়সের এবং সমস্ত শ্রেণীর ছাত্ররা এত ব্যাপক ভাবে আন্দোলনে অংশ নেয় যে সেটা ছিল অভূতপূর্ব। কংগ্রেস অনুসন্ধান কমিটির এই রিপোর্টে বলা হয়ঃ[৫৪] "১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তাদের অংশ খুব উল্লেখযোগ্য ছিল না। ১৯৪০ সালের ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন তাদের নাড়া দিতে পারেনি। কিন্তু ১৯৪২ সালের সংগ্রাম তাদের এমনভাবে উজ্জীবিত করেছিল যা অতীতে কখনও হয়নি।"

কোচিনের মত আরও কয়েকটি জায়গায় সংগ্রামরত ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকদের সরকার চাকরি থেকে বরখাস্ত করা বা ব্যবসার উপরে চাপ সৃষ্টি করার হুমকি দেয়। ছাত্ররা সবরকম কাজকর্মেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। যদিও কংগ্রেস রিপোর্টে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভূমিকার কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল কিন্তু বাঙলার মেদিনীপুর জেলাতেও '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর যে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ঘটেছিল কাঁথি, তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, তমলুক, পাঁশকুড়া, ময়না প্রভৃতি মহকুমা ও থানা অঞ্চলে; যেভাবে তারা থানা ও সরকারী ভবন দখল, রেললাইন ওপড়ানো, ডাক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা বানচাল করে দেওয়ার মতো জঙ্গী কাজে অংশগ্রহণ করেছিল—অতীতে তেমনটি কখনোই দেখা যায়নি। শুধু মেদিনীপুরে নয় যশোহর, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, হুগলী, বর্ধমান সর্বত্রই আগস্ট আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল স্বাধীনতাকামী ছাত্র-ছাত্রীরা। আমাদের দুর্ভাগ্য আগস্ট আন্দোলনের বিস্তারিত তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস আজও রচনা সম্ভব হয়নি। ছাত্রীদের অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা তো দূরে অস্ত। তবে মাতঙ্গিনী হাজরার মতো বৃদ্ধার আত্মাহুতির পর অনেক মেয়েই যে আর ঘরে বসে থাকতে পারেনি একথা সহজেই অনুমেয়। এমনকি ছাত্রফেডারেশন নীতিগত ভাবে আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও এই সংগঠনের অসংখ্য সদস্যও এই গণআন্দোলনের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি, এমনকি কয়েকজন প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন।[৫৫] বোম্বাই শহরেও আগস্ট বিদ্রোহের প্রথম দিনেই পুলিশের গুলিতে নিহত প্রথম শহীদ হয়েছেন ছাত্র ফেডারেশনেরই কর্মী উমাভাই কাদিয়া। পুলিশের লাঠির আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছে সর্বভারতীয় ছাত্রনেত্রী নারগিস বাটলিওয়ালা। বাঙলায় পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্র 'আগস্ট আন্দোলনে' যোগ দিয়ে আত্মগোপন করে কাজ করেন।

যাইহোক বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশনের ছাত্র-ছাত্রীরা একই সঙ্গে ফ্যাসিস্ত বিরোধী জনযুদ্ধের প্রচারও এই সময় চালাচ্ছিলেন, অপর দিকে ব্রিটিশ দমননীতির প্রতিবাদে ও জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় সরকার গঠনের দাবিতে লাগাতার প্রচার আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। ছাত্রীরাও চুপ করে বসে থাকেন নি। রেণু চক্রবর্তী লিখেছেন,[৫৬] "১৯৪১ সনে পাটনায় ছাত্র-সম্মেলন হয়, তখন ছাত্রী সংগঠনে সদস্য সংখ্যা ৫০ হাজার। কলকাতা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, পাটনা, রাজশাহী, বাঁকুড়া এবং অন্য সর্বত্র এই সংগঠনের শাখা স্থাপিত হয়। কনক দাসগুপ্ত ও কল্যানী মুখার্জী ছাড়াও কত ছাত্রী নেত্রীরা এসে গেল। কলকাতায় অলকা মজুমদার, শোভা রায়, শান্তি সরকার, পাবনার প্রতিমা দাসগুপ্ত, রাজশাহীর প্রীতি সরকার, বরিশালের বানী দাসগুপ্ত, আর যশোর থেকে সদ্য চলে এলো এদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা গীতা রায়চৌধুরী, পরে সে গীতা মুখার্জী হয়েছিল।

"...বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে এবং ফ্যাসিবাদ রুখতে হলে এটাই একমাত্র পথ। কমিউনিস্ট মেয়েরাও এই প্রচারে নামলেন। এক-দিকে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার গঠনের প্রয়োজনে জাতীয় নেতাদের মুক্তি, অপর দিকে বাংলাদেশকে দ্রুত দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করা, তাছাড়া 'যুদ্ধের প্রচেষ্টার' নাম করে জনসাধারণের উপর নিরর্থক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো—এসবই যেন একসঙ্গে কমিউনিস্ট মেয়েদের উপরে এসে পড়লো এবং এক বিপুল কর্মোদ্যমের পথে তাদের ঠেলে নিয়ে চললো।

"কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা ১৯৪২ সনের ২ মাস বাদে উঠে গেল (প্রকৃত সময় ২২ জুলাই, ১৯৪২)। বাংলায় প্রথম পার্টির প্রাদেশিক মহিলা ফ্রন্ট গঠিত হোল।

"কমিউনিষ্ট মেয়েরা পূর্ববর্ণিত কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে এলো এবং এ কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য মহিলাদের সংগঠিত করতে লাগলো। একাজে কমিউনিষ্ট মেয়েরা প্রত্যেকটি বাড়ি বাড়ি ও দুয়োরে দুয়োরে উপস্থিত হতে লাগলো। দরজা খুলে মেয়েরা বেরিয়ে এলে আমরা তাদের বোঝাতে চেষ্টা করতাম যে বর্তমান বিপদের অবস্থায় আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমাদের দেশকে রক্ষা ও আমাদের সম্মান রক্ষা—এতো আমাদেরই করতে হবে। এতে আমাদের স্বনির্ভরতা চাই। তাই জাতীয় সরকার গঠনের জন্য জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার কাজে আমাদের সম্মানরক্ষা—এতো আমাদেরই করতে হবে। এতে আমাদের স্বনির্ভরতা চাই। তাই জাতীয় সরকার গঠনের জন্য জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার কাজে আমাদেরও সাহায্য

করতে হবে। সেই সরকারই পারবে সমস্ত জাতিকে একত্র সমবেত করতে। এই জন্যই জাতীয় নেতাদের মুক্তি আমাদের পেতেই হবে।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য জনযুদ্ধ-র নীতি গৃহীত হবার বহু পূর্বেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল সেরা ছাত্র-ছাত্রী (যদিও তারা অনেকেই ছাত্র-ফেডারেশনের সদস্য ছিলেন) ১৯৪০-এর মাঝামাঝি গঠন করেছিলেন ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউট" বা ওয়াই. সি, আই।[৪৭] ফ্যাসিস্তবিরোধী সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক বা প্রদর্শনীর মাধ্যমে এঁরা কলকাতার শিক্ষিত তরুণ মানসে ফ্যাসিজম্ এর বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে থাকেন। প্রধানতঃ জ্যোতি মোহন কল, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত এই যুব সংগঠনে ছাত্রীদের অংশগ্রহণও নেহাৎ কম ছিল না। উমা চক্রবর্তী (সেহানবীশ), সুজাতা মুখোপাধ্যায় (সুচিত্রা মিত্র-র দিদি), চিত্রা মজুমদার, রমা গোস্বামী, সাধনা বসু (রায় চৌধুরী), নিবেদিতা বসু (দাশ), বিনতা বসু (রায়) প্রমুখ প্রতিভাশালী ছাত্রীরাও কম বেশী এই সংগঠনের সক্রিয় ছিলেন। ফ্যাসিস্ত বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রীদের ওটাই ছিল সম্ভবতঃ প্রথম অংশগ্রহণ।

### মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও জনযুদ্ধের শরিক ছাত্রীসমাজ:

ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রামে বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নারী কর্মীদের নেতৃত্বে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের নারীসমাজ যেভাবে অংশগ্রহণ করে-ছিলেন—তা নিশ্চয়ই আজ ইতিহাস। ভারতবর্ষের মাটিতে উচ্চকোটি মহিলা সমাজের গণ্ডী পেরিয়ে সংগঠিত ও গণভিত্তিক নারী-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে নিঃসন্দেহে বাঙলাদেশে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গঠনের মধ্য দিয়ে।

প্রাথমিকভাবে ছাত্র ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ছাত্রীকর্মীরাই নারী-সমাজের মধ্যে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচারকার্য শুরু করেন। ইতিমধ্যেই বাঙলার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে ছাত্রী-সংঘ বা 'গার্ল স্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন্' গড়ে ওঠে (১৯৩৮)। কমিউনিস্ট পার্টির কনক দাশগুপ্ত (মুখার্জি), শান্তি সরকার (বসু), কল্যানী মুখার্জি (কুমারমঙ্গলম), দিনু ঘোষ, প্রীতি লাহিড়ি (ব্যানার্জি), লেবার পার্টির উমা ঘোষ, গীতা ব্যানার্জি (মুখার্জি), কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির অনিমা ব্যানার্জি (চক্রবর্তী) এবং রায়বাদী পার্টির শোভা মজুমদার (গাঙ্গুলী)-কে নিয়ে প্রথম গার্ল স্টুডেন্টস্ কমিটি গঠিত হয়। কনক দাশগুপ্ত হন তার প্রথম সম্পাদিকা। 'গার্ল স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন্' প্রথম দিকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার-আন্দোলন চালালেও জনযুদ্ধকালে কমিউনিস্ট ছাত্রী-

নেতৃত্বের পরিচালনায় তারা প্রদেশে প্রদেশে, জেলায় জেলায় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হন।[৫৮]

বস্তুত, এই সময়কালে সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেসকর্মী ও বিপ্লববাদী দলের সঙ্গে যুক্ত। আবার ছাত্র-আন্দোলন থেকেও ছাত্রীকর্মীরা অনেকে এসে ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে এইসব মহিলাকর্মীদের অনেকেই পার্টির গোপন কাজে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকেন, এমনকি পার্টিতেও যোগ দেন। কমিউনিস্ট পার্টিও এই সময় ছাত্রীও মহিলাদের পার্টির মধ্যে নিয়ে আসার জন্য এবং তাঁদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তুলবার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পার্টির রাজনৈতিক ক্লাসগুলির মধ্য দিয়েও মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষিত করার কাজ শুরু হয়।

নাৎসী জার্মানী কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পরেই তার বীরত্বের কাহিনী বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। সোভিয়েত নারীদের বীরত্বের কাহিনীও প্রচার হতে থাকে সর্বত্র। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত বীরাঙ্গনা রূপে তানিয়া, সোফিয়া, জয়া, কাসমো ডিস্কায়া, ওলগা বারবোলচ, নাতাশা কভসোভা, মারিয়া পেলিভানোভা, নিনা পোপোভা প্রভৃতি সংগ্রামী মেয়েদের কাহিনী বাঙলা তথা ভারতের শিক্ষিত এবং সচেতন ছাত্রী সমাজের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত হয়। সোভিয়েত নারীদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চীনের নারীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীও ভারতের নারীদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। মাদাম সান ইয়াৎ-সেনের একটি বিশেষ প্রবন্ধ—'চীনা মেয়েদের স্বাধীনতা সংগ্রাম' সেই সময়ে ব্যাপক-ভাবে প্রচারিত হয়েছিল কমিউনিষ্ট পার্টির সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জনযুদ্ধ'র মাধ্যমে।

এই প্রেক্ষাপটেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গড়ে ওঠে নারীদের মধ্যে দেশরক্ষা ও আত্মরক্ষার আন্দোলন। বাঙলা ছিল এর পুরোভাগে। ফ্যাসিস্ত বিরোধী প্রচারের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে জাপবিরোধী মেলা প্রভৃতি সংগঠিত হতে থাকে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মহিলারা ও ছাত্রীরা দলে দলে এইসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ক্রমশই গড়ে ওঠে মহিলাদের নিজস্ব সংগঠন—আঞ্চলিক, জেলাভিত্তিক ও প্রদেশগতভাবে।[৫৯]

১৯৪২ এর ১৩ এপ্রিল ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের এক সর্বদলীয় সভা থেকে গঠিত হয় 'কলকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সাংগঠনিক সমিতি।' এই সমিতির আহ্বায়িকা নির্বাচিত হন শ্রীমতি এলা রীড (স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার বার্তা সম্পাদক এ্যালেক রীড-এর পত্নী এলা রীড ছিলেন কলকাতার প্রখ্যাত

ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের বিদুষী কন্যা এবং প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষের নাতনী )। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকবছর ধরে এলা রীড-ই ছিলেন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র প্রাদেশিক সম্পাদিকা।

যাহোক, 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় মহিলা আত্মরক্ষা সাংগঠনিক সমিতির সভার যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তা নিম্নরূপ ঃ

"গত ১৩ই এপ্রিল কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট লাইব্রেরী হলে কলকাতার নারীদের এক ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন হয়। চীনা কনসাল জেনারেলের পত্নী মাদাম পাও সভায় সভানেত্রীত্ব করেন।

"শ্রীযুক্তা প্রণতি দে বলেন, চীন ও সোভিয়েত দেশের মেয়েদের মতো ভারতের মেয়েদিগকেও দেশ ও গৃহরক্ষার জন্য পুরুষের পাশে যোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী বলেন যে, স্বাধীনতা কখনো অপরের দান হিসাবে আসে না। জাপান আমাদিগকে স্বাধীনতা দিবে না। সভায় শ্রীযুক্তা রেণু চক্রবর্তী, মণিকুন্তলা সেন, নাজিমুন্নেসা আহমদ্, স্টেলা ব্রাউন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় ঃ ১) দেশের জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাইতে হইবে ২) জনরক্ষার জন্য মেয়েদের শক্তিশালী সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে মেয়েদিগকে অফিস, কারখানা, এমন কি রণক্ষেত্রেও পুরুষের স্থান পূরণ করিতে হইবে ৩) মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দিতে হইবে ৪) জনসাধারণের সহিত ভারতের সৈন্যদের সদ্ভাব স্থাপন করিতে হইবে।"৬০

মহিলা আত্মরক্ষা সাংগঠনিক সমিতির কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে নারীসমাজের উদ্দেশে একটি যুক্ত আবেদন প্রচার করে প্রতিটি গ্রামে ও শহরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তুলতে আহ্বান জানানো হয়। এই আবেদনে ৮ দফা কর্মসূচী প্রচার করা হয় ঃ (১) প্রচার আন্দোলন (২) পঞ্চম বাহিনীর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা (৩) সিভিল ডিফেন্সের কাজগুলি সংগঠিত করা (৪) বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, খাদ্য-বস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করা (৫) প্রয়োজনবোধে সামরিক সুবিধার্থে অধিকৃত স্থানগুলি থেকে সাধারণ বাসিন্দাদের সরে যেতে সাহায্য করা, তাদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও ও পুনর্বাসনের দাবী আদায় করতে সাহায্য করা (৬) জেলা বোর্ড, কো-অপারেটিভ বা সরকারী সাহায্যে চাল-ডাল প্রভৃতি ন্যায্য মূল্যের দোকান চালাতে সাহায্য করা (৭) যুযুৎসু, লাঠি খেলা প্রভৃতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েদের বাহিনী সংগঠিত করা। বিপদের সময় নিজেদের ও প্রতিবেশীদের যাতে রক্ষা করতে পারে তার জন্য এবং গেরিলাযুদ্ধের সাহায্যের জন্য মহিলাদের একটি

আত্মরক্ষা বাহিনী গঠন করা (৮) 'ফসল বাড়াও' এবং 'উৎপাদন বাড়াও' আন্দোলনে সহযোগিতা করা।[৬১]

এরপর থেকেই সুপরিকল্পিতভাবে গ্রামে ও শহরে সর্বত্রই স্থানীয়ভাবে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তোলার কাজ চলতে থাকে। সমিতি গড়ার এই কর্মসূচী নিয়ে মহিলাকর্মীরা ছড়িয়ে পড়েন কলকাতার বস্তি ও মধ্যবিত্ত অঞ্চলে, বিভিন্ন জেলার গ্রাম ও শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তার ফলে স্থানীয় ভিত্তিতে অনেক ছোট ছোট মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বা কমিটি গড়ে উঠতে থাকে। এই সময়কার প্রচার-আন্দোলনের যে বিবরণ কমিউনিস্ট নেত্রী রেণু চক্রবর্তী দিয়েছেন তার অংশবিশেষ নিম্নরূপ ঃ

"সভায় সভায় এই কথা আমরা শোনাই—বলি, রাশিয়ার মেয়েরা যদি পারে, আমরা ভারতের মেয়েরা কেন পারব না! ...প্রথম প্রথম সভায় সমিতিতে মেয়েদের আনাই কঠিন ছিল, আরো কঠিন ছিল বেশিক্ষণ কোন বিষয়ে তাদের মন বসানো। আমাদের কর্মীরাই ঘুরে ঘুরে মহিলাদের বোঝানোর কাজ করে যান অটুট ধৈর্যের সঙ্গে। কোথাও সভা হবার কথা হলে তারা প্রতিটি বাড়িতে যেত, একবার দু'বার নয়—বহুবার। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ডেকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হতো সভায়। শিশুদের সঙ্গে নিয়ে আসতেন মহিলারা।"[৬২]

শুধুমাত্র কলকাতায় নয় ১৯৪২-এর জুন মাস থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সমগ্র বাঙলা জুড়ে গড়ে উঠেছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অসংখ্য শাখা। বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সিলেট, ঢাকা, ফরিদপুর, রংপুর, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পাবনা, হুগলী, খুলনা, যশোহর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলাগুলিতে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচারের মাধ্যমে দেশরক্ষা ও আত্মরক্ষার কর্মসূচীর মাধ্যমে এবং খাদ্য আন্দোলন ও রিলিফের সেবামূলক কাজের মাধ্যমে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রাথমিক কাজ শুরু হলো। পূর্ববঙ্গের অনেকগুলি জেলাতে মুসলিম মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৪২-এর জুন মাস থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সমগ্র বাঙলা জুড়ে গড়ে উঠেছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অসংখ্য শাখা। সংগঠনের শাখা ছড়িয়ে পড়ল জেলায় জেলায়, এমনকি গ্রামের প্রত্যন্ত প্রান্তেও। প্রথম যখন বাঙলাদেশে জাপানী বোমা পড়ে তখন সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্নটি অতি তীব্রভাবেই অনুভূত হয়। এই পর্বে নারী-আন্দোলনের (ছাত্রীরাও ছিল যার প্রধান অংশ) মূল কর্মসূচী ছিল তিনটি ঃ এক) দেশরক্ষা; দুই) জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা; তিন) দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করা।

প্রথম পর্যায়ে ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে, মহিলাদের

মধ্যে আত্মরক্ষা সপ্তাহ পালনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই আত্মরক্ষা সপ্তাহের প্রধান কর্মসূচী ছিল জাপ-বিরোধী প্রচার। প্রতিটি অঞ্চলে মহিলাদের স্কোয়াড, বৈঠকসভা, সাধারণ সভা, চিত্র প্রদর্শনী, প্রভাত ফেরী, জননাট্য, বিবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার কাজে সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আবেদন জানানো হয়। আত্মরক্ষা সপ্তাহের এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কতকগুলি গঠনমূলক কাজও করা হয়ঃ (১) মেয়েদের এ. আর. পি প্রাথমিক চিকিৎসা ও ছোরা-লাঠি খেলা শেখার ব্যবস্থা; (২) ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করা; (৩) খাদ্য আন্দোলন সংগঠিত করা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজ ছিল নভেম্বর, ১৯৪২-এর প্রথম সপ্তাহটিতে কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'জাতীয় ঐক্য সপ্তাহ' পালন করা। এই ঐক্য সপ্তাহের রণধ্বনি ছিল, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই, দমননীতি বন্ধ করো, কংগ্রেস-লীগ এক হও, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করো, জাপানকে রুখে দেশ স্বাধীন করো। এই সব শ্লোগানের ভিত্তিতেই ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের প্রভাব তখনও দেশের মানুষের স্মৃতিতে জাগ্রত। যদিও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি কংগ্রেস—কমু্যনিস্ট সর্বদলেরই নেত্রীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল তবুও এর ফ্যাসিস্ত-বিরোধী চরিত্রের জন্য (গান্ধীজীর মুক্তি চাই-এর মতন জনপ্রিয় শ্লোগান নিয়ে আন্দোলন করা সত্ত্বেও) একশ্রেণীর উগ্র জাতীয়তাবাদী মানুষ (প্রধানতঃ ফরোয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি. ও কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা) এই সংগঠনকে ছাপ দিয়ে দিল 'কমু্যনিস্ট' রূপে। যদিও এর গণচরিত্র পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায় যে কোনো কোনো কমু্যনিস্ট নেত্রী এর নেতৃত্বে থাকলেও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে কখনোই একটা কমু্যনিস্ট সংগঠন রূপেই মাত্র চিহ্নিত করা যায় না। সমাজের সর্বস্তরের মহিলাদেরই এই সংগঠন দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল। এমনকি কলকাতায় মুসলিম মহিলারাও (প্রায় ৫০০ মুসলিম শ্রমিক) নাজিমুন্নেসা আহ্মদ নামক একজন তরুণীর নেতৃত্বে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও গান্ধীজীর মুক্তি আন্দোলনের শরিক হন। ১৯৪২ এর মধ্যেই বাঙলার প্রায় সকল জেলাতেই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। বলাই বাহুল্য ছাত্রী সমাজ (প্রধানতঃ ছাত্র-ফেডারেশনের সদস্যা) ছিলো এই আন্দোলনের পুরোভাগে।

### পঞ্চাশের মন্বন্তর মোকাবিলায় বাঙলার ছাত্রীরাঃ

কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তাঁর এক ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণায় বলেছেনঃ[৬৩]

"তারপর এল ১৯৪৩ সাল, বাঙলায় ১৩৫০। গোটা বাঙলাদেশ জুড়ে বিশেষ করে কলকাতায়, মহামন্বন্তরের করাল ছায়া চারদিক অন্ধকার করে দিল। আর ঘরে থাকা যাচ্ছিল না।…রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম। চৌরঙ্গী, কালিঘাট লেক মার্কেটের মোড়, বালিগঞ্জ…ওদিকে শেয়ালদা, শ্যামবাজারের মোড়। সর্বত্র এক দৃশ্য—শত সহস্র কঙ্কাল ফ্যান দাও, ফ্যান দাও বলে চিৎকার করছে। পেটের জ্বালায় গ্রাম উৎখাত করে শহরে এসে অন্নদাতা কৃষক ও জগদ্ধাত্রী কৃষাণী দু-মুঠো অন্নভিক্ষা চাইতেও সাহস পায় না—বলে ফ্যান দাও। মনুষ্যত্বের কী অবমাননা! গোরু ছাগলের খাদ্য নিয়ে মানুষে মানুষে কাড়াকাড়ি। ডাস্টবিনের পচা এঁটোকাটা নিয়ে কুকুরে মানুষে মারামারি। আর দেখলাম মৃত্যু—অমৃতের সন্তানরা মরছে যেন পোকা-মাকড়। একদিন দেখলাম মা মরে পড়ে আছে। তার স্তন ধরে অবোধ ক্ষুধার্ত শিশু টানাটানি করছে আর হেঁচকি তুলে কাঁদছে।…আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম—না—না—না। অস্থির পায়ে দৌড়তে দৌড়তে হেঁটে চলেছি আর মনে মনে বলছি—we won't allow people to die—মানুষের তৈরি এই দুর্ভিক্ষ মানবো না, প্রতিরোধ করব, উত্তীর্ণ হব।"…

কবির এই বেদনা জাগ্রত হয়েছিল বাঙলার নারীজাতির হৃদয়েও। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার ছাত্রীরাও ( অল বেঙ্গল গার্ল স্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন ) এগিয়ে এসেছিলেন মন্বন্তরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে, দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের ত্রাণকার্যে। মনুষ্য সৃষ্ট এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ কী ভয়াবহই না ছিল! গ্রাম ও শহরে মিলে অন্তত ৩০ লক্ষ মানুষ এই মন্বন্তরে শুধু না খেতে পেয়ে মারা যায়। এদের বেশীরভাগই নারী ও শিশু। অথচ বাঙলায় সেই বছর খাদ্যশস্যের কোনো অভাবই ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও মহাজন—কালোবাজারীরা মিলে চক্রান্ত করে হত্যা করলো লক্ষ লক্ষ দরিদ্র বাঙালীকে। এদের অধিকাংশই কৃষি-শ্রমিক, ভাগচাষী, দরিদ্র কৃষক ও শহর নগরের নিম্নবিত্তের দল। ৬০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ৩০ লক্ষই ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যায়। প্রায় ৩০ লক্ষ পরিবারে উপার্জন করার মত কেউ থাকে না। দশ লক্ষ বাঙালী গৃহহারা হয়। এক চতুর্থাংশ কৃষক তার জমি হারায়। বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত', বিজন ভট্টাচার্যর 'নবান্ন'-তে এর জ্বলন্ত চিত্র উপস্থিত।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ১৯৪২ এর ডিসেম্বর থেকে শুরু করে গোটা ১৯৪৩ সাল জুড়ে বাঙলায় ব্যাপকভিত্তিক খাদ্য আন্দোলন গড়ে তোলে। ভয়াবহ মন্বন্তর ও খাদ্য-সংকটের মোকাবিলায়, খাদ্যসরবরাহ ও বণ্টনের কাজ পরিচালনায় মেয়েদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা হয়। এই সময় কনট্রোলের দোকানের সামনে লম্বা লাইন পড়লে দোকানীরা লাইনে

দাঁড়ানো মানুষগুলোর সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার, এমনকি নিগ্রহ পর্যন্ত করত। এসব ক্ষেত্রে মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকারা গিয়ে ক্রেতাদের সাহায্য করতেন। বস্তি অঞ্চল থেকে শ্রমজীবী মেয়েরাও এসে এই কাজে যোগ দেন। ৩/৪ মাস আগেও যারা পর্দানসীন ছিলেন, তাঁরাও স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে এগিয়ে আসেন। মধ্যবিত্ত মহিলারাও তাঁদের ঘরের কাজ ফেলে সকাল থেকেই এই কাজে লেগে যেতেন।[৬৪] কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা কর্মী ও ছাত্রীরা এই কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতেন। শুধুমাত্র দুর্ভিক্ষ ত্রাণ বা খাদ্যসংকট মোকাবিলাতেই নয়, জাপবিমান আক্রমণ প্রতিরোধেও 'ফ্রেন্ডস্ এ্যাম্বুলেন্স ইউনিট'—এর সঙ্গে একত্রে এরা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সাইরেন বাজা মাত্রই বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে নারী-শিশুদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতেও এঁরা সাহায্য করতে থাকে। বস্তি অঞ্চলের মানুষদের অসুবিধাগুলি দূর করা, বিমান হানার পর আহতদের শুশ্রূষার জন্য এবং রিলিফ সেণ্টারে কাজ করার জন্যও নারী-ভলাণ্টিয়ারদের বিশেষ দায়িত্ব ছিল। এছাড়া প্রতিটি জেলার মহল্লায় মহল্লায় অসংখ্য রিলিফ সেণ্টার বা লঙ্গরখানা খুলে বুভুক্ষু মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেবার দায়িত্ব 'অল বেঙ্গল গার্ল' স্টুডেণ্টস্ এ্যাসোসিয়েশন' ও ছাত্রফেডারেশনের কর্মীরা গ্রহণ করেছিলেন। সেদিনের ছাত্র-আন্দোলনের একজন প্রথমসারির ছাত্রীসংগঠক ছিলেন বর্তমান বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা অলকা মজুমদার (চট্টোপাধ্যায়)। তিনি এক স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ[৬৫] "যুদ্ধের মধ্যে দেশী-বিদেশী চক্রান্তে তখন 'আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে।' তারপর দ্রুত যোগাযোগ ঘটে গেল। এই ছাত্রীদের উৎসাহেই প্রধানত দিনাজপুরে কৃষক ও মধ্যবিত্ত মেয়েদের নিয়ে গড়ে উঠলো মহিলা সমিতি। মহিলা সমিতির নেতৃত্বে গ্রাম ও শহরের মেয়েদের মিলিত এক বিরাট 'ভুখা মিছিল' জেলা-শাসকের দপ্তর অবরোধ করলো—এই ধরণের মিছিল ভারতে প্রথম বলে অভিনন্দিত হল 'পিপলস্ ওয়ার' পত্রিকায়। সে যুগে ছাত্রীরাই বিভিন্ন শহরে মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনের প্রাথমিক দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

"দিনাজপুর থেকে আবার কলকাতা, আশুতোষ কলেজ। গ্রাম তখন কলকাতার পথে পথে উঠে এসেছে। 'পথে পথে দলে দলে কঙ্কালের শোভাযাত্রা চলে', এখানে সেখানে নিরন্ন মানুষের মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে। দুঃসহ বেদনায় আশুতোষ কলেজের সেই ছাত্রীটি পথ খোঁজে। একদিকে কলেজে ছাত্রী ইউনিয়ন গড়ার আন্দোলন, অন্যদিকে ছাত্রীদের জনসেবায় সংগঠিত করার কাজ। একদিনেই কলেজ ও বাইরে সাতশো টাকা সংগৃহীত হল।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য বাণী দাশগুপ্তাও ছিলেন আশুতোষ কলেজের সেই সময়ের একজন ছাত্রী। ১৯৪৫ সালের ২২ জুন অল্প বয়সেই

এই কমিউনিস্ট তরুণীর জীবনাবসান ঘটে। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি রিলিফের কাজে আত্মনিয়োগ করে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছাত্রী মহলে প্রিয়পাত্রী হন। এরকম ভাবে অল্প বয়সেই অসুস্থতার কারণে অকালে প্রাণ ত্যাগ করেন আরো দুইজন ছাত্রী কর্মী। নোয়াখালি জেলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা পূর্ণিমা শীল (মৃত্যু ঃ ২৬ জুলাই, ১৯৪৫) এবং অপরজন বিরালিবাজারের কিশোর বাহিনীর নেত্রী কল্যাণী কর (মৃত্যু ২৫ জুলাই, ১৯৪৫)।[৩৬] তথ্যক'টি হঠাৎ পেয়ে গেলাম বলে এই নিবন্ধে উল্লেখ প্রয়োজন মনে করলাম।

এই সময়কালে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র উদ্যোগে সংঘটিত একটি স্মরণীয় ঘটনা হ'লো বিধানসভা ভবন অভিমুখে মহিলাদের বিশাল 'ভুখা-মিছিল' (১৭ মার্চ, ১৯৪৩) পরিচালনা। কলকাতার বস্তি অঞ্চল সহ উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলীর প্রায় ৫,০০০ মহিলা শোভাযাত্রা সহকারে খাদ্যের দাবিতে এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ঐদিন বিধানসভা অভিমুখে যাত্রা করেন। ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালি পরা হাড্ডিসার শত সহস্র মায়ের দল তাঁদের হাড়-জিরজিরে মুমূর্ষু শিশু কোলে নিয়ে কলকাতাবাসীর চেতনায় সেদিন যেন কশাঘাত হেনেছিল। কমিউনিস্ট নেত্রী রেণু চক্রবর্তী লিখেছেন, এটাই হলো মহিলাদের প্রথম সংগ্রামী মোর্চা—যা নাড়িয়ে দিয়ে গেল গোটা শহরকে, পিঠ সোজা করে বসতে হলো সরকারকে। নারী-আন্দোলনে এক নতুন পর্যায় এলো। সম্পূর্ণ মধ্যবিত্ত সমাজের আন্দোলন থেকে কলকাতার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি পৌঁছল শ্রমিক-গৃহিনীদের স্তরে এবং তাদের বাণী পৌঁছে দিল গ্রামের দরিদ্র মানুষের কাছে।" কলকাতার অনুসরণে কমিউনিস্ট মহিলাদের এই ধরণের ভুখামিছিল ছড়িয়ে পড়ল বাঁকুড়া, পাবনা, ফরিদপুর,, বরিশাল, রংপুর, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলাতেও। একই সঙ্গে অবশ্য চলতে থাকলো ফ্যাসিস্ত বিরোধী প্রচার।[৩৭]

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বাঙলার নারীসমাজের এই ব্যাপক ভিত্তিক গণআন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে তুলবার পশ্চাতে ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সুপরিকল্পিত নেতৃত্ব। ১৯৪২ এর ২২ জুলাই পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরই মহিলা ফ্রন্টকে সংগঠিত করার বিশেষ পরিকল্পনা কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করে। ইতিমধ্যেই কলকাতা এবং বিভিন্ন জেলায় পার্টিসদস্য মহিলাকর্মীরা রাজনৈতিক শিক্ষার ক্লাস ইত্যাদি সংগঠিত করে মহিলাকর্মী গড়ে তুলতে থাকে। প্রধাণতঃ শিক্ষিত ছাত্রী কর্মীদের মধ্য থেকেই নারী আন্দোলনের সংগঠক ও কর্মী বাহিনী গঠন শুরু হয়। প্রাদেশিক কমিটির তরফ থেকে সারা প্রদেশের নারী আন্দোলনকে সংগঠিতভাবে পরিচালনা করার জন্য পাঁচজন মহিলা সদস্যকে নিয়ে প্রাদেশিক মহিলা ফ্রাকশন ও পরে প্রাদেশিক স্পেশাল সেল গঠন করা

হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন মণিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তী, কমলা মুখার্জি, যুঁইফুল রায় ও কনক মুখার্জি। লক্ষ্যণীয় এঁরা প্রত্যেকেই এসেছিলেন ছাত্র আন্দোলন থেকে এমনকি তখনও কেউ কেউ ছাত্রী সংগঠন গড়ার কাজে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত থাকতেন পার্টির পক্ষ থেকে। বস্তুত সমাজের ব্যাপক অংশের মহিলাদের গণআন্দোলনে সামিল করার উপযুক্ত সংখ্যক মহিলা কর্মীর একান্ত অভাবের ফলে ছাত্রীআন্দোলনের কমিউনিস্ট সংগঠকদের একই সঙ্গে মহিলা 'সংগঠন' এবং শ্রমিক সংগঠনেও সক্রিয়ভূমিকা পালন করতে হতো।

বাঙলার বিভিন্ন জেলায় ছাত্রীরা এই সময় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পাশাপাশি এগিয়ে এসেছিলেন রিলিফের কাজে। ছাত্র ফেডারেশন ও গার্ল স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বহু স্থানে শিশুদের জন্য দুধ বিলির ব্যবস্থা করা হয়। বেথুন কলেজ ছাড়াও কলকাতায় বিভিন্ন কলেজ, ঢাকায় বর্ধমানে, মুর্শিদাবাদে, নদীয়ায়, হাওড়ায়, বাঁকুড়ায়, দিনাজপুর, রংপুরে, বগুড়ায়, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে, ২৪ পরগণায়—বসিরহাটে ও গোবরডাঙ্গায় যথাক্রমে ২৬০টি দুধের ক্যাণ্টিন 'গার্ল স্টুডেণ্টস্ অ্যাসোসিয়েশন (জি, এস, এ)' পরিচালনা করছে। প্রায় পনের হাজার শিশুর জন্য তারা দুধ বিলি করার ব্যবস্থা করেছে। শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি ও অনাহারের জন্য মৃত্যুর হার বেশি ছিল। মহামারী প্রতিরোধে কলকাতায় "অল ক্যালকাটা টিচার্স এণ্ড স্টুডেণ্টস ইউনাইটেড রিলিফ কমিটি" গঠন করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই কমিটির সভাপতি হন। এই কমিটি পরিকল্পনা করে জেলায় জেলায় রিলিফ স্কোয়াড পাঠাতে থাকে। মহামারীতে মৃত্যুর সংবাদ আসায় এই কমিটি সর্বপ্রথম পাবনা, ফরিদপুর ও ঢাকায় চিকিৎসার জন্য ওষুধ যন্ত্রপাতি নিয়ে রিলিফ স্কোয়াড রওনা হয়ে যায়। বাঁকুড়া, যশোহর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিং, বরিশাল, হাওড়া, খুলনা, জলপাইগুড়ি, নোয়াখালি ও অন্যান্য আরও কয়েকটি জেলায় ছাত্র সংগঠন মজবুত থাকায় তারা নিজেরাই স্থানীয় খাদ্য-কমিটির সহায়তা নিয়ে মহামারির বিরুদ্ধে স্কোয়াড তৈরী করে দুঃস্থ ও পীড়িত জনগণের সেবায় নিয়োজিত হয়।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রীরা ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি রিলিফের কাজে দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে আসে। এই জন্য প্রতিটি জেলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা বা সংগঠক রূপে দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। তার একটি তালিকা সমিতির সম্পাদিকা এলা রীড প্রকাশ করেছিলেন। তাতে আছে ঃ কলকাতা—অনিলা দেবী ; ২৪ পরগণা—নিবেদিতা নাগ ; হাওড়া—প্রীতি লাহিড়ি ; হুগলী—প্রতিভা গাঙ্গুলি ; বর্ধমান—বিভা কোঙার ; যশোহর—চারুবালা রায় ; খুলনা—ভানু দেবী ; বরিশাল

—বীণা সেন; ফরিদপুর—উমা ঘোষ; ঢাকা—হিরণপ্রভা ব্যানার্জী; ময়মনসিংহ—জ্যোৎস্না নিয়োগী; চট্টগ্রাম—আরতি দাস; নোয়াখালি—জ্যোতি দেবী; কুমিল্লা—বীণা ব্যানার্জী; পাবনা—মায়া সান্যাল; রাজশাহী—অনুপমা বাগচী; রংপুর—রেবা রায়; দিনাজপুর—আশা চক্রবর্তী; জলপাইগুড়ি—গায়ত্রী রায়; বগুড়া—রেনুকা গাঙ্গুলি; মেদিনীপুর—অনুপমা পট্টনায়েক; বীরভূম—সত্যবালা চ্যাটার্জি; বাঁকুড়া—ভক্তি সিংহ; নদীয়া—মঞ্জু চ্যাটার্জি এবং মুর্শিদাবাদ—আরতি রায়।

এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ছাত্রী আন্দোলনেরও সংগঠক। জেলায় জেলায় গার্ল স্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সঙ্গে যৌথ ভাবে রিলিফের কাজ পরিচালনা করতো। শুধু কমিউনিস্টরা নয় এই কাজে কংগ্রেসের মহিলা নেত্রীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন। শ্রীমতি নেলী সেনগুপ্তা, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, বাসন্তী দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি, মোহিনী দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, মিসেস মোমিন, মিসেস গণি, আর্যবালা দেবী প্রমুখ বিশিষ্ট নেত্রীরা রিলিফের কাজে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি মুসলিম পরিবারের মেয়েরাও বেশ কিছু সংখ্যায় রিলিফের কাজে অংশ নিয়েছিলেন। প্রসিদ্ধা মুসলিম নেত্রী দৌলতুন্নেসা, শাহজাদী বেগম, সাবেদা খাতুন, মিসেস মোমিন প্রমুখরা এমনকি মুসলিম লীগেরও আরো কয়েকজন আত্মরক্ষা সমিতিতে যোগদান করেন। তৎকালীন বাঙলায় এ ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

[ দ্রঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা; সরোজ মুখোপাধ্যায়;
পৃঃ ১৬০—৭০ এবং ৩১৬—১৭ ]

ছাত্রীসংগঠক ও কর্মীদের ভূমিকা সেই সময় ছিল ব্যাপক। বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পরেই বে-আইনী ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি প্রাদেশিক 'ছাত্র ফ্রাকশনের' (ছাত্রদের মধ্যে কর্মরত পার্টি সদস্যদের গোপন সেল) কাছে পাঠানো এক নির্দেশিকায় ছাত্রী সদস্যদের সম্পর্কে বলেছিলেন, "একজন পার্টি সভ্য ও চারজন দরদী ছাত্রীকে নিয়ে একটি ছাত্রী গ্রুপ গঠন করে ছাত্রী সমিতির (গার্ল স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন) কাজ করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শ্রমিক বস্তিতে শ্রমিক মেয়েদের কাছে ইউনিয়ন ও সংগঠনের কথা প্রচার করতে হবে।"[৬৮]

১৯৪৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে মহিলা পার্টি সদস্যর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫১ জন, পার্টি দরদী ৪৩৮ জন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫৯৫৭ এবং সারা বাঙলায় আত্মরক্ষা সমিতির গড়ে উঠেছে ৮৯টি শাখা। অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে ও পরিচালনায় 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'

মূলতঃ পরিচালিত হতে থাকলেও তা কিন্তু কোনো দলীয় সংকীর্ণতার মধ্যে কখনো আবদ্ধ থাকেনি। দলমত নির্বিশেষে অন্যান্য মহিলা সংগঠনগুলি অবশ্যই আত্মরক্ষা সমিতির সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে কাজ করেছেন। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, খৃষ্টান মহিলা সমিতি সব দলের সমর্থকই 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'তে সামিল হয়েছিল। যাইহোক সমিতির প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৩-এর ৭-৮-ই মে, কলকাতার ওভারটুন হলে। বাঙলার নারী আন্দোলনের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। বহু মহিলা 'মহাত্মা গান্ধীর ও জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই'; 'ফ্যাসিস্ত হামলা-বাজ মুর্দাবাদ'; 'সকলের জন্য খাদ্য চাই' ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে দলে দলে হেঁটে সভায় আসেন দূরবর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে। অবিভক্ত বাঙলার ২১টি জেলার প্রতিনিধিদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গঠিত হয় 'নিখিল বঙ্গ মহিলা-আত্মরক্ষা সমিতি' এবং তারই মধ্য দিয়ে নারী আন্দোলন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। সন্দেহ নেই যে এই মহিলা সংগঠন গঠনের পশ্চাতে ছাত্রী-সমাজের সংগঠিত অংশের ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। কমিউনিস্ট ছাত্রী সংগঠকদেরই সে সময়ে কাজ করতে হতো মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মঞ্চে। এছাড়া মন্বন্তর পীড়িত বাঙলার হাহাকারকে শিল্পে পর্যবসিত করে বিনয় রায়ের নেতৃত্বে যে সাংস্কৃতিক গ্রুপ সারা উত্তরভারত সফর করে ('ভয়েস অব বেঙ্গল' নামে বিখ্যাত) লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে এনেছিল দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলার জন্য—তাতেও যোগদান করেছিলেন প্রীতি সরকার, সাধনা গুহ, রেবা রায়চৌধুরীর মতো ছাত্রী সংগঠকরা। রেণু চক্রবর্তীর স্মৃতিকথাতেও রয়েছে তারই সমর্থন[৬৯]। "প্রথম রাজ্য সম্মেলনের পরে, রাজশাহী জেলা সম্মেলন হয় ১১ই জুলাই রাজশাহী টাউন হলে। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রায় ২৫০ মহিলা—তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যবিত্ত পরিবারের। ছাত্র-নেত্রী প্রীতি সরকারের নেতৃত্বে একটি গানের দল আসে। মধুকণ্ঠী প্রীতির কণ্ঠে লহর ওঠেঃ "দেশে উঠল দারুণ হাহাকার"—সে গান এর পর কণ্ঠে কণ্ঠে বেজে বিখ্যাত হয়। শ্রোতারা গভীরভাবে অভিভূত হন। সম্পাদিকা অনুপমা বাগচী তৎকালীন সংকটে সমিতির কর্তব্যের ওপর বক্তব্য রাখেন। ছাত্রী সমিতির সম্পাদিকা বলেন, বর্তমান দারুণ সংকটে প্রতিটি পরিবার ধ্বংসের মুখে; অতএব ছাত্রীদের মধ্যে কাজ আরো জোরদার হতে হবে। আর একজন ছাত্রী সমিতির কার্যকলাপ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝান। এইভাবে ছাত্রীরা নানা আকর্ষক উপায়ে মহিলা সংগঠন গড়ে তুলতে প্রয়াস করেন।" এর থেকেই বোঝা যায় যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি কেবল বয়স্কা মহিলাদেরই নয়, ছিল সংগঠিত ছাত্রীদেরও নিজস্ব সংগঠন।

## মণিকুন্তলা সেনের স্মৃতিতে কয়েকটি জেলায় ছাত্রীদের ভূমিকা ঃ

জনযুদ্ধের যুগের বিশিষ্ট মহিলা সংগঠন ও কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের স্মৃতিকথায় অবিভক্ত বাঙলার কয়েকটি জেলার ছাত্রী-সংগঠকদের ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কিছু দুর্লভ চিত্র পাওয়া যায়।[৭০] ১৯৪২-৪৩ সাল জুড়ে মণিকুন্তলা সেন, বেলা লাহিড়ি, কনক মুখার্জি এবং রেণু চক্রবর্তী প্রমুখ সংগঠকরা জেলায় জেলায় ঘুরে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গঠনের কাজ চালিয়ে যেতেন। জেলার অসংখ্য ছাত্রীকর্মীরাও সেই সময়ে 'আত্মরক্ষা সমিতির' কাজে সামিল হয়েছিল। তিনটি কাজের ধারা তখন একই সঙ্গে চলতে থাকে।

১. ফ্যাসিস্ট-বিরোধী প্রচার ও জনমত গঠন করা।

২. বন্দীমুক্তি আন্দোলনে কংগ্রেস, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে একই মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করা।

৩. দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের সেবা, নারী ও শিশুদের জন্য খাদ্যবস্তু আদায় করা ছাড়াও আশ্রয়কেন্দ্র, কর্মকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র খোলার সাধ্যমত চেষ্টা করা।

**হুগলী ঃ** "হুগলীর সন্ধ্যা চ্যাটার্জী এই সময়কার একজন সুদক্ষ কর্মী। জীবিকার জন্য তার কোন কাজের দরকার ছিল না। সুতরাং সবটা সময়ই সে দিতে পারত। সন্ধ্যার বোন আরতি ছিল ছাত্রীনেত্রী। চন্দননগরকে কেন্দ্র করে অন্যান্য কর্মীদের সহায়তায় জিলার চুঁচুড়া, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর, ভাটপাড়া, কোন্নগর, সিঙ্গুর প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে সমিতির পরিধি বিস্তৃত করতে পেরেছিল সন্ধ্যা চ্যাটার্জী।

**হাওড়া ঃ** "হাওড়া জিলায় সবচেয়ে বড় শাখা সমিতি তৈরি হয় বাগনানে —নিরুপমা চ্যাটার্জীর নেত্রীত্বে।...তখন ও বোধহয় স্কুলে পড়ে অথবা স্কুল-জীবন শেষ করেছে। ঐ বয়সেই বাগনানের সমস্ত গ্রামগুলো বলতে গেলে সে চষে বেড়াত। সব বাড়িতে ছিল ওর যাতায়াত এবং সে ছিল সবারই 'নিরুদি'।

**বাঁকুড়া ঃ** "বাঁকুড়ায় ভক্তি সেন ও মুক্তি সেন—দুই বোন ওখানকার প্রথম দিকের কর্মী। ভক্তি শিক্ষিকা, মুক্তি ছাত্রী। বাঁকুড়ায় এদের চেষ্টায় ছাত্রী সংগঠন ইতিপূর্বে তৈরী হয়েছে। রিলিফের জন্য প্রচেষ্টাও তারা শুরু করেছে। এর সঙ্গে মহিলা সংগঠন এবং গণআন্দোলনও গড়ে তোলার প্রয়োজন হলো। ভক্তি আর মুক্তি দু'জনেই বিড়ি তৈরির মহিলা শ্রমিকদের মধ্যেও কাজ করত। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মজুরি কম দেওয়া হতো।... ভক্তি ও মুক্তির চেষ্টা ছিল এদের দাবীর সমর্থনে শহরের ছাত্রী ও মহিলাদের টেনে আনা।

"টাউন হলে একটি বড় সমাবেশ করার কাজ হাতে নেওয়া হয়।…নির্দিষ্ট দিনে পোস্টার, ব্যানার, শ্লোগানে মুখরিত একটি সুবৃহৎ মিছিল টাউনের অনেক রাস্তা পরিক্রমা করে। ছাত্রীদের বৃহৎ সংখ্যায় যোগদান, স্কুলের শিক্ষিকাদের উপস্থিতি, বহু সংখ্যায় গরীব ও মধ্যবিত্ত মেয়ে, গ্রামের কৃষক মেয়ে ও কিছু মুসলিম মেয়ের যোগদানের ফলে মিছিলটি সর্বজনীন রূপ নেয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিরূপতা ছিল না, বরং সহযোগিতা ছিল।"

**রাজশাহী:** "অনুপমা বাগচী ছিল এই কেন্দ্রের অন্যতম পরিচালিকা। অনুপমা দক্ষ কর্মী। রাজশাহীতে ওকে প্রথম দেখি। তখন ছাত্রী ছিল। ওখানে মহিলা সম্মেলনে যাই। সেই সময় ওকে আর সুগায়িকা ছাত্রী প্রীতি সরকারকে (ব্যানার্জী) দেখি। রাজশাহীতে ওরা দুর্ভিক্ষের শুরু থেকে ছাত্র সংগঠন ও মহিলা সংগঠনের হয়ে রিলিফের কাজ আরম্ভ করে। প্রথম থেকেই ওরা স্থানীয় কংগ্রেসী ছাত্রীদের কাছ থেকে বাধা পায়। ওদের বিরুদ্ধে দেওয়ালে পোস্টার লাগানো, মিটিং ভেঙে দেওয়া, বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরোলে তাতে বাধা দেওয়া—এসব কাজ প্রায় প্রতিদিনই করতেন কংগ্রেসী ছাত্রীরা। কিন্তু সাহসের সঙ্গে কাজ করতে করতে ওরা এসব বাধা পেরিয়ে যেত। রিলিফের কাজেও ওরা শহরের প্রশংসা পায়।"

**মেদিনীপুর:** "এবারে মেদিনীপুরের তমলুকে জিলা সম্মেলন হবে। অন্তত একটি করে প্রাইমারী কমিটি স্থাপন করার জন্য আমরা তমলুক, গড়-বেতা ছাড়াও জিলার কেশপুর, দাসপুর, শালবনী, ঘাটাল প্রভৃতি আরও কয়েকটি মহকুমা ঘুরলাম। গীতা মুখার্জী, ঊষা চক্রবর্তী, সাধনা পাত্র, আমি আর 'বাতাসী'—এই ক'জন মিলে সমিতি বিস্তারের চেষ্টা করলাম।…

"সম্মেলনটি বেশ বড় আকারে হলো। জিলার প্রায় সব মহকুমা থেকেই এলো প্রতিনিধিরা। মেদিনীপুর শহর থেকেও এলো প্রতিমা ব্যানার্জি। সে কলেজের ছাত্রী কিন্তু ওখানে মহিলা সমিতি করছে। ওর সঙ্গে সমিতির আরও কিছু প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত হলো।…তমলুকেই স্থাপিত হলো জিলা কমিটি।…যে তমলুক 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে জিলার নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেই তমলুকেই আবার পটপরিবর্তন ঘটল। অধিকাংশ কৃষক-নারী ও মধ্যবিত্তের একাংশ নিয়ে নতুন ধারায় নারী-আন্দোলনের সূচনা হলো সেইখানে।

**বরিশাল:** "বছরখানেক ধরে চেষ্টার ফলে আত্মরক্ষা সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলন বরিশালে অনুষ্ঠিত হবার উপযুক্ত অবস্থায় পৌঁছায়। সারা বাঙলার প্রায় সর্ব জিলায় সংগঠন গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ জিলাগুলিতে সম্মেলন করে বরিশাল সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। সদস্য সংখ্যা তখন ৪০ কিংবা ৫০ হাজার হবে, এতটা ব্যাপক গণভিত্তি বাঙলাদেশে

আর কোনো মহিলা সমিতির ছিল না। কংগ্রেস থেকেও মহিলা সমিতি গড়া হয়েছিল। কিন্তু তা এভাবে সংগঠিত রূপ নেয়নি। বরিশালের সদস্য সংখ্যাও তখন প্রায় বিশ হাজার। সব মহকুমাতেই সমিতির শাখা হয়েছে।

"আমি যখন বরিশালে গেলাম তখন মনোরমা মাসীমা, যূঁইফুল বসু, কিরণ দাস, সরযূ সেন, অমিয়ানিভা সেন—এইসব বয়স্কারা সবাই গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন। আর সেই ছাত্রীদল এখন কলেজে পড়ছে ও সমিতির কাজ করছে। সেই সুহাসিনী, অমিয়া, বীণা দাস, শোভা সেন, বিভা দাশগুপ্ত, রেনু বসু, যূঁইফুলের বোন মিনু—এরা শহরময় ঘুরছে ও প্রয়োজনে গ্রামে যাচ্ছে। এরা ছাড়াও আরও অনেক নতুন কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবিকা দলে এসে প্যারেড শিখছে এবং সম্মেলন পরিচালনায় নিজ নিজ কাজের ভার বুঝে নিচ্ছে।

সিলেট: "সিলেট শহরে মহিলা সমিতি আগের থেকেই ছিল। হেনা দত্ত এবং ডঃ সুন্দরীমোহন দাসের দুই নাতনী—ডাঃ কল্যানী দাস ও ছাত্রী অঞ্জলি দাস ওখানে সমিতি করেন। আমাকে নিয়ে মিটিং হলো। এরপর অঞ্জলি ও হেনা আমাকে শিলং নিয়ে গেল। অঞ্জলি ওখানকার কলেজের ছাত্রী, তাই কলেজের ছাত্রী-মিটিং-এ বক্তৃতা করতে হবে। ছাত্রী-সংঘের প্রচারেই যাওয়া। অঞ্জলি আমার সঙ্গে কতকগুলো এলাকায় ঘুরল। ওর খুব ইচ্ছা ছিল পড়া ছেড়ে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হবে। আমি ওকে অনেক বোঝাতাম। এখন নয়, পড়া শেষ হোক। আমাদের সঙ্গে জ্যোতির্ময় নন্দী ছিলেন। তিনি ওকে ঠাট্টা করেই চুপ করাতেন। তবে শেষ পর্যন্ত অঞ্জলি পড়া শেষ করে হোলটাইমার হয়ে গিয়েছিল।"

এই জেলা ভিত্তিক কয়েকটি খণ্ড চিত্র অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রেও সমান সত্য। নারীআন্দোলনের বিকাশে বামপন্থী ছাত্রীরা সেদিন কী অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন উক্ত স্মৃতি-কথাগুলি থেকেই তা বোঝা যায়।

## সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী উত্তাল ছাত্র-আন্দোলনের নির্ভীক শরিক:

১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ দিনটি পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণআন্দোলনের শীর্ষচূড়ায় ছিল বাঙলার দামাল ছাত্রসমাজ। ছাত্রীরা ছিল তারই নির্ভীক শরিক। অসংখ্য-অগুনতি ছাত্রী সেই উত্তাল সময়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনা থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শহীদের রক্তরাঙা কঠিন রাজ-পথে। সমস্ত রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভেদাভেদ ভুলে স্বাধীনতা-কামী ছাত্র-ছাত্রীর ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক মঞ্চ সেদিন গড়ে তুলেছিল ছাত্র-আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ছাত্রীদের ভূমিকাও তাতে কম কিছু ছিল না।

১৯৪৪-এর ডিসেম্বর মাসে, কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত হল

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন। সভাপতির আসনে ছিলেন প্রসিদ্ধ প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি ছিলেন সদ্য কারামুক্ত দেশনেত্রী শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু আর সম্মেলন উদ্বোধন করলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বাঙলার ছাত্র সমাজকে অভিনন্দিত করে সরোজিনী নাইডু এক দৃপ্ত ভাষণে বল্লেন: "আত্মত্যাগ আমরা করিনি, আত্মত্যাগ করেছে তোমরা বাঙলার তরুণ সমাজ। তোমাদের ধন্যবাদ জানাই। বাঙলার ঘোর দুঃসময়ে তোমরা জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে অসামান্য সেবাকার্য্য করেছ, কে তা অস্বীকার করবে? এখন স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম আসন্ন। ঝগড়া ভোল, এক জোট হও, চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত ও সংহত হও।" সম্মেলনের সমাপ্তি ভাষণে সভাপতি অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ বল্লেন: "তোমরা ছাত্র-ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেছ। এই আশা নিয়ে আমি তোমাদের সম্মেলনে এসেছিলাম যে তোমাদের ছাত্র-ঐক্য গড়ার কথা বলবো। আমি আনন্দিত যে তোমরা ছাত্র-ঐক্যের পথে অনেকদূর এগিয়ে গেছ। ঐক্য একদিনে আসবে না, ধাপে ধাপে তা গড়ে উঠবে। ঐক্যের দরজা তোমরা খুলে দিয়েছ…।" সম্মেলনের শেষদিনে, মহম্মদ আলি পার্ক উপছে পড়া ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীর প্রতিজ্ঞা-দৃপ্ত কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হ'ল সেই ধ্বনি: ছাত্র-ঐক্য জিন্দাবাদ। ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।[৭১]

সারা ভারতে প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনেও সেই যুগের ছাত্রফেডারেশনের মূল্যবান অবদান ছিল। ওই সময়ে ছাত্র ফেডারেশনের স্কোয়াডগুলোই ঘুরে বেড়িয়েছে 'জনযুদ্ধের গান,' 'নব জাগরণে'র গান গেয়ে। বর্তমানের প্রসিদ্ধা গায়িকা সুচিত্রা মিত্র, অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, কল্যাণী মুখার্জী (কুমারমঙ্গলম) প্রীতিকা বিশ্বাস (সকলেই বিখ্যাত 'নবান্ন' নাটকে অভিনয় করেছিলেন), রেবা রায়, রবি দত্ত, প্রীতি সরকার, কল্যানী সেন (চৌধুরী) প্রমুখ ছাত্র-আন্দোলনের নেত্রীরাই তৎকালে এককথায় গিয়ে গান বা অভিনয় করতেন 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র মঞ্চে। যাই হোক ১৯৪৫-এর মে মাসে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হল। বার্লিনে নাৎসি জার্মানির ধ্বংসস্তুপের উপর বিজয়ী সোভিয়েত ফৌজ উড়িয়ে দিল মুক্তির লাল নিশান। এশিয়াতেও জাপানী ফ্যাসিবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র গণ-উত্থানের মাধ্যমে মুক্ত হল ভিয়েতনাম। মুক্তির লড়াই শুরু করল ইন্দোনেশিয়া, মালয়, বর্মা। ভারতবর্ষ তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক জমাট ক্রোধের আগ্নেয়গিরি।

## কুচবিহার দিবস (২৯ আগস্ট, ১৯৪৫) ও ট্রাম ধর্মঘটে (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫) ছাত্রসমাজ:

১৯৪৫-এর আগস্ট মাসের শেষে কুচবিহারে ছাত্রদের উপর বর্বর লাঠি

চালনা করল পুলিশ। কারারুদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীরাও একই সময় করলেন অনশন ধর্মঘট। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ধর্মঘটের ডাক দিল ২৯ আগস্ট রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে ও ব্রিটিশ দমননীতির প্রতিবাদে। ধর্মঘট হল কলকাতার প্রায় প্রতিটি কলেজে। রাস্তা দিয়ে সংগ্রামী মিছিল করল প্রায় ৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের জনসভায় সমবেত হল ১৫ হাজার ছাত্র ও নাগরিক। সভাপতিত্ব করলেন প্রবীণ কংগ্রেসসেবী ও বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। (জনযুদ্ধ, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫)[৭২]

৯ সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতার ১৩ হাজার ট্রাম-শ্রমিক ব্রিটিশ কোম্পানীর বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক ধর্মঘট শুরু করলো তাতে ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রকংগ্রেস সহ অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের কর্মীরাও কলেজে কলেজে সভা করে চাঁদা তুললো, পথের মোড়ে মোড়ে পথসভা করলো। এই দুটি ক্ষেত্রেই ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।[৭৩]

## আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তির দাবি দিবস (২১ নভেম্বর, ১৯৪৫):

লালকেল্লায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার শাহ্ নওয়াজ, ধীলন ও সায়গলের 'বিচার' করছে। এই বিচারের প্রহসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল বাঙলার ছাত্র-জনতা। সেই নভেম্বরেই শুরু হলো স্বাধীনতার শেষ লড়াই। ২১ নভেম্বর পূরবী মুখার্জি-র নেতৃত্বে ছাত্র-কংগ্রেস, মির্জাপুর ছাত্র ফেডারেশন মিলে সারা বাঙলা ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিল। বি, পি, এস, এফ-কে কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে বিচ্ছিন্ন রাখার একটা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে বি. পি. এস. এফ-এর অনুগামী ছাত্র-ছাত্রীরাও ধর্মঘটের পরে মিছিল করে এগোলেন ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মিছিলের গতিরোধ করল। ছাত্র ছাত্রীরা ঐক্যবদ্ধভাবে হাজারে হাজারে বসে পড়লেন রাস্তায় কণ্ঠে তাদের শ্লোগান, "লাল কিল্লাকো তোড় দেও, আজাদ ফৌজকো ছোড় দেও।" সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ গুলি চালালো পুলিশ। ধর্মতলা স্ট্রিটে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ল ছাত্র রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মজদুর নওজোয়ান আবদুস সালাম। আহত হল আরও অনেকে। তলপেটে গুলি লেগে মারাত্মকভাবে আহত হল বি. পি. এস. এফ সংগঠক অরুণ সেন। শরৎ বসুর মতো জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের একজনও সেদিন কিন্তু এসে দাঁড়ালেন না ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে। শুধু ছিলেন মহিলা নেত্রী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি, বিমল প্রতিভা দেবী এবং কমিউনিস্ট নেতা নৃপেন চক্রবর্তী।

পরদিন ২২ নভেম্বর ডাকা হল সর্বাত্মক হরতাল। তেরঙ্গা, সবুজ ও লাল

ঝাণ্ডা নিয়ে কাতারে কাতারে শ্রমিক-জনতা ছুটে এলো ধর্মতলায়। পিছিয়ে থাকলো না কলকাতার সচেতন ছাত্রীসমাজ। তৎকালীন ছাত্র ফেডারেশনের নেত্রী গীতা মুখার্জির নিজের কথায়ঃ "পরদিন ভোর বেলায় সকালের মেয়েদের কলেজগুলি থেকে আমরা ছাত্রীরাই সর্বাগ্রে পৌঁছলাম ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। বেলা যত বাড়তে লাগল কলকাতা যেন ওয়েলিংটন ও তার আশে পাশে ভেঙে পড়ল। ...একটু বেলায় ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমান মৌলানা আজাদ কলেজ), কারমাইকেল হোস্টেল ইত্যাদি থেকে সবুজ জমিতে চাঁদ তারা আঁকা মুসলিম ছাত্রদের পতাকা নিয়ে ঢুকলেন মুসলিম ছাত্ররা। তখনকার দিনে অন্যতম প্রধান বিভেদ, সাম্প্রদায়িক বিভেদের বাঁধও ভেঙে গেল।"[74]

ছাত্র-ছাত্রীদের মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম বৃথা হয়নি। সারাদেশের আন্দোলনের চাপে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সেনানীর মুক্তি দিতে বাধ্য হন। স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত সংগ্রামের সূচনায় বাঙলার ছাত্র সমাজের এই জয়দৃপ্ত আন্দোলনে ছাত্রী সমাজের অংশ গ্রহণ ছিল বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। কলকাতার রাজপথে ব্যারিকেডের পিছনে পুলিশের বেয়নেটের সামনে অকুতোভয়ে এসে দাঁড়াল বাঙলার ছাত্রীরা।

সেই সময়কার ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক বর্তমানের কমিউনিষ্ট নেতা অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণে আমরা পাই জঙ্গি স্বাধীনতা কামী ছাত্রী প্রতিনিধিদের মানসিকতার ছবি ঃ

"...এগিয়ে আসছে একটি শোভাযাত্রা। সামনে দুটি মেয়ে—এক সহ-পাঠিনীর হাতে ফ্লাগ। এগিয়ে তারা যাবেই, তারা প্রাণ দেবেই। দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন এক বৃদ্ধ কংগ্রেসকর্মী—তোমরা যেতে পারবে না। না না, কিছুতে না।

—'ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। এ পথে আমরা যাবই।'

—তোমাদের নেতা বারণ করেছেন। কংগ্রেস বারণ করেছে।

—'আমাদের নেতা কেউ নেই। ছিলেন যিনি তিনি মৃত। আজ আমরা মরবো। এ পথে যাবই।'

বৃথা চেষ্টা। ওরা যাবেই। ঘুরে দাঁড়ালাম। বুক দিয়ে, পিঠ দিয়ে আটকে ধরেছি পথ, আমরা কয়েকজন হাত ধরাধরি করে। দশহাত দূরে ব্যারিকেড। কি ভয়ংকর মুহূর্ত।"

[ পথের দাবী / রক্তের স্বাক্ষর ]

**রসিদ আলির মুক্তির দাবীতে ছাত্র সমাজ (১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬) ঃ**

আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রসিদ আলির তখন লালকেল্লায় বিচার

চলছে। মুসলিম ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশন শেষ পর্যন্ত একত্রে বাঙলা-ব্যাপী ছাত্রধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল রসিদ আলির মুক্তির জন্য। সেদিনও পুলিশ বিরাট ছাত্রমিছিলের গতিরোধ করলো ক্লাইভ স্ট্রিটে (বর্তমান নেতাজী সুভাষ রোড)। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর প্রধান ঘোষণা করল "তোমরা ফিরে যাও, নইলে তোমাদের চূর্ণ ( Smash ) করব।" ছাত্রজনতার পক্ষে ছাত্রফেডারেশনের সম্পাদক অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য জবাব দিলেন "তোমরা আমাদের পেটাতে পার, খুন করতে পার, চূর্ণ করতে কিছুতেই পারবে না।"[৭৫] গুলি চললো। পরের দিন থেকে ৩/৪ দিন পর্যন্ত সারা বাঙলা জুড়ে শুরু হল ধর্মঘট, ব্যারিকেড, প্রতিরোধ। কলকাতা ও সারা বাঙলা জুড়ে ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ালো শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টি। শুরু হল সর্বাত্মক হরতাল। কংগ্রেস নেতৃত্ব দূরে দাঁড়িয়ে শুধু দেখলেন। গুলি চালনায় সারা বাঙলায় প্রাণ দিলেন অন্তত ১৫০ জন নরনারী। এর মধ্যে ছাত্ররাও আছেন। বৃন্দেটে ও বেয়নেটে নিহত হয় দুই স্কুল ছাত্র মোহিত রায় (১৫) ও দেবব্রত (১৩)। গুলিতে মারা যায় ১১ বয়সের মেয়ে রত্না। আহত হন ১৮ বছরের ছাত্রী কুমারী আরতি বসু। ট্রটস্কিপন্থী ছাত্রীনেত্রী সুপ্রভা রায়ও এই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ধাক্কায় কেঁপে উঠলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ।[৭৬]

## নৌবাহিনীর বিদ্রোহের সমর্থনে ছাত্রসমাজ ( ১৮-২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ ) :

রসিদ আলি দিবসের বিদ্রোহী কলকাতা শান্ত হতে না হতেই বোম্বাই ও করাচীতে ফেটে পড়ল ভারতীয় নৌ-সেনাদের বিদ্রোহ। ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬, ভারতীয় নৌ-সেনারা সর্বত্র গোলামির পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক ছিঁড়ে, তার জায়গায় জাহাজে একত্রে উড়িয়ে দিয়েছিলেন কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা। মারাঠা সেনারা গুলিবর্ষণ করতে অস্বীকার করলেন বিদ্রোহী নৌ-সেনাদের উপর। ভারতীয় বৈমানিকরা ধর্মঘট করলেন, অস্বীকার করলেন নৌ-সেনাদের উপর বোমাবর্ষণ করতে। ছাত্র-সমাজ বিদ্রোহীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সত্পাল ডাং সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিলেন। শ্রমিক সংগঠনগুলিও নৌ-সেনাদের সমর্থন জানালো। বোম্বাইয়ের রাজপথে ব্রিটিশ মিলিটারীর গুলিতে শহীদ হলেন ছাত্র ফেডারেশনের নেত্রী কমিউনিস্ট কর্মী কমল ধোন্দে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনও সারা বাঙলায় ধর্মঘট, মিছিল মিটিঙের বন্যা বইয়ে দিল। ভিৎ কেঁপে উঠল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের।

## রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি ( ২৪ জুলাই, ১৯৪৬ ) :

কয়েকদিন পরেই ২৪ জুলাই সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে আবার উত্তাল হয়ে উঠলো বাঙলার ছাত্র-ছাত্রীরা। ছাত্র-ফেডারেশনের ডাকে ২৪ জুলাইয়ের হরতাল মিছিলে বাঙলা তথা কলকাতার ছাত্রসমাজ ফেটে পড়লো। জুলাইয়ের পিচগলা রাজপথ ধরে ছাত্রছাত্রীদের দুর্জয় মিছিল বিধানসভায় ঢুকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সুরাবর্দীর কাছ থেকে রাজবন্দীদের মুক্তির পাকা কথা আদায় করে নিল।

এইভাবে গোটা ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র কংগ্রেস ও ছাত্রলীগের নেতৃত্বপরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে ছাত্রীরা পূর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে লড়াকু ছাত্র-নেত্রী গীতা মুখার্জি বি. পি. এস. এফের অন্যতমা নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ আরো ব্যাপকতর হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে নিঃসন্দেহে ছাত্র কংগ্রেসেরও প্রধানা নেত্রী ছিলেন পূরবী মুখার্জি। ফলে প্রধান ধারার দুই স্রোতের নেতৃত্বে দু'জন ছাত্রীনেত্রী গীতা ও পূরবী আসীন হওয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্বে ছাত্রীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

## ডাক ও তার ধর্মঘটে ( ২৯ জুলাই, ১৯৪৬ ) ছাত্রীসমাজ :

অর্থনৈতিক দাবিতে আন্দোলন শুরু হলেও ডাক ও তার ধর্মঘট হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক চরম আঘাত। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কর্মীরা পর্যন্ত এই আন্দোলনে ভারতীয়দের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছিল আর ছাত্রফেডারেশনের কর্মীরা বিশেষ করে ছাত্রীরা এই আন্দোলনে গ্রহণ করেছিল এক গৌরবময় ভূমিকা। এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী তৎকালীন বি. পি. এস. এফের অন্যতমা নেত্রী গীতা মুখোপাধ্যায়ের নিজের ভাষাতেই তা বিবৃত হয়েছে :[৭৭]

"...তখনকার দিনের সবচাইতে স্মরণীয় ঘটনাগুলির মধ্যেকার একটি হ'ল ডাক-তার-টেলিফোন ধর্মঘট এবং তার সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের সংহতি। আমার যতটুকু মনে আছে তাতে মনে পড়ছে ডাক-তার-টেলিফোন কর্মীদের সর্বভারতীয় ইউনিয়ন সকল ছাত্র-সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাদের সংগ্রামের পাশে দাঁড়ানোর জন্য।

ধর্মঘটের আগের দিন সকল ছাত্র সংগঠন মিলে আমরা আলোচনা করলাম পরের দিনের কর্মসূচী নিয়ে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন এবং মুসলিম স্টুডেণ্টস লীগের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রফেডারেশনের

কর্মীরা ডালহৌসী স্কোয়ারের বিভিন্ন অঞ্চলে। বি. পি. এস. এফ অনুমোদিত গার্লস স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে আমরা—মেয়েরা অল্ ইণ্ডিয়া রেডিয়োর সামনে ভোর থেকেই জমায়েত হলাম। ভোরবেলা যখন কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন থেকেই বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে আমরা জড়ো ছিলাম। সার বেঁধে দরজার সামনে বসে রইলাম আমরা ছাত্রীরা। প্রথম প্রথম যে শিল্পীরা এসেছিলেন তাঁরা আমাদের অনুরোধ শুনে ফিরে গেলেন। আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অলকা মজুমদারের নাম (বর্তমানে বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা) আমার মনে আছে। একটু পরে বেলা হলে A I. R কর্তৃপক্ষ মতলব আঁটে, পুলিসের সহায়তায় গাড়িতে করে ভিতরে লোক আনার জন্য। আমরা তাদের এই মতলব জানতাম না। ছাত্রীরা যখন নিজের নিজের জায়গা ছেড়ে একটু গল্প করছেন দল বেঁধে এমন সময় হঠাৎ গার্স্টিন প্লেসের সরু গলিতে (তখন A. I R. অফিসের রাস্তা) একটি পুলিসের গাড়ি বিদ্যুৎবেগে ছুটে এল এবং দরজায় ধাক্কা মারল। আমরা দেখলাম গাড়িটর সামনের অংশ গেটটা পেরিয়ে যাচ্ছে, আমরা ছুটে গেলাম এবং গাড়ির চাকা ধরে পেছনের দিকে টানতে লাগলাম। পুলিসের গাড়ির ড্রাইভার গাড়ির সঙ্গে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে নিয়ে যেতে লাগল। চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে যাওয়ার হাত হতে কোন রকমে বেঁচে আমরা গেটের সামনে শুয়ে পড়লাম। এর পরই আবার একটা পুলিসের গাড়িকে ছুটে আসতে দেখলাম। গাড়িটা বার বার আমাদের ওপর (শুয়ে থাকা অবস্থায়) আঘাত করতে লাগল কিন্তু আমরা কেউ স্থানত্যাগ করিনি। ইতিমধ্যে সমস্ত ডালহৌসী অঞ্চলে রটে গেছে পুলিসের গাড়িসহ আমাদের ওপর আক্রমণের ঘটনা। অসংখ্য অফিস কর্মচারীরা ডালহৌসী স্কোয়ারের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জঙ্গী মিছিল করে আসতে লাগলেন আমাদের কাছে, ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের প্রতি সংহতি জানাতে। ঐক্যের প্রকৃত সেতুবন্ধন ঘটল সেদিন। ছাত্রদের সঙ্গে মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের হল সংগ্রামের রাখীবন্ধন। ডালহৌসীর বিভিন্ন অঞ্চলেই সেদিন এই একই জিনিসের প্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে।

"ঐদিন বেলা ৩টায় ছাত্র ফেডারেশনের অন্যান্য কর্মীরাও এসে জড়ো হলেন এবং আমরা মিছিল করে চললাম ময়দানে। সেদিনকার সমাবেশ সেই আমলের অন্যতম বৃহৎ সমাবেশ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। সেই সমাবেশে প্রধানতঃ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই বক্তা হিসাবে ভাষণ দেন।

"কিন্তু আমরা ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা যেহেতু তাঁদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম সেই কারণে, আমাদের ডাক পড়ল বক্তৃতা দানের জন্য। আমাকে বলবার জন্য উঠতে হল মঞ্চে। এর আগে এবং পরে অনেক বৃহৎ

সমাবেশে বক্তৃতা করেছি কন্তু সেদিনের স্মৃতি ভুলবার নয়। তরুণদের অভিনন্দন জানানোর জন্য সেদিন যে আয়োজন করেছিল তারা, সেকথা মনে পড়লে আজও গর্বে বুক ভরে ওঠে।"

আজকের কমিউনিস্ট নেত্রী রেণু চক্রবর্তী তাঁর স্মৃতিচারণে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:[৭৮] "২৯ জুলাই—জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বৃহত্তম সাধারণ হরতালের দিন। কলকাতার জীবন একেবারে থেমে যায়।

"সেদিন আকাশবাণী ভবনে পিকেটিং করতে যায় ছাত্রীরা। সহ-স্টেশন ডিরেক্টর প্রভাত মুখার্জি নির্লজ্জভাবে বলেন, 'দেশ টেশ জানি না, আমার কাছে সরকারের হুকুম বড়।' তিনি এবং তাঁর সাকরেদরা মেয়ে পিকেটারদের লক্ষ্য করে কুরুচিপূর্ণ, অশ্লীল বিদ্রূপ করেন। ষ্টেশন ডিরেক্টর চীবু আসেন। একটি মেয়েকে ধাক্কা দিয়ে চলে যান তিনি। পুলিশ ডাকা হয়। তারা পিকেটারদের মধ্য দিয়েই জীপ চালাতে যায়। মেয়েরা মাটিতে শুয়ে পড়ে। এ দেখে পুলিশ একটু ইতস্তত: করে। পার্বতী নামে একটি পিকেটারের হাত মাড়িয়ে চলে যায় এক সার্জেন্ট। সঙ্গে সঙ্গেই সার্জেন্টের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অলকা মজুমদার, গীতামিত্র, সুপর্ণা রায় এবং গীতা মুখার্জি, এরা সবাই ছাত্রীদের নেত্রী। গীতা মিত্র কলার ছিঁড়ে নেয় সার্জেন্ট সাহেবের। ধন্য সাহস।"

স্বনামধন্যা মহিলা নেত্রী মণিকুন্তলা সেন লিখেছেন তাঁর 'সেদিনের কথা'য়:[৭৯] "দিনটা ছিল '৪৬ সনের ২৯ জুলাই। শ্রমিক ধর্মঘট যে সরকারের প্রায় সমস্ত যন্ত্রই বিকল করে দিতে পারে পার্টি-জীবনে এই প্রথম সেটা প্রত্যক্ষ করলাম। কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেল। ধর্মঘট ছিল মূলত ডাক-তার এবং টেলিফোন অফিসের কর্মচারীদের। কিন্তু সমর্থনে বেরিয়ে এলো স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী সহ রাইটার্স বিল্ডিংস-এর সমস্ত সরকারী কর্মচারী।...ইংরেজদের প্রচারকেন্দ্র রেডিও স্টেশন আগলে বসেছিল কিছু সাহেব ও পুলিশ বাহিনী। কারণ, রেডিও স্টেশনে তারা ধর্মঘট করতে দেবে না। কিন্তু কলকাতার সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীরা তাদের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। সাহেবদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের হাতাহাতি হয়, মাথা ফাটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটে অচল হয় রেডিও স্টেশন। রেডিও স্টেশনে ইংরেজ কর্তাদের মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে দেখে কলকাতার খ্যাতনামা ব্যক্তিরা ধিক্কার জানিয়েছিলেন।...

"দুপুরে ময়দান থেকে বেরুল মিছিল। বিশাল মিছিল। সমস্ত কারখানার শ্রমিক, অফিস দপ্তরের কর্মচারী, ডাক ও তার শ্রমিক-কর্মচারী, টেলিফোনের মেয়ে, এমন কি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে, বিশাল সংখ্যায় ছাত্র-ছাত্রী সেই মিছিলে সামিল হলো।"

এইভাবে সেই সময় শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন-সংগ্রামের পাশে দৃঢ়তার সঙ্গে এসে দাঁড়াতো ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা। বিশেষ করে গীতা মুখার্জি'র মতো জঙ্গী ছাত্র-নেত্রী বি. পি. এস. এফের সাধারণ সম্পাদক হবার ফলে ছাত্রীদের একটা বড় অংশ এই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে কার্যত প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই সময় ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের কর্মীদের ধর্মঘটে ছাত্র সমাজের ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গীতা মুখার্জি'র ভাষায়ঃ "ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের কর্মীদের ধর্মঘট ভাঙার উদ্দেশ্যে তখন ব্লাক মারিয়া (পুলিশের প্রিজন ভ্যান) গাড়িতে করে ভাড়াটে লোক আনা হচ্ছিল। এইরকম একদিন গাড়িটা যখন বিপুল বেগে ঢুকল তখন আমি এবং আর একজন ঝাঁপিয়ে পড়লাম পিছন দিককার ফুটবোর্ডের ওপর। পুলিশের গাড়ি না থেমে মুখ ফিরিয়ে ছুটতে থাকে ডালহৌসীর রাজপথ দিয়ে হু হু করে। ব্যাংকের কর্মীরা আমাকে ঐ অবস্থায় ঝুলতে দেখে ট্যাক্সি করে ভ্যানের পিছনে ছুটতে থাকে। ট্যাক্সিকে পিছনে নিয়ে ভ্যান উপস্থিত হলো লালবাজারে। আমাকে নিয়ে ফিরে এলেন ব্যাংকের কর্মীরা। অবশ্য এর পরদিন থেকে ব্যাংকে আর ভাড়াটে লোক আনা হয়নি।"[৮০]

## কলকাতার উইমেন্স কলেজের ছাত্রী-আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭):

ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্বে ছাত্রীদের সমানাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কয়েকটি সংগ্রাম সে সময়ে হয়েছিল। তার মধ্যে প্রধান আন্দোলনটি ছিল কলকাতার উইমেন্স কলেজে। গীতা মুখার্জি'র দুটি সাক্ষাৎকার থেকে এবিষয়ে কিছু তথ্য জানা যায়। উইমেন্স কলেজের নিয়ম ছিল যে ছাত্রীদের বেরোতে হলে দারোয়ানের কাছে শ্লিপ দিয়ে যেতে হতো এবং দারোয়ান যদি অনুমতি দিতো, তবেই তারা বেরোতে পারতো। তা না হলে শাস্তি পেতে হতো। এর বিরুদ্ধে এবং ছাত্র-ইউনিয়ন গঠনের দাবিতে উইমেন্স কলেজের ছাত্রীরা আন্দোলন শুরু করলে ছাত্রীরা কলেজে ধর্মঘট করলেন। এরপর অনির্দিষ্ট কালের জন্য কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হলে, ছাত্রীরা কলেজ কমিটির প্রেসিডেন্টের বাড়ির তলায় অনশন চালালেন দীর্ঘদিন ধরে। ছাত্রীদের আন্দোলনের কাছে সেদিন নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ, ফিরিয়ে নিয়েছিলেন সমস্ত বিতাড়িত ছাত্রীকে (১৯৪৭)।[৮১]

## সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনাম দিবস (২১ জানুয়ারি, ১৯৪৭):

ফরাসী ঔপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের পাশে এসে দাঁড়ানোকেও বাঙলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সঠিক

ভূমিকা বলেই মনে করেছিল। আর সেইকারণে ১৯৪৭ সালের ২১ জানুয়ারি 'ভিয়েতনাম দিবস' পালন করতে গিয়ে কলকাতার রাস্তার কালো অ্যাসফল্ট ভেসেছিল ছাত্র-ছাত্রীর উষ্ণ শোনিতে। সারা ভারত জুড়েই সেসময়ে ভিয়েতনামের পক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, এ. আই. টি. ইউ. সি. এবং এ. আই. এস. এফ প্রচার সংগঠিত করছিল। বাঙলায় বি. পি. এস. এফ ২১ জানুয়ারি ভিয়েতনাম দিবস পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়। শেষমুহূর্তে এগিয়ে আসে ছাত্র-কংগ্রেস। সমর্থন জানায় মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ। ভিয়েতনাম দিবসের প্রতি সমর্থন জানায় শরৎচন্দ্র বসুও। কলকাতায় 'ভিয়েতনাম দিবস' উপলক্ষে ঘোষিত কর্মসূচীর মধ্যে ছিল স্কুল, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট এবং দুপুর সাড়ে বারোটায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে মিছিল করে পার্ক স্ট্রীটে গিয়ে ফরাসী কনসুলেটে একটি স্মারকলিপি জমা দেবে ছাত্রপ্রতিনিধিরা। কিন্তু বাঙলার গভর্নর ব্যারোজ কলকাতায় ১৪৪ ধারা জারী করে রেখেছিলেন। বাঙলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী মুসলিম লীগের সুরাবর্দীও এবিষয়ে উচ্চবাচ্য করেননি। পুলিশী সন্ত্রাস শুরু হলো। শ্যামবাজার, হাতিবাগান, ভবানীপুরে জগুবাবুর বাজার, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, মির্জাপুর স্ট্রিট, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক প্রভৃতি কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশ ছাত্রমিছিলের উপর লাঠি চালায়। রেহাই পায় না স্কুলছাত্র এবং ছাত্রীরাও। গ্রেপ্তার হন অনেক ছাত্রনেতা।

তবুও কলেজ স্কোয়ার, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ভরে যায় ছাত্র-ছাত্রীতে। শ্লোগান উঠতে থাকে মুহুর্মুহু। সভা শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। সভার শুরুর দিকে স্মরণ করা হয় 'লেনিন দিবস'। পরে সভা চলে 'ভিয়েতনাম দিবস' উপলক্ষে। সভাপতিত্ব করেন প্রতিভাকান্ত মৈত্র। ভাষণ দেন— নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নন্দ মিশ্র, ননী ভট্টাচার্য, নন্দলাল বসু, মনীষা বসু, রমেন দে, নৃপেন ব্যানার্জি, চিত্ত চৌধুরী, মনোরঞ্জন দত্ত প্রমুখ।

শেষ বিকালে কলেজ স্কোয়ারের পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে ওঠে। সারা দিন ধরেই উত্তেজনা অল্প অল্প করে বাড়ে। কলেজ স্কোয়ারে সব মিলিয়ে তখন হাজার পঞ্চাশেক ছাত্র-ছাত্রী। সাতটার পরে বিনা প্ররোচনায় পুলিশ গুলি চালাতে শুরু করে। সঙ্গে চলে কাঁদানে গ্যাস ও লাঠি। সেদিনই সেনেট হলের সিঁড়িতে পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারান সুখেন্দু বিকাশ নাথ। বয়স আঠারো। স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র। পরে হাসপাতালে মারা যান ধীররঞ্জন সেন (২০)। দুশোরও বেশি ছাত্রছাত্রী সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আহত হন।[৮২]

২১ জানুয়ারি ধৃতদের তালিকায় ১৪ জন ছাত্র নেত্রীরও নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন—বেলা সেন, ভক্তি দত্ত, বকুল ধর চৌধুরী, কল্যানী সেন

উইমেন্স কলেজ) অঞ্জনা গুহ, অনিমা ঘোষ, ভারতী মিত্র, সুলেখা সান্যাল (স্কটিশচার্চ কলেজ), নীলমণি দত্ত, নির্মলা চৌধুরী, মাধবিকা দত্ত, (লা মিত্র, অশোকা ধর (বেথুন কলেজ), অপর্ণা মুখার্জি (আশুতোষ কলেজ)।[৮৩]

পরদিন ২২ জানুয়ারি কলকাতায় হরতাল পালন করা হয়। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত সেদিনের সভায় নন্দলাল বসু, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ ব্যানার্জি (সবাই এম. এল. এ) ও ভবানী সেনের সঙ্গে ভাষণ দেন চন্ত চৌধুরী (অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস কংগ্রেস), সুনীল সেনগুপ্ত (স্টুডেন্টস ফেডারেশন), বিশ্বনাথ মুখার্জি (স্টুডেন্টস কংগ্রেস), রমেন দে (ইন্ডিয়ান সোশ্যালিস্ট স্টুডেন্টস ব্যুরো), কাশীকান্ত মৈত্র (ফরোয়ার্ড ব্লক স্টুডেন্টস ব্যুরো), অলকা মজুমদার (গার্ল স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন) মনোজ দত্ত মজুমদার (স্টুডেন্টস্ কংগ্রেস), অপরাজিত মুখার্জি (ছাত্র কল্যান সমিতি), সলিল ঘোষ (মেডিকেল স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন) প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ। সেদিন সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট ডাকা হয়। লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের মুসলিম ছাত্রীরাও ধর্মঘটে যোগ দেয়।

কলকাতার সঙ্গে বাঙলার বিভিন্ন জেলাতেও ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ আন্দোলন ছড়িয়ে পরে। ময়মনসিংহে প্রশাসন চরম দমননীতির আশ্রয় নেয়। প্রায় আটহাজার ছাত্র ছাত্রী আইন অমান্য করে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অফিস ঘিরে ফেলে। পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় সিটি স্কুলের ছাত্র অমলেন্দু ঘোষ এবং গুরুতর ভাবে আহত হয় বি. এ ক্লাশের ছাত্রী অনিতা ঘোষ সহ বহু ছাত্র-ছাত্রী। অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে পুলিশ নির্বিচারে গ্রেপ্তার করে। ক্ষিপ্ত জনতা সরকারী বাসভবনগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে। গোটা ময়মনসিংহ অশান্ত হয়ে ওঠে। অন্যান্য জেলাতেও বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। বস্তুত, ১৯৪৭-এর জানুয়ারি মাসের ভিয়েতনাম দিবসেই বোঝা গেল বাঙলার ছাত্রসমাজের আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ কত ব্যাপক ও গভীর। ছাত্রীসমাজও নিঃসন্দেহে ছিল এর শরিক।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের রংপুর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। রংপুর সম্মেলন থেকেই ছাত্র ফেডারেশন প্রবল শক্তিশালী সংগঠন রূপে আত্মপ্রকাশ করল। বি. পি. এস. এফ-এর সভাপতি নির্বাচিত হলেন বর্তমানের খ্যাতিমান অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় এবং সাধারণ সম্পাদক জঙ্গী ছাত্র-নেত্রী গীতা মুখোপাধ্যায়। বলা যায় ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের উত্তাল ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রী সমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ গীতা মুখার্জির নেতৃত্বে আসীন হবার মাধ্যমেই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেল।

## তেভাগা কৃষক সংগ্রামের সহযোগী শক্তি ছাত্র-ফেডারেশন:

স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের পাশাপাশি কৃষক জনতার সামন্তবাদ বিরোধী তেভাগার লড়াই শুরু হয়েছিল ৪৬-৪৭ সালে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণবাংলা জুড়ে। ইংরেজের পুলিশ জোতদারদের হয়ে চাষীদের আক্রমণ করছিল। ছাত্র-ফেডারেশন চাষীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য গ্রামে গ্রামে স্বেচ্ছাসেবীদল পাঠালো। দিনাজপুরের চিরির বন্দরে সাঁওতাল ভাগচাষী শিবরাম ও মুসলমান ভাগচাষী সমীরুদ্দিন নিহত হবার পর তার প্রতিবাদে ও তেভাগা কায়েম হবেই একথা ঘোষণা করার জন্য '৪৭ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবসে দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁওয়ে এক বিরাট সমাবেশ হয়েছিল। ছাত্রফেডারেশনের তরফে সম্পাদিকা গীতা মুখোপাধ্যায় নিজে সেখানে বক্তৃতা করেছিলেন। এছাড়া তৎকালীন ছাত্রনেত্রী বানী দাশগুপ্তা (তখন মিত্র), বীণা গুহ (তখন সেন) প্রমুখও তখন ছাত্রফেডারেশনের কর্মী রূপেই এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন।

## দাঙ্গা ও দেশভাগ: স্বাধীনতার শেষলগ্নে বাঙলার ছাত্রীরা

১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের দাঙ্গা হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকেই আপ্লুত করে ফেললেও, কমিউনিস্টদের কিন্তু তা পারে নি। লাল ঝাণ্ডাবাহী শ্রমিকশ্রেণী বিশেষ করে ট্রাম শ্রমিকরা সেদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রুখতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং এক্ষেত্রে তারা পাশে পেয়েছিলেন বাঙলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজ বিশেষ করে ছাত্র-ফেডারেশনকে। প্রথম ধাক্কাতে খানিকটা হতোদ্যম হয়ে পড়লেও, সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলনও রুখে দাঁড়াল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর হয়ে উঠলো হিন্দু-মুসলমান সম্ভাবের প্রাণকেন্দ্র। ছাত্র-ছাত্রীরা বার বার সভা ও মিছিল করে অব্যাহত রাখল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান। এই অভিমত তৎকালীন ছাত্রনেতা বর্তমানের কমিউনিস্ট নেতা অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের।[৮৫]

ছেচল্লিশের ১৬ আগস্টের হতভম্ব ভাব দ্রুত দূর ক'রে কলকাতা তথা বাঙলার জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী ছাত্র-সংগঠনগুলি গান্ধীজীর আহ্বানে শান্তি বাহিনী গঠন করতে শুরু করেন জেলায় জেলায় এবং বিভিন্ন শহরে। কলকাতার বুকে ১৯৪৭ সালেও মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চক্রান্ত চলতে থাকে। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে গান্ধীজী কলকাতায় আসেন—সোদপুর আশ্রমে যান, বেলেঘাটায় থাকেন এবং পরে নোয়াখালি যান। এইসময় গান্ধীজী সর্বদা শান্তিবাহিনীকে সুসংগঠিত রাখার পরামর্শ দেন। কলকাতার ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য গণ-সংগঠনের 'শান্তি-

বাহিনী' ১৯৪৭-এর অক্টোবর মাস পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। বিশেষ করে প্রধানতঃ কমিউনিস্ট পার্টি এবং মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগেই গড়ে উঠেছিল 'মহিলা শান্তি বাহিনী' বা 'ঝাঁসি রাণী ব্রিগেডে'র মত সর্ব-দলীয় দাঙ্গা প্রতিরোধক গণবাহিনীর। ছাত্রীরা ব্যাপক ভাবে এই বাহিনী গুলিতে অংশগ্রহণ করতেন। কমিউনিস্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেস তরুণীদের যৌথ বাহিনী 'ঝাঁসি রাণী ব্রিগেড'-এর স্বেচ্ছাসেবিকারা ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বরে বেশ কয়েকবার শান্তি মিছিল বের করে।৮৬

১৯৪৬ এর ৩রা আগষ্ট বেলা ২-২০ মিনিটে বেলেঘাটায় গান্ধীজীর শিবিরে তার উপস্থিতিতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিসভা বসল। এর পরেই নিম্ন-লিখিত সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হল কেন্দ্রীয় শান্তিসেনা কমিটি। এতে ছিল ঃ কংগ্রেস সেবাদল, জাতীয় রক্ষীবাহিনী, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড, আই. এন. এ, বি-পি-টি-ইউ-সি, বি-পি-এন-টি-ইউ-সি, সারা ভারত মহিলা কংগ্রেস, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, মুসলিম মহিলা সমিতি, আজাদ হিন্দ দল, রেড গার্ড, নি.ব. ছাত্র কংগ্রেস, ব. প্রাঃ ছাত্র ফেডারেশন, বি. পি. ছাত্র কংগ্রেস, নি.ব মুসলিম ছাত্র লীগ, নি.ব ছাত্রী সংঘ, সোস্যালিস্ট ভলান্টিয়ার কোর, ছাত্র সংহতি, আর. এস. পি. ভল্যান্টিয়ার কোর, বেঙ্গল ইয়ুথলীগ, কলিকাতা মুসলিম ছাত্র লীগ ও অন্যান্যরা। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে মহিলা ও ছাত্রী সংগঠনগুলিরও এক্ষেত্রে ছিল অগ্রণী ভূমিকা।

একইভাবে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার অঙ্গরূপে দেশবিভাগ বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বভাবতই ছাত্রসমাজের আবেগ ও ক্ষোভ পরিচালিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র বসু ও মুসলিম লীগ সম্পাদক আবুল হাসেম সেই সময়ে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বঙ্গ গঠনের জন্য আলাপ আলোচনা চালাচ্ছিলেন। এই সময়ে পূর্ববঙ্গের ছাত্রসমাজের মানসিকতাও যে ঐক্যবদ্ধ বঙ্গের পক্ষে ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় 'বাংলার যুব সমাজের প্রতি ঢাকার ছাত্র নেতাদের আহ্বান' শীর্ষক আবেদনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা বর্ষণ করা হয় এবং পূর্ববঙ্গের দেড়কোটি জাতীয়তাকাঙ্খী হিন্দু-মুসলিম নরনারীকে স্বকীয় সত্ত্বা নিয়ে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে রাখার দাবিই জানানো হয়। এই আবেদন লিপিতে স্বাক্ষর করেছিলেন যথাক্রমে ঃ ৮৭

সুধীর দত্ত, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা স্টুডেন্টস্ কংগ্রেস। সুবোধ রক্ষিত, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা স্টুডেন্টস্ ব্যুরো। দীপ্তি চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদিকা, কামারুন্নেসা গার্লস কলেজ স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন। লীলা সেন, সাধারণ সম্পাদিকা, ইডেন কলেজ ছাত্রী সংঘ। সন্দেহ নেই যে ছাত্রী-সমাজও সেদিন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

**উপসংহার কিংবা একটি বিশ্লেষণ :**

আমাদের দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে মেয়েদের ভূমিকা ঐতিহাসিকদের রচনায় যতই অবহেলিত হোক না কেন ইতিহাসের বিচারে সে ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো উপায়ই নেই। এক্ষেত্রে যে বাঙলার শিক্ষিতা মহিলা ও ছাত্রীরা একটি নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাও কোনো মতেই অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য স্কুল-কলেজের তথাকথিত ডিগ্রীধারী না হলেও গ্রামগঞ্জ-নগর-প্রান্তরের শত শত মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও কৃষক-শ্রমিক পরিবারের শ্রমজীবী নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ধারায় নানা সময়ে যুক্ত হয়ে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন। অবশ্য ক'জনাই বা তাঁদের খোঁজ রাখেন।

এই নিবন্ধের ভূমিকাংশে পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বাঙলার ছাত্রী-সমাজ ছিলেন সামগ্রিক ভাবে সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলনেরই অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। বৃহত্তর ছাত্রী-অংশকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে হয়তো ছাত্রনেতৃত্বকে 'ছাত্রীসংঘ' ইত্যাদি সংগঠন গড়ার প্রয়াস কৌশলগত কারণেই নিতে হয়েছিল, কিন্তু আন্দোলন সংগ্রামের বিভিন্ন ধারায় ( কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট যাই হোক না কেন) এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্রীরাও সমাজের একটি রাজনীতি-সচেতন অংশ রূপেই (সংখ্যায় কম হলেও) সামিল হয়েছিলেন বাঙলার ছাত্র-আন্দোলনের উত্তাল স্রোতধারায়। হয়তো প্রথমে তা ছিল অসংগঠিত। ব্যক্তিনির্ভর ও কিছুটা রোম্যান্টিক চেতনা সঞ্জাত প্রতিক্রিয়া। কিন্তু ১৯৩৬ সালের পর থেকে সমাজের অন্যান্য অংশের মতো ছাত্রসমাজও খুঁজে পেয়েছিল তার পরিচিতি বা Identity। খুঁজে পেয়েছিল নিজের স্থির লক্ষ্য সাধনের উপায়। হয় তো পথ ছিল বিভিন্ন কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল একটাই—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা। হয়তো ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ছিল নানা রূপে, কিন্তু স্বপ্ন ছিল একটাই—স্বাধীনতা।

ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্রীরা যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন, তেমনি ছিলেন মহিলা আন্দোলনের সঙ্গেও। সরোজিনী নাইডু প্রমুখ নেত্রীর নেতৃত্বে 'সারা ভারত মহিলা সমিতি' (A I W C) গঠিত হয় চল্লিশের দশকের সূচনায়। দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মহিলাই A I W C-র সদস্য হন। ছাত্রীরাই ছিলেন মহিলা আন্দোলনের প্রধান চালিকা শক্তি। অন্তত সূচনা পর্বে। কমিউনিস্ট নারীরা A I W C-র সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও তারা এই সংগঠনের উচ্চবর্গীয় ও অভিজাত চরিত্রটিকে পরিবর্তনের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। জনযুদ্ধেরও যুগে অবশ্য কমিউনিস্ট মহিলারা ব্যাপক অংশের নারী-সমাজের গণসংগঠন রূপে কাজ করতে থাকেন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র মধ্যে। শ্রমজীবী মহিলারাও তাতে সামিল হয়েছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্রী সদস্যারাই সেই সময়ে ( জনযুদ্ধের যুগে )

অন্তত ছিলো উক্ত সমিতির প্রধান নেতৃত্ব দানকারী চালিকা শক্তি। মণিকুন্তলা সেনও এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ ..."এই সব ছাত্রী নেত্রীরাই তো বিভিন্ন প্রদেশে পরে মহিলা সমিতির সংগঠিকা ও নেত্রী। শুধু তাই নয়, অনেক সময়ে ছাত্রী অবস্থাতেই এরা মহিলা সমিতি গঠন করতে শুরু করে দিয়েছিল। কারণ শহরে-গ্রামে এই মেয়েরাই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। বলতে গেলে—এরাই নারী-সমাজের পুরবর্তিনী। বাঙলা দেশে তো এই নিয়ে টানাটানি লেগে যেত। একটি কর্মী মেয়ে পেলে সে 'ছাত্রী' করবে না 'মহিলা' করবে—এ একটা ভয়ানক দ্বন্দ্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। শেষ পর্যন্ত ওদের একটু বয়স বাড়লে দুটোই করতে হতো।"৮৮ শুধু মহিলা ফ্রন্টেই নয়, কমিউনিস্ট ছাত্রীদের শ্রমিক ও কৃষকফ্রন্ট উভয়ক্ষেত্রেই যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়েই কাজ করতে হতো। ছাত্রীদেরও তাই। এটাই ছিল সেই সময়ে কমিউনিজম প্রচারের প্রথম যুগে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য পাঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ সহ অবশিষ্ট ভারতেও ছিল দৃশ্যমান।

বিশের দশকে এবং ত্রিশের দশকের সূচনায় যে সকল ছাত্রী দেশমাতৃকার শৃংখলমোচনের স্বপ্ন বুকে নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামে তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন সম্পূর্ণ মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত এমনকি অভিজাত, ধনী পরিবারেরই সন্তান। ঢাকার লীলা নাগ বা কুমিল্লার শান্তি-সুনীতি কিংবা শ্রীহট্টের সুজাতা দত্ত এরকম আরো অনেকেই (দীপালী সংঘেরও অনেক সদস্য) ছিলেন শ্রেণীগত অবস্থানে উচ্চবর্গীয় বা পেটিবুর্জোয়া রোম্যান্টিক ভাবধারায় আচ্ছন্ন। তাই প্রথম দিকে সংগঠিত ছাত্র বা নারী আন্দোলনের প্রবাহে সামিল না হয়ে তাঁরা রিভলবার হাতে ছুটে যেতেন বারবারই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দেশের স্বাধীনতা আনতে। এই বীরাঙ্গনাদের দেশপ্রেমকে এতটুকু অশ্রদ্ধা না জানিয়েই এটুকু সমালোচনা করা যায়। ইতিহাস কি বারবারই ফিরে আসে। সত্তরের দুর্ধর্ষ নকশাল আন্দোলনের মেয়েরা ওই একই ভুল করেছিলেন বলেই এই আত্মসমালোচনার অবতারণা।

১৯৩৬ সালে সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলনের (এ. আই. এস. এফ-এর প্রতিক্রিয়া) বাস্তব ভিত্তি স্থাপিত হবার পর দেখা গেল স্বাধীনতা সংগ্রাম বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী-আন্দোলনে আর শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত বা অভিজাত পরিবার নয়, নিম্নবিত্ত পরিবার থেকেও ছাত্রী-কর্মীরা দলে দলে সামিল হচ্ছেন। আর যুদ্ধ ও মন্বন্তরের পরে ছাত্র আন্দোলনের স্রোতধারা প্রবাহিত হয়ে গেল গ্রাম-গঞ্জ-মহকুমা ও শিল্পাঞ্চলে। এবার কৃষক ও শ্রমিক পরিবারের এমনকি প্রায় সর্বহারা পরিবারের থেকেও মেয়েরা দলে দলে সামিল হলেন সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলনের মূলপ্রবাহে। এতে কংগ্রেস পরিচালিত ছাত্র-আন্দোলন

অপেক্ষা বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলিই পরিপুষ্ট হলো। তারা লাভ করলো শ্রেণী ও রাজনীতি সচেতন আপোষহীন জঙ্গী একদল ছাত্রী-কর্মী (ছাত্রদের ক্ষেত্রেও একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান)। তাই দেখা যায় চল্লিশের দশকে 'ছাত্রকংগ্রেস' 'ছাত্রলীগ' বা হিন্দু-মহাসভার অনুগামী ছাত্র সংগঠনের অস্তিত্ব থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রধান শক্তি রূপে গ্রহণীয় ছিল—বি. পি. এস. এফ বা 'মির্জাপুর ছাত্র-ফেডারেশনের' মতো বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলি। এই সঙ্গে লক্ষ্যণীয় ছিল যে কল্পনা দত্ত (যোশী), সুজাতা দত্ত, কমলা মুখার্জি'র মতো বহু জাতীয়তাবাদী ছাত্রনেত্রীই ব্যক্তিগত সন্ত্রাসে আস্থা পরিত্যাগ করে গ্রহণ করে-ছিলেন গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন বা কমিউনিজমের পথ। নারী আন্দোলনের অসংখ্য কর্মী কমিউনিস্ট পার্টিতে পরবর্তীকালে সামিল হয়েছিলেন এ'দেরই প্রেরণায়, সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করে গণআন্দোলন গড়ার শপথ নিয়ে। এই সকল বীরাঙ্গনাদের অংশগ্রহণে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত নারী ও ছাত্র আন্দোলন তখন নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের কমিউনিস্ট পার্টির একটি দলিলে তৎকালীন সমৃদ্ধ মহিলা ও ছাত্রফ্রন্টের যে চিত্র পাওয়া যায় তা পরপৃষ্ঠায় ছকে দেখানো হ'ল।[৮৯]

পরপৃষ্ঠার তথ্য থেকেই জানা যাচ্ছে যে ১৯৪৩ সালের ১লা মে পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র (ছাত্রীসংঘ সহ) ও মহিলাফ্রন্টে অগ্রগতির হার ছিল যথেষ্ট। বিশেষ করে ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে স্মরণে রেখেই এই অগ্রগতির মূল্যায়ন করা উচিত। যে বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হল:

১. গোটা বাঙলায় যেখানে ছাত্রফেডারেশনের সদস্যসংখ্যা ২০ হাজার ১০৫ জন; সেখানে গার্লস স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন এর সদস্যা সংখ্যা কিন্তু (৩ হাজার ৫০ জন) মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। পরবর্তীকালে তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল।

২. মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, যার মধ্যে অসংখ্য ছাত্রীকর্মী কাজ করতেন তার সদস্য সংখ্যাও সেসময় (২৩ হাজার ৪৮৫ জন) মোটেই অগ্রাহ্য করার মতো ছিল না। মাত্র ১ বছরের মধ্যে এই সংখ্যা হয়েছিল ৪৩ হাজার ৫০০ (বরিশাল সম্মেলনের পূর্বে, ১৯৪৪)।

৩. ১৯৪৩-এর ১লা মে তে পার্টির বাঙলা কমিটির সদস্য সংখ্যা যখন প্রায় ৪২০০ জন; তখন মহিলাফ্রন্টে প্রায় ৪০০ জন সদস্য (১০ শতাংশ) এবং ছাত্রফ্রন্টের ৫৫০ জন সদস্য (যার মধ্যে অনেক ছাত্রী পার্টি সদস্যাও ছিলেন)—এই সংখ্যাটি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। নিঃসন্দেহে সাংগঠনিক

## কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা ও ছাত্রফ্রন্টের অফিসিয়াল রিপোর্ট
## ( অবিভক্ত বাংলা—১ মে, ১৯৪৩ পর্যন্ত )

### মহিলা ফ্রন্ট

| বাঙলা কমিটির অন্তর্গত বিভিন্ন জেলা | পার্টি সদস্যা | মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যা সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| কলকাতা | ৬৭ | ৪০০০ | ● স্বেচ্ছাসেবিকা—১০৮, ● ম. আ. রক্ষা সমিতির শাখা—১২৫ ● মহিলাদের দ্বারা 'জনযুদ্ধ' বিক্রয়—১২৫ ● 'পিপলস্ ওয়ার' বিক্রয়—৩৫৪ ● গার্ল স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যা—৩,০৫০ জন। |
| চট্টগ্রাম | ৪৫ | ৪১৬০ | |
| রংপুর | ১৯ | ১৩৮৪ | |
| ময়মনসিংহ | ২০ | ২০৭৫ | |
| ঢাকা | ৩০ | ২২৭৫ | |
| বরিশাল | ৩৮ | ১৪৯১ | |
| দিনাজপুর | ১৬ | ৬০০ | |
| জলপাইগুড়ি | ১৪ | ৫১০ | |
| ত্রিপুরা | — | — | |
| হুগলী | ৯ | ৬০৬ | |
| ২৪ পরগনা | ১ | — | |
| হাওড়া | ২ | ৯৫৪ | |
| নদীয়া | ২ | ১০০ | |
| বর্ধমান | ৩ | ২০০ | |
| যশোর | ২ | ৫০ | |
| খুলনা | ৭ | ৫০৫ | |
| রাজশাহী | ২৫ | ৮৩০ | |
| ফরিদপুর | ৮ | ৮১২ | |
| নোয়াখালি | — | ১১০ | |
| পাবনা | ২৮ | ৭০০ | |
| মুর্শিদাবাদ | — | — | |
| বীরভূম | ১০ | — | |
| বাঁকুড়া | ১১ | ১০০০ | |
| মেদিনীপুর | ৩ | ২০০ | |
| মালদা | ৪ | ১৬০ | |
| আসাম উপত্যকা | — | — | |
| সুরমা উপত্যকা | ২০ | ৭০০ | |
| মোট—( ২৭ টি ) | ৩১৪ | ২৩৪৮৫ | |

## ছাত্র ফ্রন্ট

| বাঙলা কমিটির অন্তর্গত বিভিন্ন জেলা | পার্টি সদস্য | ছাত্র ফেডারেশনের সদস্যসংখ্যা | শাখার সংখ্যা | অন্যান্য মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| কলকাতা | ১৬৮ | ২৫০০ | ১৫ | ● ছাত্রফ্রন্টে সর্বক্ষণের পার্টি কর্মী—১৭ জন কর্মী (১৬ টি জেলায়) ● কিশোর বাহিনীর সদস্য সংখ্যা—২,৫০০ ● 'দি স্টুডেন্ট' বিক্রয় (১ এপ্রিল পর্যন্ত)—১৮১৭ ● ঐ, মে দিবস ৪০ গ্রাহক সংখ্যা—২২২ |
| চট্টগ্রাম | ৪৫ | ২২৭২ | ৪২ | |
| রংপুর | ৩৯ | ১০০০ | ৫ | |
| ময়মনসিংহ | ২৯ | ১০০০ | ৩৫ | |
| ঢাকা | ৪৭ | ১২০০ | ২৫ | |
| বরিশাল | ২৪ | ৮৫৯ | ৮ | |
| দিনাজপুর | ২১ | ৩৭৫ | ৪ | |
| জলপাইগুড়ি | ১৬ | ৪০৫ | ৪ | |
| ত্রিপুরা | — | ৪০০ | — | |
| হুগলী | ২৩ | ৬৪৪ | ৬ | |
| ২৪ পরগণা | ১১ | ৪৩০ | ৩ | |
| হাওড়া | ১১ | ৭৫০ | ৭ | |
| নদীয়া | ১৯ | ৮১০ | ১৫ | |
| বর্ধমান | ১১ | ৭০০ | ১৪ | |
| যশোর | ১৬ | ৮০৫ | ২৫ | |
| খুলনা | ১০ | ৭৫০ | ২৫ | |
| রাজশাহী | ৩৯ | ৬৬১ | ৭ | |
| ফরিদপুর | ১৭ | ৬৯৫ | ২০ | |
| নোয়াখালি | ৪ | ৪০০ | ৭ | |
| পাবনা | ২৯ | ৪৬৫ | ৯ | |
| মুর্শিদাবাদ | ১৩ | ২৮০ | ১১ | |
| বীরভূম | ১২ | ৩০০ | ৫ | |
| বাঁকুড়া | ১৬ | ৬৫০ | ৮ | |
| মেদিনীপুর | — | ১০০ | — | |
| মালদা | ৩ | ২০০ | ৩ | |
| আসাম উপত্যকা | ২৭ | ১৩১২ | ৭ | |
| সুরমা উপত্যকা | — | ৯৫২* | ১০ | |
| মোট—( ২৭টি ) | ৬৪৫ | ২১,১৩৫ | ৩২০ | |

* এর সঙ্গে যুক্ত হবে গার্লস্ স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের ৩,০৫০ জন সদস্যা সংখ্যা।

ক্ষেত্রে ছাত্র ও মহিলা ফ্রন্টে এইসময় কমিউনিস্টদের শক্তি অন্য যে কোনো জাতীয়তাবাদী দল অপেক্ষা ছিল অনেক বেশি। তবে সাধারণ সমর্থনলাভ আশানুরূপ ছিল না।

৪. আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য সংখ্যা বিভিন্ন জেলায় ছিল সমানুপাতিক। অর্থাৎ যে জেলায় মহিলা ফ্রন্ট শক্তিশালী সেই জেলায় ছাত্রফ্রন্টও শক্তিশালী। এর দ্বারাই এই দুটি ফ্রন্টের পরস্পর নির্ভরশীলতার একটা বাস্তব চিত্র অনুমান করা যায়।

৫. দেখা যায় 'জনযুদ্ধ' ও 'পিপলস্ ওয়ার' কাগজ দুটি বিক্রয়েও মহিলা ফ্রন্টের কর্মীরাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ছাত্রফ্রন্টের ৯৭ জন হোলটাইমার ( ১৬ জেলায় ) এবং মঃ আঃ সমিতির ১২৫টি শাখার সংখ্যাটিও সেদিনের বিচারে উপেক্ষনীয় নয়।

তবুও কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতই এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে। মুসলমান পরিবার থেকে আগত ছাত্রীরা কেন ছাত্রফেডারেশনে বা সামগ্রিকভাবে ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রেই সেইভাবে সামিল হতে পারেন নি? মুসলিম ছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনার চর্চা নিশ্চয়ই দেরিতে শুরু হয়েছিল; তাদের সংখ্যাও ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম, অন্তত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে। তবু অবিভক্ত বাঙলার জনসংখ্যার অর্দ্ধাংশ যখন মুসলিম তখন এটা আশা করা কি খুব অন্যায় হবে যে ছাত্রী আন্দোলনেও মুসলিম ছাত্রীদের ভাল সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব থাকবে। মুসলিম লীগের 'ছাত্রসংগঠন' না হয় ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, মেয়েদের ঘরের বাইরে আনতে তাদের ছিল আপত্তি; কিন্তু প্রশ্ন ওঠে জাতীয়তাবাদী বা কমিউনিস্ট ছাত্রসংগঠনগুলি এবিষয়ে কতটা করেছেন? রেণু চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণে নাজিমুন্নেসা আহ্মদ নামে এক তরুণী কমিউনিস্টের কথা পাই যিনি কলকাতায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে মুসলিম মহিলা শ্রমিকদের সংগঠিত করেন। সরোজ মুখোপাধ্যায় বর্ধমানের দু'চারজন মহিলা সংগঠকের নাম করেছেন যাঁরা ( রাবেয়া খাতুন, মাকসুদা বেগম, সামসুন্নেসা বাদশা প্রমুখ ) ছিলেন কমিউনিস্ট নেতাদের সহধর্মিনী এবং প্রধানতঃ কৃষক মহিলাদের মধ্যে সংগঠন করেন। কিন্তু শহরাঞ্চলে স্কুল-কলেজে পড়া মুসলিম ছাত্রী সংগঠকরা ছাত্রআন্দোলনের বিশাল মঞ্চে ছিলেন প্রায় একেবারেই অনুপস্থিত। '৪৬ সালের উত্তাল গণআন্দোলনের সময় ( যাতে 'ছাত্রলীগের' ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল ) দেখা যায় কলকাতার কিছু মুসলিম ছাত্রী পথে নেমেছিলেন। অবশ্য কেন মুসলিম ছাত্রীসংগঠক বা কর্মী ছাত্রআন্দোলনে সুলভ ছিল না তার একটি বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ পাওয়া

যায় 'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস' রচয়িতা মোহাম্মদ হান্নান-এর বর্ণিত তথ্য থেকে :[১০]

"১৯৪৭-এর ২৩ এপ্রিল লর্ড মাউন্টব্যাটনের সঙ্গে এ বিষয়ে বৈঠক হয়। (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা)। ২৭ এপ্রিল শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং ২৯ তারিখে আবুল হাসিম সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে বিবৃতি দেন। শরৎ বসু এবং আবুল হাসিম এক গোপন বৈঠকে স্বাধীন বাঙলার নীল-নকশা প্রায় চূড়ান্ত করেন। এরপর কমিউনিষ্ট পার্টির পত্রিকা 'স্বাধীনতায়' বিষয়টি প্রকাশ পেলে রাজনৈতিক মহলে চরম আলোড়ন তোলে। বিশেষ করে মুসলিম লীগ ও হিন্দুমহাসভার নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে।

"আবুল হাশিম, কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতায় এই বিতর্কের ওপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং নেত্রকোণায় দুটি আলাদা সেমিনার অনুষ্ঠান করেন। নেত্রকোণার সেমিনারে কামরুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীবোন লুলু বিলকিস বক্তৃতা করেন। লুলু বিলকিস বক্তৃতা করতে উঠলে শ্রোতার আসন থেকে কয়েকজন মৌলভী পর্দা ভঙ্গ সম্পর্কে আপত্তি তোলেন। এর পর ঠিক হয় লুলু বিলকিস মঞ্চ থেকে বক্তৃতা না করে স্কুলঘর থেকে বক্তৃতা করবেন। কিন্তু উদ্যোক্তারা শেষ পর্যন্ত তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত প্রচেষ্টায় সফল হতে পারেননি। কারণ সেদিনের সেই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি চিন্তাটির সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।"

লুলু বিলকিসের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনেত্রীকে বক্তৃতা করতে দেয় না যে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তি তাদের ক্ষমতাকে উপেক্ষা না করেই বলা যায় মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের মুসলিম লীগের ধর্মীয় রক্ষণশীলতার কারাগার থেকে মুক্ত করতে চল্লিশের দশকের আপোষহীন সংগ্রামী 'ছাত্রফেডারেশন'ও সক্ষম হয়নি।

যাইহোক তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজজীবনে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে যে কোনো ছাত্রীর পক্ষেই পথে নেমে ছাত্র আন্দোলন করা স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া মোটেই সহজসাধ্য বিষয় ছিল না। চট্টগ্রামের ছাত্রী ও মহিলা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী জ্যোতি দেবী এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন যে 'সেইসময়ে পুরুষ সঙ্গী ছাড়া পথে বের হলে জবাবদিহি করতে হ'ত। শুধু তাই নয় রাজনীতি করার জন্য পরিবারে অভিভাবকদের দ্বারা মেয়েদের শারীরিকভাবে নির্যাতিত ও শাস্তিও পেতে হতো। সুতরাং এই পরিবেশে যে সকল মেয়েরা কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠনে কাজ করেছেন তারা ছিলেন সুনিশ্চিতভাবেই চিন্তাচেতনার দিক থেকে যথেষ্ট অগ্রসর। জ্যোতি দেবীর এই উপলব্ধি স্বীকার করতেই হয়। তৎকালীন ছাত্রীনেত্রী রেণু চক্রবর্তীও তাঁর স্মৃতিকথায় একথা স্বীকার করে লিখেছেন : "...তখনও কিন্তু ছাত্রীদের

বাইরে গিয়ে কাজ করার সমাজের বাধা যথেষ্ট ছিল। প্রায় প্রতিটি মেয়েকেই এ নিয়ে বাড়ির সঙ্গে মতান্তর ও রাগারাগি সহ্য করতে হত। অনেক মেয়েকে তো অবস্থা অসম্ভব হবার জন্য পরিবার ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। না হলে কাজ করতে পারতো না। এতে বোঝা যায় ঐ সব মেয়েদের রাজনৈতিক চেতনা, একাজে যার নির্দেশ তারা পেয়ে যেতো।"

মেয়েদের এত রাজনৈতিক চেতনা থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো মহল থেকে কিন্তু এই অভিযোগ উঠতো যে ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রীরা পুরুষ ছাত্রদের অধীনেই পরিচালিত হতেন। অর্থাৎ বামপন্থী বা জাতীয়তাবাদী যে কোনো ছাত্রসংগঠনেই পুরুষ আধিপত্যই ছিল প্রবল। ছাত্রীসংগঠকরা পুরুষ নেতাদের ইচ্ছানুসারেই পরিচালিত হয়ে আসছেন, ব্যবহৃত হয়েছেন। এই অভিযোগের আদৌ কি কোনো সারবত্তা আছে? হয়তো সত্যই বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের ময়দানে এমনকি ইতিহাসেও নারীরা উপেক্ষিতা হয়েছিলেন। কিন্তু চল্লিশের দশকে সেইদিন তো এসেছিল যেদিন গীতা মুখার্জি (রায়চৌধুরী) হয়ে উঠেছিলেন ছাত্রসমাজের নয়নের মণি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক। সেই সময় ছাত্রকংগ্রেসেরও সভানেত্রী ছিলেন পূরবী মুখার্জির মত দক্ষ সংগঠক। ছাত্রীদের বা নারীসমাজকে উপেক্ষা করে থাকবার দিন ছাত্রআন্দোলনে সেদিনই শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে এবিষয়ে ভবিষ্যতের ছাত্রসংগঠনগুলিকে নিশ্চয় সতর্ক থাকতে হবে।

ছাত্রীরা সে সময় বিভিন্ন ধারাতেই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন। বস্তুত ১৯২৮-এর এ. বি. এস. এ-র প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত সংগঠিত ছাত্রআন্দোলনের বিশ বছরে বিভিন্ন মত ও পথের পথিক হলেও ছাত্রছাত্রীদের মূল চরিত্র ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, সরকার বিরোধিতা। এদিক থেকে ছাত্রসমাজই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের আপোষহীন সেনাবাহিনী। বাঙলা তথা ভারতবর্ষে ছাত্রআন্দোলনের মূলধারা কখনোই কোনো সংকীর্ণ পথে পরিচালিত হয়নি। ছাত্রীসমাজ ছিল এই সংগ্রামী ধারারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

শেষতঃ বলা যায় ছাত্রীমেয়েরা ছিল নারীসমাজেরই শিক্ষিত অংশ। নারীদের নানাবিধ সমস্যা থেকে তাই কখনও এরা দূরে থাকেনি। তৎকালীন পরাধীন ভারতের ছাত্রীনেত্রীরা অনেকেই সঠিকভাবে বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষের সাগরের মতো বিশাল নিরক্ষর মহিলাদের মধ্যে তারাই একটু লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেয়েছেন। তাই এই বিশাল নারীসমাজকে সংগঠিত করার জন্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাদের গ্রহণ করতে হবে। এই কারণে দেশের প্রায় সর্বত্রই মহিলা আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে অল্পবয়সী ছাত্রী নেত্রীরাই বহুল পরিমাণে দায়িত্ব নিয়েছেন। ছাত্রী

আন্দোলন ও মহিলা আন্দোলনকে যেসব ছাত্রী নেত্রী—শুধুমাত্র দুটি পৃথক অস্তিত্ব রূপে দেখেনি, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারাই দেশের কোণে কোণে মহিলা আন্দোলন ও নারী সংগঠন গড়ে তোলেন। অবশ্য ছাত্রী সংগঠনের কাজ শুধুমাত্র ছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এরকম অভিমতের প্রচলন ছিল—কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। এবং তা হয়নি বলেই ছাত্রী আন্দোলনের সংগঠক ও কর্মীরা শুধুই ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমেই নয়, নারী আন্দোলনের মধ্য দিয়েও (দলমত নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের নারীসমাজের অংশগ্রহণ যাতে ছিল) স্বাধীনতার সংগ্রামে এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নিজেদের যোগ্যতম ও উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলেন।

## কল্পনা যোশী

# আমার অনেক কিছুই করবার ছিল

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবের ইতিহাসে কল্পনা দত্ত একটি রোমাঞ্চকর নাম। চাল্লশ, পঞ্চাশের দশকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে সেই অগ্নিকন্যা কল্পনার উপস্থিতি, তাঁর কর্মক্লান্ত এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

আশি ছুঁই ছুঁই কল্পনা যোশীর অভিজ্ঞতার সঞ্চয়টি বিশাল। তাঁর কৈশোর, যৌবনের প্রারম্ভে তিনি চট্টগ্রামের বিপ্লবী পার্টির সভ্য। মাস্টারদার নির্দেশে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রমুখ নেতাদের জেল ভেঙে মুক্ত করে আনার কাজে লিপ্ত। মাস্টারদা ধরা পড়ার সময়, পুলিশ বেষ্টনী এড়িয়ে তাঁর বেরিয়ে যাওয়া প্রমাণ করে দের তাঁর শারীরিক সামর্থ্যকে। চট্টগ্রামের গহিরা গ্রামে ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনি আর দু-তিনজন কমরেডের সঙ্গে সমানে গুলি চালিয়েছেন। প্রমাণিত হয়েছে তাঁর মানসিক দৃঢ়তা। ঐ সংঘর্ষে গ্রেপ্তার হয়েছেন। সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার এবং তাঁর একসঙ্গে বিচার চলেছে। বিচারে সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি এবং তাঁর আন্দামানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদে আন্দামানে দ্বীপান্তরের আদেশ স্থগিত হয়েছে। মেদিনীপুর জেলে কেটেছে তাঁর বন্দীজীবন। বন্দীজীবন কেটেছে পড়াশুনো করে। মুক্তির পর তিনি পেয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন, আশীর্বাদ।

কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসেবে, বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় চট্টগ্রামে তাঁর কাজকর্মে প্রকাশ পেয়েছে সাংগঠনিক প্রতিভা। সেই সময় তাঁর লেখা বহু রিপোর্টাজ প্রকাশিত হয়েছে পিপলস্ ওয়ার-এ। মিছিলের এই মুখের প্রেমে পড়েছেন কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় নেতা পূরণচাঁদ যোশী। ১৯৪৩-এ বিবাহের পর কল্পনা দত্ত হয়েছেন কল্পনা যোশী। সেই থেকে তিনি এখনও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ রাশান ল্যাঙ্গুয়েজ-এর সাধারণ সম্পাদক। থাকেন দিল্লীতে।...

**প্রঃ** বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত আপনার জীবন কেমনভাবে কেটেছে?

উঃ ছোটবেলাকার কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে। বড় আনন্দে কেটেছে আমাদের ছেলেবেলা। আমার জন্ম ১৯১৩-র ২৭ জুলাই। আমার ঠাকুর্দা হলেন দুর্গাদাস দত্তগুপ্ত। রায়বাহাদুর। চিকিৎসক হিসাবে সুনাম ছিল। ইংরেজরা 'ডাট' বলে ডাকত। সেই থেকে তিনি হলেন ডাঃ দুর্গাদাস ডাট্। আমার পুরো নাম কল্পনারানি দত্তগুপ্ত। ম্যাট্রিকুলেশনের ফর্ম ভর্তি করবার সময় 'রানি'ও কাটলাম 'গুপ্ত'ও কাটলাম। হলাম কল্পনা দত্ত। ঠাকুর্দা যদি কাটতে পারেন তো আমিও পারি। ঠাকুর্দার গোঁড়ামি ছিল না। একটা লাইব্রেরী ছিল দেখার মতো।

চাটগাঁয় লেখাপড়ার খুব চল ছিল। মেয়েদের অন্তত স্কুলটা পাশ করতে হবেই। ডঃ খাস্তগীরস্ ইংলিশ হাইস্কুল ফর গার্লস-এ আমার স্কুলের পড়াশুনো। ওখান থেকেই আমি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছি— সালটা সম্ভবত ১৯২৯। পান্না হয়েছিল ফার্স্ট, সুরমা সেকেন্ড, জ্যোৎস্না থার্ড আর আমি ফোর্থ। অংক আর সংস্কৃতে লেটার পেয়েছিলাম। আমরা ছোট ভাইবোন সবাই সংস্কৃত পড়তাম। সংস্কৃত পড়তে ভালো লাগত। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতায় এলাম বেথুন কলেজে পড়তে। থাকি বেথুন হস্টেলে।

এর আগে ক্লাস সেভেনে যখন পড়ি, টুনুকাকা তখন সবসময় বলত, তুই এখন বড় হয়েছিস, তুই এখন দেশের কথা ভাবতে শেখ। ঐসময় চাটগাঁয় নন-কোঅপারেশন মুভমেণ্ট-এর প্রভাব খুব পড়েছিল। ঠাকুর্দা আমার দুই কাকাকে কলকাতায় সেণ্ট জেভিয়াস-এ পড়তে পাঠিয়ে দিলেন। টুনুকাকা পূর্ণেন্দু দস্তিদারের নাম বলেন। বলেছিলেন বেথুন কলেজে গিয়ে ভিজিটরস্ লিস্টে পূর্ণেন্দু দস্তিদারের নামটা ঢুকিয়ে দিতে। উনি নাকি আমাকে স্বদেশী বই-টই সব দিয়ে যাবেন। এই গল্প আমি বাবাকে বলতাম। বলতাম বাবা জানো আমি ক্ষুদিরামের মতো হবো। বাবা শুনতেন, বলতেন পড়াশনো কর, বড় হ, তারপর যা ভালো লাগে করিস। কখনও ডিসকারেজ করেননি। টুনুকাকা এত ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষকতার কাজ নিয়েছিলেন। এই ঘটনা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছিল।

ইতিমধ্যে বেণীমাধব দাশের মেয়ে কল্যাণী দাসের নেতৃত্বে কলকাতায় 'ছাত্রী সংঘ' গড়ে উঠেছে। কলেজের কাছেই সিমলা ব্যায়াম সমিতি। ওখানে অতীন বোসের একটা আখড়া ছিল। অতীন বোসের ছেলে—ভালো নামটা ভুলে গেছি। আমরা গদাইদা বলতাম—উনি চালান। আমি সেই আখড়ায় ভর্তি হলাম। যুযুৎসু, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা শিখেছিলাম। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন রাজকুমারী দাশ। খুব কড়া। কলেজে ছাত্রী সমিতি গঠন করবার অনুমতি উনি দিয়েছিলেন। এখন মনে হয় মুখে যাই বলুন না

কেন ও'র মধ্যে দেশপ্রেম ছিল, না হলে সমিতি গড়বার অনুমতি দিলেন কেন? মনে আছে, আমাদের ফ্রেঞ্চ পড়াতেন কালিদাস নাগ।

আমি আমাদের বাড়ির ভাইবোনদের জেনারেশনে প্রথম যে-কলেজে পড়তে এসেছি। বাড়ির সবাই এত উপহার দিয়েছে আমায়। রেঙ্গুন থেকে ভালো ভালো কাপড় এল। আমি তখনই ঠিক করেছি খদ্দর ছাড়া পরব না। টুনুকাকা বলে দিয়েছে আমায় স্বদেশী হতে হবে। হাতখরচের টাকা বাঁচিয়ে একটা সাইকেল কিনে ফেললাম। সকালবেলায় উঠে দোতলা থেকে একতলায় লাফ দিয়ে নেমে সাইকেল চালাতাম কলেজের মাঠে।

প্রঃ আপনি কবে প্রথম চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন আর কিভাবে এই সশস্ত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।

উঃ বেথুন কলেজে পড়াকালীন পূর্ণেন্দুদা, ক্যাবলাদা (মনোরঞ্জন রায়) এ'দের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। এ'দের সঙ্গে সম্ভবত তখনই চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু আমায় তখন ও'রা ঐ বিষয়ে কিছু বলেননি। ১৯৩০-এর ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম আর্মারি রেড্ হল। আমি তখন কলকাতায়। কলকাতায় খবর এল চট্টগ্রামে মগ দস্যুর আক্রমণ। মে মাসে গরমের ছুটিতে বাড়ী এলাম। চাটগাঁ সুনসান্। আমরা থাকতাম আন্দারকিল্লার বাড়িতে। সন্ধ্যার সময় কারফিউ। আসবার সময় পূর্ণেন্দুদা বলেছিলেন মাস্টারদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। বাবাকে বললাম আমার আর কলকাতায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। পূর্ণেন্দুদা বোধহয় নির্মলদা (নির্মল সেন), মাস্টারদাদের বলেছিলেন আমার কথা। বলেছিলেন রায়বাহাদুর বাড়ির মেয়ে কেউ সন্দেহ করবেন না। অস্ত্রশস্ত্র, ডকুমেণ্ট রাখবার পক্ষে আইডিয়েল জায়গা। খবর এল একটি ছেলে আসবে রাত্তিরে। একতলায় পড়ার ঘরের জানলায় দুবার টোকা দেবে। আমি তখন থেকে মা'র সঙ্গে শুতাম না। যথারীতি একটি ছেলে এল। যতদূর মনে পড়ছে তার নাম নিবারণ। তার সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম চুপিচুপি। কাছেই গ্রামের বাড়িতে নির্মল সেনের সঙ্গে প্রথম আলাপ হল। নির্মলদা বললেন, তুমি সবকিছু করতে পারবে? প্রাণ দিতে পারবে? আমি বললাম হ্যাঁ। বললাম, আমাকে পিস্তল চালানো শিখিয়ে দেবেন? নির্মলদা বলেছিলেন শিখিয়ে দেবেন। সামনেই আই-এস-সি পরীক্ষা। নির্মলদা পরীক্ষা দিতে বললেন। কলকাতার সেণ্টার বদল করে চট্টগ্রামে পরীক্ষার সেণ্টার নিলাম। ইতিমধ্যে আমার সব বই এক গরীব আত্মীয়কে দিয়ে দিয়েছি। কোনরকমে পরীক্ষা দিলাম। একদিন আবার খবর এল রাত্তিরে বেরোতে হবে। বেরোলাম। কাছেই গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেল নিবারণ। দেখি একজন ছোটখাট সাদামাটা মানুষ। কিন্তু চোখটা জ্বলজ্বলে। উনিই মাস্টারদা।

সূর্য সেন। আমায় বললেন স্বদেশী করতে ভয় করবে না। বললাম, না। তারপর বললেন, তোমাদের বাড়িতে কিছু জিনিসপত্র রাখতে দেব। জিজ্ঞেস করলেন পরীক্ষা কেমন হয়েছে? বললাম, খুব একটা ভালো না। উনি বললেন, কেন তোমাকে কি অনেক কাজ দেওয়া হয়েছিল? গলার স্বরে মনে হল পড়াশুনোয় শৈথিল্য উনি পছন্দ করেননি। যাই হোক, রায়বাহাদুর বাড়ির মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও আমায় বিশ্বাস করেছেন এই ভেবে খুব আনন্দ হল। আমি স্বর্গ পেয়েছি তখন।

আই-এস-সি-তে সেকেণ্ড ডিভিশন হল। চাটগাঁয় কোন মেয়েদের কলেজ নেই। একটা গভর্নমেণ্ট কলেজ ছিল সেখানে শুধু ছেলেরা পড়ত। সেখানে প্রিন্সিপাল ছিলেন অপূর্ব চন্দ। ভাইস প্রিন্সিপাল অশ্বিনী মুখার্জী। আমাকে ভর্তি করে নেবার অনুরোধ করতে প্রিন্সিপাল অপূর্ববাবু হাসতে হাসতে বাবাকে বললেন আপনার মেয়েকে চাটগাঁ কলেজে ভর্তি করলে এখানকার ছেলেরা পড়াশুনো করবে না। ভাইস প্রিন্সিপাল অশ্বিনীবাবু একটু আপত্তি করেছিলেন। যাইহোক পরে রাজি হয়ে গেলেন। বি, এসসি, পড়তে ভর্তি হয়ে গেলাম চাটগাঁ কলেজে। সায়েন্স পড়তে আমার ভালো লাগত। তাছাড়া কলেজ ল্যাবরেটরিটা ব্যবহার করতে পেলাম। কলেজে পড়াকালীন বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগটা আরো বাড়ল।

প্রঃ আপনি কোন পরিস্থিতিতে কবে আত্মগোপন করেন? আপনার পলাতক জীবনের দু-একটা ঘটনার কথা বলুন।

উঃ ফোর্থ ইয়ারে উঠে গেছি তখন। বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ আরো বেড়েছে। অনেক গোপন ডকুমেণ্ট অস্ত্রশস্ত্র বাড়িতে রেখেছি। বাড়িতে বসেই কিছু বিস্ফোরক বানাই। লেখা কপি করে দিই। পুলিশ ইন্সপেক্টর যোগেন্দ্র গুপ্ত মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসেন। বলেন তুই আমার মেয়ের মতো। তুই কখনও স্বদেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করবি না। আমায় বল মেলামেশা করবি না? আমি বলি আপনি জানেন এটা রায়বাহাদুরের বাড়ি। আপনি এরকম বলেন বলে সবাই বকাবকি করে। আমি কোন স্বদেশীদের সঙ্গে মিশি না। এদিকে অনন্ত সিং গণেশ ঘোষ প্রমুখ নেতাদের জেল ভেঙে মুক্ত করে আনবার একটা পরিকল্পনা হয়েছিল। ১৯৩১-এ সেই 'ডিনামাইট ষড়যন্ত্র' প্রকাশ পেয়ে যায়। তারপর থেকে আমার ওপরও হোম রেসট্রেণ্ড অর্ডার ছিল। রোজ বাড়িতে এসে পুলিশ দেখত আমি বাড়িতে আছি কিনা। কিন্তু বাড়ি কখনও সার্চ করেনি। মা বোধহয় কিছু একটা আন্দাজ করতে পারছিলেন। খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন তো। এই অবস্থায় নির্মলদাকে আমি একদিন বললাম, নির্মলদা মা সন্দেহ করছে। আপনি তাড়াতাড়ি আমাকে অ্যাকশন করতে দিন। নির্মলদা বললেন, দাঁড়া আমরা

মেয়েদের দিয়ে অ্যাকশন করাব। এমনই সময়ে এক রাত্তিরে পুরুষের পোষাকে নিবারণের সঙ্গে যাচ্ছি পাহাড়গুলির দিকে। পুরুষের পোষাক মানে ধুতি, পাঞ্জাবি আর মাথায় পাগড়ি। যে জায়গাটা দিয়ে যাচ্ছি, সেই এলাকাটা খারাপ। গুণ্ডা ধরনের লোক থাকে। হঠাৎ একজন লোক সামনাসামনি এসে পড়ে। আমাকে দেখে তার সন্দেহ হয়। আরে এ তো মেয়ে! তারপর চিৎকার ওঠে, সবাই এসো, একটা ছেলে একটা মেয়েকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। লোকজন সব ছুটে এল। ওরা পুলিশে খবর দিল। থানায় নিয়ে গেল। ধরা যখন পড়েছি তার আগেই আবার পুলিশ বাড়িতে গিয়েছিল। ওরা খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে আমি বাড়িতে নেই—মিসিং। থানার বড়বাবুর প্রশ্ন কোথায় যাচ্ছিলে? তখন অভিনয় করতে হল। জানেন তো আমাদের রায়বাহাদুরের বাড়ি। আপনারা আমার অযথা সন্দেহ করছেন, হোমরেসট্রেনড্ অর্ডার দিয়েছেন। আমার অপমান লাগছিল তাই আমি কলকাতায় চলে যাচ্ছিলাম। আমায় গ্রেপ্তার করা হল। পুলিশ কিছুতেই কেস ফ্রেম করতে পারছিল না। ওরা চেষ্টা করছিল প্রমাণ করতে যে, 'She was the custodian of arms.' দুমাস পরে জামিনে ছাড়া পেলাম। কোর্ট-এ যেতে হত নিয়মিতভাবে। মাস্টারদা খবর পাঠালেন, যেভাবে মামলা চলছে তাতে মনে হয় পাঁচ বছরের সাজা হবে। তুমি অ্যাবসকণ্ড করো। আমি করলাম। সেদিন বাবা ছিলেন না বাড়িতে। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। বাবার জন্য কষ্ট হত। বাবা তো আমার কাজে কখনও বাধা দেন নি, বলতেন বড় হ তারপর যা খুশি করিস। আমি যখন অ্যাবস্কণ্ড করেছি তখন নির্মল সেন ধলঘাটের সংঘর্ষে নিহত। আর প্রীতিও (প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার) ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের পর পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মারা গেছে। তার মানে ১৯৩২-এর সেপ্টেম্বরের পর শুরু হয়েছে আমার পলাতক জীবন। এই সময়ে কোন শেল্টারেই আমরা দু-একদিনের বেশি থাকিনি। মাস্টারদা ধরা পড়ার আগে গতিবিধির সুবিধের জন্য আমরা চট্টগ্রামের দুদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলাম। মাস্টারদার সঙ্গে আমি মুভ্ করতাম। অপরভাগের নেতৃত্বে ছিলেন ফুটুদা (তারকেশ্বর দস্তিদার)। যে শেল্টারেই গেছি, সেখানেই পেয়েছি সাধারণ মানুষের ভালবাসা।

[অশোককুমার মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গে কল্পনা দত্তর (যোশী) এই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯১-এর সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায়। তার নির্বাচিত অংশই তুলে ধরা হয়েছে পরিশিষ্ট-১এ। সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ছাত্রীদের অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপট অনুধাবনে এই সাক্ষাৎকারটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।—সু. দাশ]

## সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

# আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা

…রাজশাহী ছিল এদিক থেকে অত্যন্ত রক্ষণশীল। অন্তঃপুরিকারা অসূর্যম্পশ্যা হয়ে থাকবেন এটাই বনেদীয়ানার লক্ষণ। বালিকা বিদ্যালয় থাকলেও কলেজে সহশিক্ষা প্রচলনের প্রস্তাব কার্যকরী হতে পারেনি অভিজাতদের, সমাজপতিদের বিরোধিতার দরুণ। এবার তাঁদের অনুশাসনকে উপেক্ষা করে স্বেচ্ছাসেবিকা দলে নাম লেখাতে এগিয়ে আসে সুরেন মৈত্র মহাশয়ের কন্যা মীরার নেতৃত্বে আরো কয়েকটি মেয়ে। সবার নাম আজ আমার মনে নেই, থাকার কথাও নয়। তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছে খুব অল্পই। তবে শমিতার কথা এই কাহিনীর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। কেন না তাকে উপলক্ষ্য করেই আমি হিমাদ্রির ব্যক্তিত্বের একটি কোমলতম দিকের সন্ধান পেয়েছিলাম। সে তার হৃদয়ের দুয়ার খুলে ধরেছিল আমার সামনে। শমিতাকে ঘিরে তার মনে একটি নিভৃত স্বপ্নকে সঞ্চারিত হয়ে উঠতে দেখেছি। প্রথমটায় অবশ্য হিমাদ্রি আর শমিতা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। আরো বেশি অবাক হয়েছিলাম তাদের সপ্রতিভ ভাবে আলাপ করতে দেখে। শুধু শমিতারই নয়, হিমাদ্রির পক্ষেও সপ্রতিভতা সেদিন আমার চোখে বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল বৈকি।

আমার কাছে তখন পর্যন্ত নারী রয়ে গেছে রহস্যরূপিণী, কল্পলোক-বাসিনী। অনাত্মীয়া কোন কিশোরী বা তরুণীর সঙ্গে পরিচয় দূরে থাকুক, সংস্রবে আসার সুযোগ ঘটেনি। আত্মীয়তা সম্পর্কে সম্পর্কিতদের মধ্যেও ঐ বয়সের কাউকে পাইনি। যৌবনের তাগিদে অবকাশের কোন মুহূর্তে বা ঘুমভাঙা রাতে হয়ত এমন একজনকে আপনার করে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে যার সান্নিধ্য জীবনকে স্নিগ্ধতার পরশে ধন্য করে তুলবে। কিন্তু যে পথ বেছে নিয়েছি তাতে সে কল্পনাকে জোর করে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়েছে। তাকে দুর্বলতা বলেই ভেবেছি। দুর্বলতার কথা কারুর কাছে প্রকাশ করিনি। নির্মলের কাছেও নয়, হিমাদ্রির কাছে ত নয়ই।

হিমাদ্রিকে ভেবেছি আগাগোড়া ইস্পাতে ঢালাই করা বিপ্লবী বলে। তাই কৌতূহল দমন করতে পারি না। একদিন তাকে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করি। সেও অকপটে সব কথা খুলে বলে। হিমাদ্রিকেও ছাত্র সংগঠনের কাজে

জেলার নানা স্থানে ঘুরতে হয়। এমনি ঘোরার মধ্য দিয়েই হয় শমিতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

সেবার দুদিনের জন্য তাকে যেতে হয়েছিল রাজশাহী শহরের নিকটেই একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে। গিয়েছিল একজন সহপাঠী বন্ধুর অতিথি হয়ে। কিন্তু যে দুদিন সেখানে ছিল রোজই একবেলা পাড়া প্রতিবেশীদের কারুর না কারুর বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হয়েছে। দ্বিতীয় যে বাড়িতে দুই বন্ধু পাশাপাশি খেতে বসেছে সেখানে পরিবেশন করে একটি সুন্দরী কিশোরী। হিমাদ্রি প্রথমে তার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখেনি। বর্ষীয়সী গৃহকর্ত্রী সামনে বসে অতিথিদের খাওয়ার তদারক করছেন। স্নেহকোমল মাতৃহৃদয়, কথার ফাঁকে ফাঁকে হিমাদ্রির বাড়ির খবর নিচ্ছেন। আপনজন থেকে দূরে হোস্টেলে তার না জানি কত অসুবিধা হচ্ছে ভেবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কথার জবাব দেওয়ার জন্য এক সময় মুখ তুলতেই হিমাদ্রির চোখ পড়ে দেওয়ালে টাঙানো কার্পেটের উপর লেখনের দিকে। কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো কার্পেটে উল দিয়ে বুনে লেখা "যারা ডাক দিয়ে গেল, বন্দীশালার শিকল ঝংকারে"। সেদিকে হিমাদ্রির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে দেখে মহিলা বলেন: "ওটা শমিতার লেখা। ওতো তোমাদেরই দলে, স্বদেশীর ভীষণ ভক্ত।"

হিমাদ্রি এবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখতেই দুজনেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। শমিতার দুই চোখ এতক্ষণ ওরই মুখের দিকে নিবদ্ধ ছিল। সুগৌর মুখমণ্ডলে লজ্জার ঈষৎ রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়ে। হিমাদ্রিও বুকের ভিতরে অনুভব করে এক অনাস্বাদিত পূর্ব চাঞ্চল্যের অনুভূতি। মহিলাটি জানান শমিতা তাঁর নাতনী, জেলা শহরে বালিকা বিদ্যালয়ে উপরের ক্লাসে পড়ে। কয়েকদিনের ছুটিতে বাড়িতে এসেছে। বিদায় নেওয়ার সময় হিমাদ্রি বৃদ্ধার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে শমিতাকে জানায় নমস্কার। শমিতা তখন সপ্রতিভভাবেই প্রতি নমস্কার করে।

হিমাদ্রি অসংকোচে আমাকে বলে যে, ঐ গ্রাম ছেড়ে চলে আসার পরেও বারবার তার মনের পটে ভেসে উঠেছে একখানি স্নিগ্ধ কমনীয় মুখচ্ছবি, ঘন কালো দুই চোখে পূজারিণীর শুচিশুভ্র দৃষ্টি। এই কিশোরীর চোখের নীরব ভাষায় সে খুঁজে পায় বীরপূজার অর্ঘ।

তারপর সম্প্রতি দুজনের দেখা হয়েছে নাটকীয় পরিবেশে, সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির অফিসে। হঠাৎ এভাবে আবার দেখা হবে সে কথা বোধ হয় কেউ ভাবেনি। আকস্মিকতার প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে দু পক্ষেরই কয়েক মুহূর্ত সময় লাগে।

শমিতার সঙ্গে আছে তিন চারটি মেয়ে। তারা স্বেচ্ছাসেবিকা দলে নাম

লেখাতে এসেছে। হিমাদ্রি তাদের বসতে বলে প্রশ্ন করে: "আপনারা কি অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে এসেছেন?" শমিতা পাল্টা প্রশ্ন করে: "ছেলেদের বেলায় কি অনুমতির কথা ওঠে?" হিমাদ্রি জবাব দেয়: "কোন কোন ক্ষেত্রে ওঠে বৈকি।" তারপর একটু হেসে বলে: "আপনি রাগ করছেন কেন? অন্তত আমাদের এই শহরে এখনও খুব বেশি সংখ্যক মেয়ে প্রকাশ্যে আন্দোলনে নামেনি।" শমিতাও হেসে ফেলে, বলে: "আমরা অনুমতি নিয়েই এসেছি। নতুবা কি আসা সম্ভব হত?

তারপর কয়দিন মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য দেখা, কয়েকটি কথা, একটু হাসি, তবু দুটি তরুণ হৃদয়ের পক্ষে পরস্পরের কাছে আসার পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট। বিশেষ করে যখন তারা একই সংগ্রামের সৈনিক।

[মনীষা প্রকাশিত 'আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের নির্বাচিত অংশ (পৃঃ ১৩৯-১৪২) পরিশিষ্ট—২-এ তুলে ধরা হল। সেই যুগে ছাত্রীদের রাজনৈতিক কাজে অংশ গ্রহণের মানবিক দিকটি অনুধাবনের জন্য এই অংশটি অত্যন্ত কৌতূহল উদ্দীপক।—সু. দাশ]

পরিশিষ্ট—৩

## মণিকুন্তলা সেন

# সে দিনের কথা

পার্টি নেতৃত্বে মহিলাদের গণসংগঠন গড়ে ওঠার অনেক আগেই ছাত্রসংগঠন গড়ে উঠেছে মোটামুটি বড় আকারে। তাদের মিটিং মিছিলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জোরালো কণ্ঠ কানে আসে আর মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে আমি থাকতে চেষ্টা করতাম। ওরাও আমাকে ডাকত। আমি ছাত্রীজীবন পার হয়ে এসেছি, তবু ডাকত—ওদের কোন কোন ছাত্রসভায় সভানেত্রী হবার জন্য। তখন পর্যন্ত আমি বক্তৃতা করতে পারি না। দু'চার কথা যা হোক বলে দিতাম মাত্র। তার মধ্যে জোরটা বেশী থাকত ভাল লেখাপড়ার উপর। বিশ্বনাথ মুখার্জী তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রনেতা। তার বক্তৃতা শুনতে খুব ভাল লাগত।

এই ছাত্রদের সঙ্গে শুরু হয় আমার গ্রামেগঞ্জে যাওয়া। এর আগে বরিশাল বা কলকাতা শহরেই যা ঘোরাঘুরি করেছি। স্বাধীনভাবে শহরের বাইরে যাইনি।

সেবারে আমি বরিশালে ছিলাম। ওখানে ছাত্রদের একটা বড় মিটিং হবে টাউন হলে। আমি মাকে ও ছোড়দিকে নিয়ে মিটিং শুনতে গেলাম। বিশ্বনাথ মুখার্জী বক্তৃতা করল। মা তো বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ। বিশ্বনাথের জ্বালাময়ী বক্তৃতা যে অজান্তে আমার কি উপকারই করেছিল সেদিন! বাড়ি এসে মা ঘুরে ফিরে ওর কথাই বলছেন। সুযোগ বুঝে মাকে আমি বললাম—"মা ছাত্ররা আমাকে বলছে ওদের সঙ্গে বানরীপাড়া যেতে, সেখানে ওদের সম্মেলন হবে। যাব?" আগেই ছেলেরা এ প্রস্তাব আমাকে দিয়েছে। মাকে বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না। টাউন হলের মিটিং শুনে মা আর না বলতে পারলেন না। একটু চুপ করে থেকে বললেন, "তুই ছেলেদের সঙ্গে একলা যাবি? সে কি করে হয়? বললাম না, মনোরমা মাসীমাও যাবেন।" বরিশালে কেউ এঁর সঙ্গে মেয়েকে যেতে দিতে আপত্তি করবে না। মা রাজী হয়ে গেলেন। রাত দশটায় মা ও দাদা নৌকাঘাটে গিয়ে আমাকে বিশ্বনাথ মুখার্জী ও মনোরমা মাসীমার সঙ্গে নৌকাতে নিশ্চিন্ত মনে তুলে দিলেন। বাড়িতে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুই যে যাবি, ওর মতন বক্তৃতা করতে পারবি?' বললাম 'ওরকম পারব না, তবে যা হয়

কিছু বলতেই তো হবে।' নৌকায় উঠে কাকে যেন মনে মনে নমস্কার করলাম। একান্ত মনে চাইলাম যাত্রা শুরুর যাত্রা আমার যেন চলতেই থাকে। বাড়ি ফিরে শুনেছিলাম আমি নাকি কার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছি। মা-ই আমাকে বাঁচালেন সে দুর্নাম থেকে।

এবার বানরীপাড়ার গল্পটা বলি। আমাকে ও বিশ্বনাথকে একটা বাড়িতে ওঠানো হলো। মাসীমার তো সব বাড়িই তাঁর নিজের ঘর। কোথায় চলে গেলেন। দু'পাশে দু'টো চৌকিতে বিছানা পাতা। অনুমান করলাম—আমার ও বিশ্বনাথের জন্য। ভেতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ। কোনো মহিলা আমার কাছে আসছেনও না, ভেতরেও ডাকছেন না। একটু রাগ হলো। আমি কি পুরুষ নাকি? একটু পরে বিশ্বনাথ দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু দরজা না খুললে আমি ভেতরে যাই কি করে? কাপড় ছাড়ব, স্নান করব, না নেত্রী হয়ে এখানে বসে থাকব? বাড়ির পুরুষরা তো আমার সামনে আসছেনই না, কারণ আমি মহিলা। মেয়েরাও আসছেন না, আমি নেত্রী—অতএব পুরুষ সমান বলে। উঠে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললাম, 'খুলুন একবার দরজাটা। কাপড় ছাড়ব আমি। একটু ফাঁক হলো, ভদ্রলোকটি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ভেতরে একহাত ঘোমটা টানা দুটি মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। কি যে বলব বুঝতে পারছি না। কাপড় ছাড়া হলো। দু'চারটি ছোট ছেলে-মেয়ে আমাকে পুকুরঘাটে নিয়ে গেল। স্নান সেরে এসে দেখি বিশ্বনাথ ফিরেছে। ঐ বারান্দাতেই মস্ত দুটো পিঁড়ি পেতে আমাদের বসতে দিল। খাওয়া হতেই বিশ্বনাথ আবার বেরিয়ে গেল। বলে গেল একটু জিরিয়ে নিতে। ২।।, ৩ টায় ছেলেরা আসবে, মিছিলে যেতে হবে। তাই হলো। ছাত্রদের সঙ্গে শ্লোগানমুখর মিছিলে আমরা গ্রামখানি ঘুরে এলাম। এতে সুবিধা আছে। নেতারা যে সত্যিই এসেছে গ্রামবাসীকে এটা দেখানো হয় এবং মিটিং এ যাতে লোক আসে তার প্রচারও হয়। এ ব্যাপারে পরে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

মিটিং-এ স্কুলের ছাত্ররাই এসেছে। সভানেত্রী হয়ে তাদের কলরব থামানোই ছিল আমার প্রধান কর্ম।

বিশ্বনাথকে বলতে ডাকা হলো। ঝড়ের গতিতে সে বলে যাচ্ছে। চারপাশে কিছু কিছু গ্রামের ভদ্রলোকেরা ছিলেন। কিন্তু আসল শ্রোতা স্কুলের ছোট ছেলেরাই। সেক্ষেত্রে বক্তৃতাটা ছোটদের মাথার উপর দিয়েই যাচ্ছিল বলতে হবে। আমি দেখছি ছেলেগুলি মাঝে মাঝে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। বিশ্বনাথ যখনই বলছে—'বানোয়ারী পাড়া' তখনই ওরা হাসছে। গ্রামের নামটা 'বানরী পাড়া' একটা চিরকুটে লিখে ওর হাতে গুঁজে দিলাম। পরে বিশ্বনাথ এই নামই বলতে থাকল—ছেলেদের হাসিও থামল।

সভাশেষে আমি সেই বাড়ি ফিরে গেলাম। বিশ্বনাথ ওখান থেকেই চলে গেল শহরে। আমার কয়েকটা দিন থাকার কথা, মনোরমা মাসীমার সঙ্গে অন্যান্য গ্রামে যাব এবং মহিলা সভা করব। রাত্রের খাওয়ার পর আমি একটা চৌকিতে শুয়ে পড়লাম। বারান্দাটাও ঘরই। বাইরের দরজা বন্ধ করা হলো এবং ঘর ও বারান্দার মধ্যেকার দরজাটিও বন্ধ। বাতি নিভে গেল। অন্ধকারে একা আমার ভয় করতে লাগল। কখন একটু ঘুমিয়েছি। হঠাৎ শব্দ। উঠে বসলাম। আমার পাশের টিনের বেড়ার উপরে শব্দ। জোরে ওদের বললাম, 'শুনুন এ শব্দ কিসের?' সবাই উঠলেন এবং লণ্ঠন নিয়ে বাইরে দেখে এসে বললেন, 'আমাগো ছাগলডা বেড়ায় গা চুলকাইতেছে। ভয় পাইবেন না।' সকালে মুখ হাত ধুয়ে বসে আছি তো বসেই আছি। কেউ আসছেও না—কিছু খেতেও দিচ্ছে না। বুদ্ধি করে রান্নাঘরে চলে এলাম। দেখি চা বানানোর তোড়জোড় চলছে। বুঝলাম এতেই দেরি। বললাম, 'চা কে খাবে? আমি? ঘোমটা নেড়ে উত্তর হলো—'হ্যা'। বললাম—'আমি তো চা খাই না, সকালে একটু ডাল ভাত খাই।' উনুনে বরিশালের মুসুরী ফুটছিল। বৌ-এরা মুখ চেপে হাসতে লাগল। একটা পিঁড়ি টেনে বসে বললাম, আর আপনারা যদি ঘোমটা না খোলেন তো ডাল-ভাতও খাব না। নিজেই গিয়ে ঘোমটা তুলে দিয়ে বললাম—'দেখুন তো আমি পুরুষ মানুষ?' এবার বাঁধ ভাঙল। মুখ ফুটল। হাসাহাসির ধুম পড়ে গেল। ওরা বললো, 'পুরুষ না অইলে কি অইলো? আপনে কত বিদ্বান, আপনের লগে আমরা কি কথা কমু?' বললাম, কেন ডাইল ভাতের কথা কইথে তো বিদ্বান হওন লাগে না।' ভাব হলো, ডাল ভাত খেতে খেতে নানান গল্প হলো। সমাজতন্ত্রের কথা নয়, সোভিয়েটের মেয়েদের কথা নয়। কলিকাতা শহর ও বরিশাল শহর—এই দুটো নামই বিশ্বসংসারে তাদের জানা নাম। এখানকার গল্পই করলাম। মেয়েরা স্কুলে যায়, পাশ করে, ডাক্তার হয়, বড় চাকরী করে—এই সব গল্প। শুনে ওদের চোখগুলো বড় হয়ে গেল। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আমাগো কপালে কি আর ওসব আছে?' হায় আমার দেশ। বরিশাল শহর থেকে এক রাত্রের নৌকো পথ। বর্ধিষ্ণু গ্রাম বানরী পাড়া। স্কুল আছে, ছেলেরা পড়ে। তাইতো আমাদের আসা। আর সেখানেই মেয়েদের এই অবস্থা! যারা এদেরও অনেক তলায়, তারা না জানি আরও কত তলায়। ঘোরা তো আমার সবে শুরু। দেখি যদি ঘুরতে ঘুরতে সেই তলদেশে পৌঁছে আমার অজানা দেশের অচেনা নারী সমাজের খোঁজ পাই। তাদের গল্পই হয়তো বেশী বলতে হবে।

এই সঙ্গে আরো একটা ছাত্র-সম্মেলনের কথা বলে নিই। নয়তো ভুলে যেতে পারি। এই ছাত্র-সম্মেলনের বেশ কয়েক বছর পরে খুলনা জেলার

খালিশখালি গ্রামে সম্মেলন। আমাদের ওঠানো হল একটি ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-বাড়িতে। বাড়িটির দুই শরিক হয়ে গেছে এবং রেষারেষিও আছে। অতএব অতিথি আপ্যায়নে প্রতিযোগিতাও আছে। ক্ষয়িষ্ণু হলেও জমিদার বাড়ি। আমরা যে কি করে এখানে ঠাঁই পেলাম। বোধহয় ক্ষয়িষ্ণু বলেই। হাজার হোক একটা সম্মেলনের জাঁকজমক তাদের বাড়ির পাশের জমিতে হলে কত লোকের যাওয়া আসা হবে। নেতা ব্যক্তিরা যে বাড়িতে থাকে সে বাড়ির মানও একটু বাড়ে বৈকি। তবে দুই শরিক মিলে ভারসাম্যের ব্যবস্থাও করেছেন। বাড়ির একাংশে আমরা, অপরাংশে পুলিসেরা আশ্রিত। তখনকার সময়ে এসব ব্যাপারে পুলিসের অনুমতি নিতে হতো। এরা পুলিস ও আমাদের পাশাপাশি রেখে সুবুদ্ধির কাজ করেছিলেন। সম্মেলনের অনুমতি সহজেই মিললো।

আমাদের আপ্যায়নে জমিদারী স্টাইলের কোন ঘাটতি ছিল না। দোতলার একখানা ঘরে আমি একলা। আর ছেলেরা সব নীচে। আহার-ব্যবস্থার প্রাচুর্যে আমি শঙ্কিত। সামনে সাজানো ১০টা বাটির সবটাই শেষ করতে হবে—সামনে দাঁড়ানো কর্তার হুকুম। বাড়ির মেয়েরা ঘোমটা টেনে খাবার দিয়ে নীচে চলে গেলেন। আমাকে সামনে বসে খাওয়াচ্ছেন কর্তা। গিন্নীর কপালে এ মানটুকুরও ভাগ নেই। মনে ভাবলাম, রাজার মহিষী আর প্রজার ঘরণী সবারই কপাল ঐ 'সাতপাকে' বাধা। আমার সামনে ইনিও এলেন না।

শুনলাম অপরাংশে পুলিশরা বেশ খোস মেজাজে খাচ্ছে দাচ্ছে। ছাত্র-সম্মেলনের সভানেত্রী আমি। বিশ্বনাথ ও অন্য ছাত্রনেতারা বক্তৃতা করলেন। খুলনা ও দৌলতপুর কলেজ থেকে কলেজের ছেলেরাও এসেছিল। সম্মেলনটা বেশ বড় হলো। আমি এখন কিছুটা বক্তৃতা করতে পারি। ছাত্র ঐক্য, ইউনিয়ন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কথাবার্তা—এসব বলতে শিখে গেছি। তবে ভাল ছাত্র হতে হবে এই সুবাক্যটি বলতে আমি ভুলি না।

পরের দিন মহিলাদের সভা। এবার জায়গাটি পর্দা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। আমি গিয়ে দেখি পুলিশরা আমার পাশেই টেবিল নিয়ে বসেছে। জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা এখানে কি করতে এসেছেন? বললো, রিপোর্ট নিতে।' বললাম, পর্দার বাইরে গিয়ে বসুন। এটা মেয়েদের সভা, দেখছেন না, কালকের খোলা মিটিং এটা নয়। এটা পর্দানশীন মেয়েদের জন্য।' ওরা বললো 'ওখানে গেলে ভাল শুনতে পাব না।' আমি বললাম 'যতটা শুনতে পাবেন তাতেই চলবে। আর একান্তই থাকতে চাইলে শাড়ি-চুড়ি পরে আসতে হবে, নইলে নয়। দেখছেন তো একটিও ছেলে নেই এখানে। পুলিসের চারজন লোক অগত্যা হেসে মাথা নীচু করে বাইরে চলে গেল।

মেয়েদের সভায় স্বভাবতই আমার বক্তৃতায় থাকল দেশের স্বাধীনতা

আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা, মেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, তাছাড়া চলাফেরায় ও ঘরে মেয়েদের অসম্মানকর পর্দাপ্রথা সম্পর্কে বক্তব্য।

ছাত্র আন্দোলনের একটা প্রভাব আমার ওপরে ছিল। তাছাড়া ছাত্রদের সভায় শুধু দেশের স্বাধীনতার কথাই নয়, সমাজতন্ত্রের কথাও আলোচিত হত। সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের পুরোধা ছিলেন তৎকালীন সর্বভারতীয় নাম করা সেরা ছাত্ররাই, তখন দেশের হাওয়ায় সোস্যালিজমের একটা আকর্ষণীয় হাতছানি ছিল। তরুণ সমাজের চোখেমুখে তখন সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও সমাজতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত হবে—এই আকাঙ্ক্ষায় তরুণ মন উদ্বেল ও চঞ্চল। সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সফল্য চুম্বকের মতন এদেশের যুবসমাজকে টানছে। এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে আমরাও বরিশাল থেকে এখানে এসে মিলেছি।

কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত ছাত্রফেডারেশনই তখন ভারতে একমাত্র ছাত্র-সংগঠন। এই ছাত্রফেডারেশনের আন্দোলন একটি কারণে আমার নজর টানত। সেই কারণটি হচ্ছে—ছাত্র ফেডারেশনের মঞ্চে কলেজের মেয়েদেরও যোগদান। আমার দ্বিধাদ্বন্দ্বের কাঁটা এদের পায়ে ফুটত না। পার্টির প্রতি আকৃষ্ট মেয়েরা বাড়ির বাধায় আর ভয় পাচ্ছে না। পরে অবশ্য প্রয়োজনবোধে ছাত্র ফেডারেশনের একটি অঙ্গ হিসাবে পৃথকভাবে ছাত্রী সংগঠনও গড়ে তুলতে হয়েছিল।

কিন্তু আমার জন্য ছাত্র আন্দোলন নয়। আমি আরও কাজ চাই। ছাত্র-সভায় সভানেত্রী হয়ে আর কত দিন কাটাব ?

শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন থেকে আমি অনেক দূরে। আসলে স্বাধীনতার আন্দোলন হচ্ছে না। অথচ মনে মনে এটাই আমি চাইছি। বিলিতী বর্জন, আইন অমান্য আন্দোলন—এসব কি আর হবে না ? তবে স্বাধীনতা আসবে কি করে ? সমাজতন্ত্রের পথই বা খুলবে কিভাবে ? জিজ্ঞাসার আমার অন্ত নেই। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব তখন সংগ্রামী আন্দোলনের সংকোচন চাইছেন।

এই সময়ে বন্দীমুক্তি আন্দোলনের ডাক এল। এটা সম্মিলিতভাবে করার জন্যই পার্টির নির্দেশ ছিল। ভারতের বিপ্লবীরা তখনও জেলে বন্দী আছেন। বাঙলার বিপ্লবীরা আন্দামানে ও অন্যান্য জেলে। রাজনীতিতে এরা কংগ্রেসের সমধর্মী ছিলেন না। গান্ধীজী তাঁদের একেবারেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু চাপে পড়ে এঁদের মুক্তির কথা বলতে হচ্ছিল। তাই দ্বিধা সত্ত্বেও কংগ্রেসকে এই আন্দোলনে আসতে হয়েছিল। অবশেষে জানলাম, এবার আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে একসঙ্গে আন্দোলন করব।

আমি তখন স্কুলে চাকরী করি। ডোভার লেনে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে

কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী মিলে থাকছি। পরের দিকে শ্রীমতী ফুলরেণু গুহও আমাদের সঙ্গে থাকত। সে তখন লেবার পার্টি করত, বামপন্থী। কিন্তু আমরা এ নিয়ে ঝগড়া করতাম না। বরং হাসি ঠাট্টাই করতাম। বেশ সহ-অবস্থান করছিলাম।

মেয়েদের একটা মিটিং হবে গড়িয়াহাটার মোড়ে। বিষয়ঃ বন্দী-মুক্তি। সব পার্টি'র মহিলাসদস্যারা সেখানে আসবেন সংবাদ পেয়ে আমিও গেলাম সভায়। গিয়ে দেখি লাবণ্যদি, বিমলাদি, হেমপ্রভাদি, লীলা রায়, সুধা রায় এবং আরও অনেকে আছেন। ভিড়ের মধ্যে একজন মেয়ে এসে আমার হাতখানা ধরে একটু চাপ দিয়ে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল। আমি তাকে চিনি না। বললো—তুমি মণিকুন্তলা? বললাম—'হ্যাঁ'। ও বললো—'তুমি আমাদের লোক। অর্থাৎ কমিউনিস্ট, আমার কাছে কাছে থেকো। তোমাকে এখানে কিছু বলতে হবে'। সর্বনাশ! বক্তৃতা করব? আমি কি জানি? কি বিষয়ে বলব? গলা শুকোতে লাগল, হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বুকের আওয়াজ নিজের কানে শুনছি। ছাত্রদের মিটিং আর এই মিটিং তো এক নয়।

মেয়েটির নাম জেনে নিলাম। লতিকা সেন। কমিউনিস্ট পার্টিতে আমার প্রথম বন্ধু। কমলাকে দেখলাম। সকলকেই চেনে। এক জায়গায় এক সেকেন্ডও দাঁড়ায় না। লতিকা পরিচয় করিয়ে দিল। বললো 'ও তাই নাকি'। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। সর্বদা যেন ছটফট করছে। লতিকা বললো—'যখন—ভোট হবে আমি যেদিকে দেব—তুমিও সেদিকে দেবে।' তাই-ই দিয়েছিলাম।

লতিকার নির্দেশে মিনিট ২/৪ কি একটু বলেছিলাম, মনেও নেই। এইসব নেত্রীবর্গের সামনে আমার বক্তৃতা করা! ভয়ে ঘেমে গিয়েছিলাম। জানি না আমার বক্তৃতার জন্য কিনা, লীলাদি আমার সম্পর্কে একটু উৎসুক হলেন। ওঁদের বাড়িতে ডাকলেন। শ্রীঅনিল রায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। কথাবার্তায় তিনি বুঝলেন যে, আমার মতে আমি শক্ত। কিন্তু লীলাদি ও রেণুকা সেনের সঙ্গে আমার ভাব ছিল।

সেদিনের সেই মিটিং থেকেই লতিকা আমার বন্ধু। খুবই প্রিয়বন্ধু। কমরেড কথাটা মুখে আসত না। বন্ধু বলতে ভাল লাগে। অমন শান্ত মিষ্টি ও হাসিখুশি মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি। বেশ একটু গভীরতা ও গাম্ভীর্য ওর মধ্যে ছিল। নীরব ধরণের কর্মী। ডোভার লেনে লতিকা আমাদের সঙ্গে কিছুকাল থেকেও ছিল। একসঙ্গে থাকায় ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েছিল। এই প্রিয় বন্ধুকে আমরা হারিয়েছিলাম কিভাবে—তা অন্যত্র বলব।

মহিলাদের সেই মিটিং-এর পরেই আমাদের একটা কর্মী গ্রুপ তৈরি হলো।

তাতে ছিলাম—লতিকা, কমলা, আমি, শান্তি সরকার, চিত্রা ও সতী। এই গ্রুপের নেত্রী ছিল লতিকা। সেই-ই ছিল পার্টির প্রথম মহিলা সদস্যা। আমি ভেবেছিলাম আমরাও সব সদস্য হয়ে গেছি। কিন্তু বহু পরে যখন কার্ড পেলাম তখন জানলাম—আমরা সভ্য হয়েছিলাম ১৯৪২ সনে।

অবাক হয়ে ভাবলাম, এতদিন তবে দুয়োরেই পড়েছিলাম? তাহলে ঐ গ্রুপটা ছিল পার্টির বাইরে? সেটা তো দেখলাম। ভেতরটা তাহলে কি?

গণআন্দোলনের প্রথম প্রোগ্রাম আমরা পেলাম—বন্দীমুক্তির জন্য একটা মস্তবড় মিছিলের আয়োজন করা। তখনকার দিনের একজন ইউনিভার্সিটি ছাত্রী নেত্রীর বাড়িতে একটা স্বেচ্ছাসেবিকা মিটিং করার কথা হলো। সারা সপ্তাহ ধরে আমরা বালিগঞ্জের চেনা-অচেনা কত বাড়ি ঘুরলাম মেয়ে জোগাড় করতে, আমাকে অনেকেই কথা দিয়েছিল আসবে বলে। মিটিংটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মেয়ে যোগাড় না করতে পারলে ভারী বিশ্রী হবে। বিলেত থেকে কে একজন মহিলা এসেছেন তিনি বক্তৃতা করবেন। সুতরাং কারো চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু হায় কপাল, মেয়ে হলো আমাদের নিয়ে জনা দশেক। অর্থাৎ বেশী এল ৪/৫ জন। বক্তা মেয়েটি বসে আছেন; আমি ঘরে ঢুকে বোমার মতো ফাটলাম। এসব মেয়েরা যেন কি। এই তো এখান থেকে এখানে আসা। ফের আবার ডাকতে গেলাম কেউ এল না। বক্তা মেয়েটি বললেন 'থাক তাতে কি হয়েছে, এই দিয়েই শুরু করি।' বক্তার দিকে তাকালাম, বয়সে তো আমার চেয়ে বেশ ছোটই মনে হয়। এই বয়সেই বিলেত ফেরত! খাঁদা খোঁদা মুখখানা, অথচ তারুণ্যের লাবণ্যে ভরা, দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কে এই মেয়েটি? আমাদের বন্ধু না নেতা? কি বলব—তুমি না আপনি? শেষপর্যন্ত মেয়েটিই মীমাংসা করে দিল। ও নিজেই আমাকে মণিদি বলে ডাকল এবং তুমি করে কথা বললো। জেনে নিলাম ওর নাম রেণু। সুবিখ্যাত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ভাইঝি। আশ্চর্যের সীমা রইল না। এইসব ঘর থেকেও ছেলে-মেয়েরা পার্টিতে আসছে! আনন্দ হলো। এই সেই রেণু যে আমার রাজনৈতিক জীবনে একান্ত ঘনিষ্ঠ কর্মী, সহচর ও বন্ধু। আর পার্টি ও বাইরের জীবনে স্বনামখ্যাতা রেণু চক্রবর্তী।

বন্দীমুক্তির মিছিলটা খুব বড়ই হলো। ছাত্রছাত্রীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। যতদূর মনে পড়ে শ্রমিকরাও বেশ বড় সংখ্যায় এসেছিলেন। লীলা রায়, রেণুকা সেন, সুধা রায়—সবাই ছিলেন। আমরা কমিউনিস্ট মেয়েরা তো ছিলামই। খুব ভাল লাগল আমার।

বন্দীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গণসংগঠন গড়ার জন্য আমাদের খুব

আগ্রহ হলো। ছাত্ররাও স্কুলে কলেজে সংগঠিত হচ্ছে। এবার আমাদের মহিলা সংগঠন করতে হবে।

যে ছাত্রীসংগঠনের কথা বলেছিলাম, সেটা সারা ভারতেই রূপ নিয়েছে। এবার লক্ষ্ণৌ ত ওদের সম্মেলন হবে। সারা ভারত থেকে ছাত্রীরা আসবে। রেণু সভানেত্রী হয়ে যাচ্ছে।

শান্তি সরকার এখানকার ছাত্রী। রেণুর সঙ্গে আমি এবং শান্তিও যাচ্ছি। বক্তৃতা করতে মোটেই নয়। কারণ ইংরেজীতে আমি খাটো। কিন্তু বিলেত ফেরত মেয়ে রেণুইতো আছে। এই ছাত্রীসংগঠনের নেত্রী হলো বিশ্বনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী কল্যাণী মুখার্জী। পরে কল্যাণী কুমারমঙ্গলম। বাংলায় তো মোটামুটি সুবক্তা, ইংরেজীতেও মন্দ নয়।

আমাদের তিনজনের জায়গা হলো কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীনির্মল সিদ্ধান্তের বাড়ি। এটা রেণুর জন্যই হলো। এঁরাও ব্রাহ্ম সমাজের লোক। আমার খুব ভালো লাগলো এই ভেবে যে এঁরাও আমাদের আত্মীয়। পরে অবশ্য দেখেছি এই সমাজের বহু শিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধু, সমর্থক ও সদস্য। সম্ভবত ধর্মীয় কুসংস্কারের বাধা এঁদের সমাজে নেই এবং সমাজতন্ত্রেও এদের ভয় নেই। বিষয়টি এঁরা দার্শনিক দিক থেকে বিচার করতে পেরেছিলেন। তাই বহু সুপণ্ডিত ব্যক্তিও পার্টির ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

সম্মেলনে কত মেয়েকে যে নতুন দেখলাম। পেরিন ভারুচা—পার্শী মেয়ে। বিমলা বাকায়া, কমল, মনোরমা, সাটিন, সরলা, শকুন্তলা—এরকম আরো কত অবাঙালী মেয়ে। শীলা ভাটিয়া এবং স্নেহ এদেরও দেখেছিলাম। এদের সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠান আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখেছি। স্নেহকে হীর-রঞ্জা নাটকে খুব ভালো অভিনয় করতে দেখেছি। বিমলা বাকায়ার নেতৃত্বে পাঞ্জাবী মেয়েদের লোকনৃত্য খুব ভালো লেগেছিল। এইসব ছাত্রীনেত্রীরাই তো বিভিন্ন প্রদেশে পরে মহিলা সমিতির সংগঠিকা ও নেত্রী। শুধু তাই নয়, অনেক সময় ছাত্রী অবস্থাতেই এরা মহিলা সমিতি গঠন করতে শুরু করে দিয়েছিল। কারণ শহরে-গ্রামে এই মেয়েরাই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। বলতে গেলে—এরাই নারীসমাজের পুরবর্তিনী। বাঙলাদেশে তো এই নিয়ে টানাটানি লেগে যেত। একটি কর্মী মেয়ে পেলে সে 'ছাত্রী' করবে না 'মহিলা' করবে—এ একটা ভয়ানক দ্বন্দ্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। শেষ পর্যন্ত ওদের একটু বয়স বাড়লে দুটোই করতে হতো।

ছাত্রী সম্মেলনটিকে আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। এই প্রথম আমরা কমিউনিস্ট কর্মীরা সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে পরস্পরকে দেখলাম ও চিনলাম। এই চোখের দেখাই পরবর্তীকালে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে

পরিণত হয়েছিল। ছাত্রীমঞ্চ ছেড়ে এ, আই, ডব্লিউ, সি, মঞ্চে ও মহিলা ফেডারেশন মঞ্চে আমরা একই সংগঠনের কর্মী ছিলাম। সেসব দিনের কথা আজও মনের পর্দায় ভাসে।

[ নবপত্র প্রকাশিত মণিকুন্তলা সেন-এর 'সেদিনের কথা'-র নির্বাচিত অংশবিশেষ ( পৃঃ ৪৬—৫৪ ) তুলে ধরা হল পরিশিষ্ট—৩-এ। কমিউনিজমের আদর্শে দীক্ষিত বাঙলার প্রগতিশীল ছাত্রীরা কিভাবে ছাত্রফেডারেশন-এর পতাকাতলে দাঁড়িয়ে গ্রামে-গঞ্জে স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন মন্ত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন—মণিকুন্তলার এই আত্মজীবনীমূলক ইতিহাসের অংশবিশেষে তারই দলিল চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।—সু. দাশ ]

## সূত্র ও তথ্য নির্দেশ :

১. বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রজ্ঞাভারতী, কলকাতা, ১৩৮৯ (প্রথমপ্রকাশ ১৩২৬), পৃ. ৯৮।

২. কলকাতার নারীশিক্ষার গোড়াপত্তন, সুনীল কুমার লাহিড়ি ; আলোক আসর, বইমেলা সংখ্যা, ১৯৯২ ; পৃ. তেত্রিশ ও সাঁইত্রিশ।

৩. Report on Primary Education 1921, P. 31. এবিষয়ে বিশদ তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য শীলা বসুর নিবন্ধ 'বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষার বিকাশ ১৯০৫-১৯১৯ ; ইতিহাস অনুসন্ধান—৪, পৃঃ ৩৪৭-৩৫৪ (পঃ বঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত )।

৪. সূত্র : প্রাগুক্ত ; পৃ. ৩৫১ ( সারণী—৫ )।

৫-৬. এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য গৌতম নিয়োগী রচিত নিবন্ধ 'জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে বাংলার নারীসমাজ' ; ইতিহাস অনুসন্ধান—৪ ( পঃ বঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত ) ; পৃ. ৩২৫—৩৪৫। এবং, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন ফর উইমেন স্টাডিস-এর তৃতীয় জাতীয় সম্মেলনে পেশ করা ঈশানী মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'উইমেন এ্যাণ্ড আর্মড রেভোলিউশন ইন কালোনিয়াল বেঙ্গল : অ্যান ইনটিগ্রেটেড স্টাডি অব চেঞ্জিং রোল প্যাটার্ন' ( সাইক্লোস্টাইলে বিতরিত )।

৭-৮. 'দীপালি সংঘ' ও 'ছাত্রীসংঘ' প্রসঙ্গে আলোচনার বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য গৌতম নিয়োগী রচিত পূর্বোক্ত নিবন্ধ ( ইতিহাস অনুসন্ধান—৪ )। তবে একটা বিভ্রমের ( হয়তো মুদ্রণ প্রমাদ ) কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন—গৌতম নিয়োগীর নিবন্ধে ( ইতিহাস

অনুসন্ধান—৪ ; পৃ ৩৩১ ) একস্থানে বলা হয়েছে "বিপ্লবী অনিল রায়ের শ্রী সংঘের সঙ্গে দীপালী সংঘের যোগ হয়।" 'শ্রী সংঘ' বলে কিছু অনিল রায় গড়েন নি, গঠন করেছিলেন 'শ্রীসংঘ।' এছাড়াও এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য কমলা দাসগুপ্তের 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী', কলকাতা, ১৩৭০ এবং ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থ ( হেমচন্দ্র ঘোষের ভূমিকা সম্বলিত )।

৯. স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ছাত্রসমাজ, গৌতম চট্টোপাধ্যায় : মনীষা, ১৯৯০, পৃ ২৬-২৭। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই সময়ে বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন বীণা দাস। তিনি তাঁর সহপাঠিনী দত্ত ও শান্তি দাশগুপ্তার সান্নিধ্যে এসে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। 'সাইমন কমিশন' বয়কট আন্দোলনে এঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বেথুন কলেজে। মেয়েদের এই কর্মশালাটির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের শিষ্য ডাঃ ভূপাল বসুর সঙ্গে। ( দ্র. 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থ )।

১০. পঃ বঙ্গ ইতিহাস সংসদ কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে ( ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৯১, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ) অধ্যাপিকা মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়-এর বক্তব্য। প্রয়াত শ্রমিকনেতা মনোরঞ্জন রায় এক নিবন্ধ লিখেছেন, ( শারদ 'নিশান'—১৩৯৭ ) "সূর্য সেন দ্বারা গঠিত চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল তদানীন্তন অন্যান্য বিপ্লবী দলের মতোই দলে কোনো মেয়েকে নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। যুক্তি ছিল, মেয়েদের দলের ভিতরে আনলে দলের ছেলে ও যুবকদের নৈতিক দুর্বলতা ও চিত্ত-বৈকল্য আসতে পারে। তাছাড়া সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন ও অভ্যুত্থানে স্বভাবকোমল মেয়েরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তাই দলের সদস্যদের প্রতি নির্দেশ ছিল—বিপ্লবী সদস্যরা নিজেদের মা ও তেমন শ্রদ্ধেয়া নিকট আত্মীয়া ছাড়া অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা বা কথাবার্তা বলবে না। দলের সবাই দৃঢ় ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে এই নির্দেশ পালন করত।" পরের দিকে অবশ্য মাষ্টার দা-র এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়।

১১. সুজাতা দত্ত ছাড়াও তিরিশের দশকে শ্রীহট্টের 'তরুণ সংঘে' যে সব ছাত্রী নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন, তাঁরা হলেন পরিমল সুধা দাস, সাবিত্রী চৌধুরী, সীতা চৌধুরী, মণিকা মজুমদার প্রমুখ। দ্র. শ্রীহট্টে বিপ্লব-বাদ ও কমিউনিস্ট আন্দোলন : স্মৃতিকথা, চঞ্চল শর্মা ; ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, ১৯৮৪ ; পৃ ৯২।

১২. 'জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে বাংলার নারীসমাজ' ; ইতিহাস অনু-সন্ধান—৪ ( পঃ বঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত ) ; পৃ ৩৩০।

১৩. My Reminisances, Renuka Ray ; Calcutta, 1982 ; P. 16

১৪. 'স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলাদেশে নারী জাগরণ', ভারতী রায় রচিত নিবন্ধ ; ভারত ইতিহাসে নারী, কে. পি. বাগচী প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থ ; পৃ. ৫৭ ।

১৫. My Reminisances' Renuka Ray, Calcutta, '82, PP. 24-30.

১৬. ভারতী রায়ের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত 'দৈনিক বসুমতী', ১০ ডিসেঃ ১৯২১ সালের রিপোর্ট ; 'ভারত ইতিহাসে নারী', কে.পি.বি ; পৃ. ৫৬.

১৭. দ্রঃ কে. পি. বাগচী প্রকাশিত ভারত ইতিহাসে নারী, কলকাতা ।

১৮. বিপ্লবীবাদী রাজনীতির উপর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে ঘটনাগুলি সংগৃহীত। তবে এইবিষয়ে বিশেষ আলোচনা রয়েছে ঈশানী মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত গবেষণা পত্র 'উইমেন এন্ড আর্মড রেভোলিউশন ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল : অ্যান ইন্টিগ্রেটেড স্টাডি অব চেঞ্জিং রোল প্যাটার্ন' প্রবন্ধে।

১৯. Bengal's Turbulent years : 1905—1940, Amarendra Nath Ray, Calcutta, 1989 ; P, 142.

২০. 'বেণু' ও 'চলার পথে' সাহিত্য-পত্র দুটি সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থটি থেকে ।

২১. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজরা ক্যাম্পাসে পঃ বঙ্গ ইতিহাস সংসদ আয়োজিত সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণ ( ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৯১ ) ।

২২. স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, কমলা দাশগুপ্ত, কলকাতা, ১৩৭০ দ্রষ্টব্য ।

২৩. 'জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে বাংলার নারীসমাজ', গৌতম নিয়োগী, ইতিহাস অনুসন্ধান—৪, পঃ বঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত, পৃ. ৩৪০ ।

২৪. দ্র. দ্য বেঙ্গল পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট, 'টেররিজম ইন বেঙ্গল', ১৯৩১, পৃ. ৪৬.

২৫. অমৃতবাজার পত্রিকা, ২১ জানুয়ারি, ১৯২১ ।

২৬. দ্র. মহাত্মা, ডি. জি. তেন্ডুলকর, পাবলিকেশনস্ ডিভিশন, ভল্যুঃ ২

২৭. স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ছাত্রসমাজ, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, মনীষা ; পৃ. ২৭-২৮ ।

২৮. ঐ ; পৃ. ৩০ ।

২৯. আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, মনীষা, পৃ. ১৩৯ ।

৩০. অ্যান অটোবায়োগ্রাফি, জওহরলাল নেহরু ; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দ্রষ্টব্য ।

৩১. বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, মোহাম্মদ হান্নান, গ্রন্থলোক, ঢাকা, পৃ ১১-১২।
৩২. 'কমিউনিস্ট হলাম', বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, মে, ১৯৭৬ (গৌতম চট্টোপাধ্যায় রচিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩০ দ্রষ্টব্য)।
৩৩. বেঙ্গলস্ টারবুলেন্ট ইয়ার্স: ১৯০৫-১৯৪০, অমরেন্দ্রনাথ রায়, পৃ ১৪২।
৩৪. বিশ্বনাথ মুখার্জি, ছাত্রফেডারেশনের ৪০ বছর পূর্তিজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত স্মৃতিচারণ 'ছাত্রফেডারেশনের গোড়ার যুগে।'
৩৫. গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ; মনীষা, পৃ ৩৬।
৩৬. গীতা মুখার্জির সাক্ষাৎকার; ছাত্র-অভিযান, ১৯তম রাজ্যসম্মেলন (বি, পি, এস, এফ,) নৈহাটি, বিশেষ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।
৩৭. ছাত্র ফেডারেশন-এর ৪০ বছর পূর্তি জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত বিশ্বনাথ মুখার্জির পূর্বোক্ত স্মৃতিচারণ।
৩৮. কমলা চ্যাটার্জির সাক্ষাৎকার। দ্র. 'কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলার মেয়েরা', গীতা মুখার্জি; কালান্তর, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ৪০ বছর পূর্তি বিশেষ সংখ্যা।
৩৯. ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা, রেণু চক্রবর্তী; মনীষা, পৃ ৮-৯
৪০. ঐ; ৯-১০। ৪১. ঐ।
৪২. কনক মুখার্জির সাক্ষাৎকার, 'ছাত্রীদের সংগঠন ও আন্দোলন', সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি স্মারকগ্রন্থ, ভারতের ছাত্রফেডারেশন, পঃ বঙ্গ রাজ্য কমিটি প্রকাশিত, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, কলকাতা, ১৯৮৬; পৃঃ ৯৬।
৪৩. ছাত্র ফেডারেশন-এর ৪০ বছর পূর্তি জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থে মৃণালিনী দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার।
৪৪. গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখিত নিবন্ধ 'বাঙলার সংগ্রামী ছাত্র আন্দোলনে কমিউনিস্ট পাটির অবদান,' 'কমিউনিস্ট' পার্টির অর্ধশতক পূর্তি স্মারকগ্রন্থ, ১৯৭৫, পৃ ১২৪।
৪৫. দ্র. বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত স্মৃতিকথা—'ছাত্রফেডারেশনের গোড়ার যুগে,' ছাত্রফেডারেশন, ৪০ বছর পূর্তি স্মারকগ্রন্থ, ১৯৭৬।
৪৬. দ্র. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা—১ম খণ্ড, সরোজ মুখার্জি, কলকাতা, ১৯৮৫; পৃ ২৭১-২৭৬
৪৭. দ্র. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, নভেঃ ১৯৮৯, কলকাতা।

৪৮. চট্টগ্রামের তৎকালীন ও বর্তমানে পঃ বঙ্গের বিশিষ্ট মহিলা নেত্রী জ্যোতি দেবী ( দাশ )-র প্রদত্ত সাক্ষাৎকার ; ২১ জুন, ১৯৯২।

৪৯. প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিবন্ধ লেখকের ব্যক্তিগত কথোপকথনে এ বিষয়ে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ; ১৮ মে, ১৯৯২।

৫০-৫১. স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ছাত্রসমাজ, গৌতম চট্টোপাধ্যায় ; পৃঃ ৪৮।

৫২. অমৃতবাজার পত্রিকা, ১১ আগস্ট, ১৯৪২।

৫৩. অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৬-১৭ আগস্ট, ১৯৪২।

৫৪. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি, জ্ঞান চক্রবর্তী ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬ ; পৃ ৬৭।

৫৫. স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ছাত্রসমাজ, গৌতম চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৫৮ ৫৯।

৫৬. ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা, রেণু চক্রবর্তী ; পৃ ১৪-১৫।

৫৭. ওয়াই. সি. আই. বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সুস্নাত দাশের নিবন্ধ 'চল্লিশের দশকের একটি যুব-সাংস্কৃতিক আন্দোলন' ; সমাজ-সমীক্ষা, পঞ্চমবর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯০ ( ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর মুখপত্র )।

৫৮. 'নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা', কনক মুখোপাধ্যায় ; একসাথে কার্তিক, ১৩৯৪, পৃ ১১।

৫৯. তদেব, পৃ ৯-১০।

৬০. জনযুদ্ধ, ১ মে, ১৯৪২।

৬১. 'নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা', কনক মুখোপাধ্যায় ; একসাথে, শ্রাবণ, ১৩৯৪ ; পৃ ১৩।

৬২. দ্র. ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা, রেণু চক্রবর্তী ; পৃ ১৫-২১।

৬৩. জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, 'আমাদের নবজীবনের গান', কমিউনিস্ট পার্টির অর্ধশতক পূর্তি স্মারকপত্র, ১৯৭৬ দ্রষ্টব্য।

৬৪. রেণু চক্রবর্তীর পূর্বোক্ত গ্রন্থ ; পৃ ২৮-২৯।

৬৫. অলকা মজুমদারের ( চট্টোপাধ্যায় ) নিবন্ধ 'তিন দশক আগে' ; ছাত্র ফেডারেশনের ৪০ বছর পূর্তি উৎসব স্মারক সংখ্যা, ১৯৭৬, দ্রষ্টব্য।

৬৬. 'তোমাদের স্মরি' ( শহীদ-তালিকা ) থেকে উদ্ধৃত ; কল্লোল বিশেষ সংখ্যা, ১৯৬৬

৬৭. দ্র. রেণু চক্রবর্তীর পূর্বোক্ত গ্রন্থ।
৬৮. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, ১ম খণ্ড; সরোজ মুখোপাধ্যায়; পৃ ২৪৬।
৬৯. ভারতীয় নারী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট মেয়েরা, রেণু চক্রবর্তী; পৃ ৩৭।
৭০. সেদিনের কথা, মণিকুন্তলা সেন; নবপত্র, কলিকাতা, ১৯৮২; পৃষ্ঠাসমূহ: ৭৬-৭৭, ১০১, ১০৩-০৪, ১২৪, ১২৯-৩০, ১৩৩, ১৩৯ উদ্ধৃত। সেদিনকার অন্যতমা মহিলা নেত্রী মণিকুন্তলা সেন যাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: "আমাদের যেমন মহিলাদের সমস্ত ফ্রন্টের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হতো তেমনি আমরা চাইতাম—ছাত্রীরাও মহিলা ফ্রন্টের কাজে সহযোগী হোক। তাছাড়া ছাত্রীরা তো ছিল নারী সমাজের সামনের সারিতে। তাই এই সমাজের অগ্রগতিতেও ছাত্রীরা নেতৃত্ব দেবে।"—'সেদিনের কথা': পৃ ৯৭।
৭১. স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ছাত্রসমাজ, গৌতম চট্টোপাধ্যায়; পৃ ৬১।
৭২. তদেব; পৃ ৬৩।
৭৩. বিশ্বভারতীর নৃতত্ত্ববিভাগের বর্তমান অধ্যাপক ও তৎকালীন ছাত্রনেতা বিনয় ভট্টাচার্যর সঙ্গে সাক্ষাৎকার; জুন, ১৯৯২।
৭৪. 'স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামে ছাত্রফেডারেশনের ভূমিকা'; গীতা মুখার্জি, ছাত্রফেডারেশন-এর ৪০ বছর পূর্তি বিশেষ সংখ্যা; কলকাতা-১৯।
৭৫. অমৃতবাজার পত্রিকা, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬।
৭৬. দ্র. উত্তাল চল্লিশ: অসমাপ্ত বিপ্লব, অমলেন্দু সেনগুপ্ত, পার্ল-পাবলিশার্স, পৃ ৫৩-৬৭; গীতা মুখার্জির নিবন্ধ ছাত্রফেডারশন-এর ৪০ বছর পূর্তি স্মারক সংখ্যায় প্রকাশিত এবং অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।
৭৭. গৌতম ঘোষ গৃহীত গীতা মুখার্জির সাক্ষাৎকার; ছাত্র-অভিযান, বিশেষ সংখ্যা, বি. পি. এস. এফের ১৯তম রাজ্য সম্মেলন (নৈহাটি) উপলক্ষে প্রকাশিত।
৭৮. রেণু চক্রবর্তীর পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ ৮৩।
৭৯. সেদিনের কথা, মণিকুন্তলা সেন; পৃ ১৬৬-৬৭।
৮০. গীতা মুখার্জির পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকার, ছাত্র-অভিযান বিশেষ সংখ্যা।
৮১. গীতা মুখার্জির পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকার, ছাত্র অভিযান, এবং সাক্ষাৎকার; ভারতের ছাত্রফেডারেশন, পঃ বঙ্গ রাজ্যকমিটি প্রকাশিত—সংগঠিত

ছাত্র আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার ; পৃ: ১০০ দ্রষ্টব্য।

৮২. কলকাতা : পাল্কি থেকে ভিয়েতনাম, অঞ্জন বেরা, কলকাতা, ১৯৯১ ; পৃ: ১৮০।

৮৩. দ্র. অমৃতবাজার পত্রিকা, ২২ জানুয়ারি, ১৯৪৭।

৮৪. এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য অঞ্জন বেরার পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৮৫. গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ ; পৃ: ৮৩

৮৬. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, ২য় খণ্ড ; সরোজ মুখোপাধ্যায় ; পৃ: ৪১৩।

৮৯. সরোজ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২য় খণ্ড ; পৃ: ৪৪১ দ্রষ্টব্য।

৯০. বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, মোহাম্মদ হাননান, ঢাকা, পৃ: ৩৫।

পরিশিষ্ট-১. কল্পনা দত্ত (যোশী)-র একটি পূর্ব প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ।

পরিশিষ্ট-২. সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের স্মৃতিকথার ('আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা') অংশবিশেষ।

পরিশিষ্ট-৩. মণিকুন্তলা সেন-এর স্মৃতিকথার ('সেদিনের কথা') অংশবিশেষ।

# বাংলার মুসলমান ছাত্র আন্দোলন (১৯১২-৪৬)

## চণ্ডীপ্রসাদ সরকার

## ১

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই বাংলার হিন্দু অধিবাসীরাই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে শুরু করলেও স্বধর্ম থেকে পতিত হবার ভয়ে বাংলার মুসলমানরা সে সময় ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করেননি। ১৮১৭-এ কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও তার দরজা মুসলমান ছাত্রদের জন্য বন্ধ ছিল।[১] ক্যালকাটা মাদ্রাসাই ছিল মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষালাভের প্রধান কেন্দ্র। মাদ্রাসার পরিচালকরা ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব তখনও উপলব্ধি করেন নি। এমন কি মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষার প্রতিও ছিল তাঁদের অনাগ্রহ, যদিও ঐ মাদ্রাসার বেশীর ভাগ ছাত্রই ছিলেন পূর্ববংগের।[২] আরবি-ফারসী ভাষার মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষাদানকেই তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অন্যদিকে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ইংরেজির মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণের সাথে সাথে মাতৃভাষার চর্চাও শুরু করেছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা মাদ্রাসার ইংরেজি বিভাগ খোলা হলেও অবস্থার বিশেষ কোন তারতম্য ঘটেনি।

সাধারণ ভাবে মনে করা হয় আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমেই, বিশেষ করে ১৮৭৫-এ আলীগড়ে এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপিত হলে মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের সুযোগ গ্রহণ করে আধুনিক যুগে পদার্পন করেন। কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের ক্ষেত্রে কথাটি তেমন খাটে না। কারণ তার অনেক আগে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মৌলভী আবদুল লতিফ কলকাতায় মহামেডান লিটারারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের জন্য আধুনিকতার দরজা খুলে দিয়েছিলেন। আলীগড় আন্দোলনের অনেক আগেই বাংলার মুসলমানদের আধুনিক যুগে প্রবেশের সুযোগ লাভ মনে হয় ঐতিহাসিক দিক থেকে অনিবার্যই ছিল। কারণ আলীগড় ছিল বৃটিশ ভারতের প্রাণ-চাঞ্চল্যময় মেট্রোপলিটন কলকাতা থেকে বহু দূরে অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্ভূমিতে অবস্থিত একটি মফঃস্বল শহর, যার আশেপাশে মোগলযুগের হাতছানি যেন সদা বিরাজমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর ভারতের মুসলমানদের আধুনিক যুগে প্রবেশ বিলম্বিত হওয়াই স্বাভাবিক। অপরদিকে বৃহত্তর কলকাতার সমৃদ্ধশ্রেণীর বাঙালী মুসলমানরা,

বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন প্রগতিমুখী, তাঁরা বাঙালী হিন্দুর পুনর্জাগরণে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। স্বভাবতই তাঁদের নেতৃস্থানীয় মৌলভী আবদুল লতিফ এবং তাঁর সহকর্মীরা স্বধর্মীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের উদ্যোগ অনেক আগেই গ্রহণে অগ্রসর হয়েছিলেন। সেই কারণেই ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা মাদ্রাসার পুনর্গঠনের কথা যখন উত্থাপিত হয়, তখন আবদুল লতিফ ফার্সী ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাতেও মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।[৪] ইতিমধ্যে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের কলেজবিভাগকে প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।[৫] ১৮৭০-এর দশকে প্রেসিডেন্সী কলেজের নূতন গৃহ নির্মিত হবার পর আবদুল লতিফের চেষ্টায় মুসলমান ছাত্ররা ঐ কলেজে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন।[৬] ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ লক্ষ্য করে তিনি ক্যালকাটা মাদ্রাসার ইংরেজি ফার্সী বিভাগকেও উন্নত করে একটি পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করার সুপারিশও করেছিলেন।[৭]

(২)

এসব সত্ত্বেও বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। ১৯০৫ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩০২১ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ১৮৮ জন ছিলেন মুসলমান ছাত্র।[৮] ১৯১১-এ ম্যাট্রিক পাশ ছাত্রদের সংখ্যা ছিল ৪৩৪১ জন, তার মধ্যে পূর্ববংগের ছিল ১৭৪ জন।[৯] ইংরেজি শিক্ষায় বাঙালী হিন্দুর তুলনায় পশ্চাদ্‌পদ মুসলমান ছাত্ররা স্বভাবতই শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেছিলেন। এই প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা তাদেরকে এদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেওয়া থেকে বিরত রেখেছিল। ইংরেজি শিক্ষায় মুসলমানদের অনীহা তাঁদেরকে শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় পশ্চাদ্‌পদ করেই রেখেছিল। বেশীর ভাগ বাঙালী মুসলমান ছাত্ররা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাঙলা ভাষার পক্ষপাতী হলেও প্যান ইসলামে আশ্রয় খোঁজার প্রবণতায় তাদের অভিভাবকরা ঐ ভাষাকে সংস্কৃত প্রভাব মুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন। বাঙালী হিন্দুরা কিন্তু বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রভাব বজায় রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন। মুসলিম পশ্চাৎপদতার ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বেশ দৃঢ়মূলই ছিল। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্বস্তরে হিন্দুদের এই প্রাধান্যকেই বাঙালী মুসলমানরা তাঁদের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা হিসাবে মনে করেছিলেন।[১০] এই পরিপ্রেক্ষিতেই বাঙলার মুসলমান ছাত্রদের অধিকাংশকেই কেবলমাত্র সম্প্রদায়-

গত চিন্তাভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শুরুতে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হবার পর থেকে বাঙলার শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যকার একটি অংশ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির সংগে সহযোগিতার পরিবর্তে ধীরে ধীরে হলেও ক্রমশঃই সরকার-বিরোধী মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেছিলো। ভারতবর্ষের বাইরে বলকান যুদ্ধে (১৯১২, অক্টোবর) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তুর্কী সুলতান-(যিনি ছিলেন আবার মুসলমান জগতে খলিফা বা ধর্মীয় প্রধান)-বিরোধি অবস্থান তাঁদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ভারতবর্ষের ভিতরে স্বদেশী আন্দোলনের চাপে পড়ে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করা থেকে (১৯১১, ডিসেম্বর) তাঁরা বুঝেছিলেন ইংরেজ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির প্রয়োজন আছে কারণ তারা জোরদার চাপের কাছে নতি স্বীকার করে। ১৯১৩-র কানপুর মসজিদ সংক্রান্ত ঘটনা তাঁদের সরকার বিরোধী অবস্থানকে আরও দৃঢ় করে তুলেছিল। ক্রমশঃই তাদের মধ্যে অস্থিরতা ও উত্তেজনা বেশ লক্ষণীয় হয়ে উঠতে থাকে। বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি আধুনিক গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ তাদের মধ্যে দেখা দিতে থাকে।[১১]

এই প্রেক্ষাপটেই বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মুসলমান ছাত্ররা তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধানের দাবীতে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁরা ১৯১২-র জুলাই এর মাঝামাঝি 'মুসলমান ছাত্ররা যাদের কলকাতার কলেজে ও হোস্টেলে ভর্তি হতে দেওয়া হয়নি তাদের প্রতিবেদন' -এই শিরোনামায় একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তিকায় ক্যালকাটা মাদ্রাসাকে একটি প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করার দাবী নূতন করে আবার করা হয়। ১৯০৯ সালে এই দাবী করা হলেও তখন পর্যন্ত তা পূর্ণ না করায় ঐ পুস্তিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। ঐ পুস্তিকায় আরও অভিযোগ করা হয় যে ঐ বছরেই (অর্থাৎ ১৯১২-তে) গ্রামবাংলার বিভিন্ন জেলাগুলি থেকে আসা কমপক্ষে ১৪৩ জন মুসলমান ছাত্রকে কলকাতার কলেজে ও হোস্টেলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সাক্ষরদাতা ছাত্ররা তাদের ঐসব অভিযোগের তাৎক্ষণিক মীমাংসা দাবী করে।[১২]

বলা বাহুল্য, শিক্ষিত মহলে, বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলমান মহলে ঐ পুস্তিকা যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। প্রাদেশিক মহমেডান এডুকেশন কনফারেন্সের সাধারণ সম্পাদক ক্যালকাটা মাদ্রাসায় কলেজীয় বিভাগ খুলে ক্লাস শুরু করার দাবী জানিয়ে শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তাকে পত্র লেখেন।[১৩] 'দি মুসলমান' পত্রিকার ১৯শে জুলাই সংখ্যায় ঐ সব অভিযোগের প্রতিকার দাবী করে সম্পাদকীয় লেখা হয়। বিশেষ করে মফঃস্বল থেকে আসা মুসলমান ছাত্রদের ভর্তি সমস্যা সমাধানের জন্য একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ খোলার

দাবীকে জোরালো সমর্থন জানানো হয় ঐ সম্পাদকীয়তে।[১৪] ক্রমে কলকাতা মাদ্রাসায় কলেজ ক্লাসগুলি চালু করার দাবী বেশ জোরালো হয়ে উঠে। ইতিপূর্বে ঢাকায় মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠারও দাবী করা হয়।[১৫]

ঐ সময়ে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, অস্বস্তিকর এবং অপমানজনক পরিবেশের মধ্যে মেসে থেকে মুসলমান ছাত্ররা পড়াশুনা করতে বাধ্য হত।[১৬] ভদ্র পল্লীতে তাদের বসবাসের কোন সুযোগই ছিল না। স্বভাবতই মুসলমান ছাত্রদের জন্য পৃথক সরকারী হোস্টেলের দাবীতে কলকাতায় বসবাসকারী মফঃস্বলের মুসলমান ছাত্ররা বেশ সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। ছাত্রদের ঐ দাবীকেও 'দি মুসলমান' পত্রিকা, মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সমর্থন জানিয়েছিল।[১৭] এমন কি বাংলার লাট কাউন্সিলে নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধি জনাব ফজলুল হক এবং বর্ধমানের মৌলভী আবুল কাশেম মুসলমান ছাত্রদের দাবীর সমর্থনে জোরালো বক্তব্য রাখেন।[১৮]

কলকাতায় বসবাসকারী মুসলমান ছাত্ররা তাঁদের দাবীর সমর্থনে জনমত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং সেই সংগে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে ১৯১২র সেপ্টেম্বরে কলকাতায় মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে বিরাট জনসভার আয়োজন করেন।[১৯] সভা বিশেষ ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় এই সময় থেকেই বাংলার মুসলমান ছাত্ররা নিজেদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করে। এর ফলে মফঃস্বল থেকে আগত মুসলমান ছাত্রদের কলেজে ভর্তি, থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত ইত্যাদি সংগঠিত করা সহজ হবে বলে তাঁদের মনে হয়। সে সময় সরকারী কলেজে বেতন কম থাকায় এবং বেসরকারী কলেজে আরবী-ফার্সী শিক্ষার খুবই অল্প সুযোগ থাকায় মুসলমান ছাত্ররা সরকারী কলেজে ভর্তি হওয়া পছন্দ করতো। স্বভাবতই সরকারী কলেজে ভর্তি হতে না পারলে তারা খুবই হতাশ বোধ করত। অনেকেরই এর ফলে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ আর সম্ভবও হত না। ১৯১৪র একটি সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, প্রতি ১০,০০০ মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে মাত্র একজন স্কুল স্তর থেকে কলেজস্তরে উন্নীত হত।[২০] 'দি মুসলমান' পত্রিকা মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা-বিস্তারের সাহায্যার্থে মুসলমান ছাত্রদের জন্য আনুপাতিক সরকারী অনুদান দাবী করলে মুসলমান ছাত্র আন্দোলনে এক নূতন মাত্রা সংযোজিত হয়।[২১] মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা সংক্রান্ত ক্রমবর্ধমান আন্দোলন শীঘ্রই একটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। ১৯১৬র ৩রা সেপ্টেম্বর কলকাতায় বেঙ্গল মহামেডান কলেজ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম বাৎসরিকসম্মেলন অনুষ্ঠিত

হয়। ঐ সম্মেলন থেকে মৌলভী আজিজুল হক বি এ. বি. এল কে ঐ সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়।[২২]

লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবার ফলে মুসলমান ছাত্ররা তাদের বিভিন্ন দাবীর কিছু কিছু সুরাহা করতে পেরেছিলেন। সরকার মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা খতিয়ে দেখার জন্য হরনেল কমিটি গঠন করে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার করা বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য ঐ কমিটিকে নির্দেশ দেয়। 'হরনেল কমিটি' মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের তৎকালীন বাধাগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলি সমাধানে দুটি উল্লেখ্য সুপারিশ করেছিলেন। (১) মুসলমানদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রদান ব্যবস্থার অবসান করার এবং (২) ইংরেজি শিক্ষায় পশ্চাদপদ ঐ সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা প্রদান ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের কথা বলা হয়েছিল। সরকার ঐ সুপারিশগুলি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করায় এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষাশেষি মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পেতে থাকে। (১) ১৯১৪-১৫তে আর্টস কলেজে মুসলমান ছাত্রদের মোট সংখ্যা ছিল ১১৫৪ জন। ১৯১৮-১৯এ তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০৭৮এ দাঁড়ায় (২) সরকারী উদ্যোগে কলকাতার ওয়েলেসলি স্ট্রীটে মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি সরকারী হোস্টেল (ইলিয়ট হোস্টেল) স্থাপিত হয় (৩) মুসলিম ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ তহবিলের ব্যবস্থা হয় (৪) মহসিন-তহবিলকে কেবলমাত্র মুসলমান ছাত্রদের স্কলারসিপ ও স্টাইপেন্ড দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। (৫) সর্বসাধারণের ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট তহবিল থেকে সরকারী মাদ্রাসা পরিচালন ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়। (৬) মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে একটি সহকারী শিক্ষা অধিকর্তার পদ সৃষ্টি করা হয়। (৭) প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান জেলায় মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য সহকারী বিদ্যালয়-পরিদর্শক পদ সৃষ্টি করা হয়। (৮) বেকার হোস্টেলের আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। (৯) সরকারী অনুদান পাবার পূর্বশর্ত হিসাবে বেসরকারী কলেজ ও হোস্টেলে শতকরা ২০ ভাগ আসন মুসলমান ছাত্রদের জন্য রিজার্ভ রাখার ব্যবস্থা হয়। (১০) কেবলমাত্র মুসলমান ছাত্রদের জন্য আর্টস কলেজ খোলার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কলকাতা মাদ্রাসার এ্যাংলো-পারসিয়ান বিভাগের জন্য পৃথক জমির বন্দোবস্ত করা হয়।[২৩]

( ৩ )

ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হয়েছে। যুদ্ধ চলাকালীন প্যান-ইসলাম কার্যকলাপের সংগে জড়িত থাকার অভিযোগে সারা ভারতব্যাপী অসংখ্য মুসলমান নেতৃবৃন্দের সংগে আবুল কালাম আজাদকেও অন্তরীণ করে

রাখা হয়। অন্তরীণ থেকে বেরিয়ে এসে আবুল কালাম আজাদ নিউ মহামেডান রিভোলিউশনারি পার্টি[24] বলে একটি গোপন বিপ্লবী দল গঠন করে এদেশে হিজবোল্লা[25] আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যায় আফগানিস্তানের কাবুলে প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী স্বাধীন ভারতীয় সরকারের সংগে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। বেশ কয়েকজন কলেজ ও উচ্চ মাদ্রাসার বাঙালী মুসলমান ছাত্র এবং সদ্য পাঠ সমাপ্ত তরুণ, আজাদের বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হন। কুমিল্লার ফজল-উল হক সেলবর্সি, খুলনার সৈয়দ জালালুদ্দীন আহম্মদ, ২৪ পরগণার হাকিমপুর নিবাসী আবদুর রেজ্জাক খান (পরবর্তীকালে এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক), কলকাতার কুতুবুদ্দীন আহমেদ (পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহমদের ঘনিষ্ট সহকর্মী) মুনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী প্রমুখের নাম আজাদের সহযোগী হিসাবে সরকারী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা আছে। ১৯২১ এ এঁদেরই অন্যতম সদ্য পাঠসমাপ্তকারী তরুণ ফজলউল হক সেলবর্সিকে আজাদ একটি পরিচয় পত্র সহ কাবুলের অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের সংগে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য পাঠান। সেলবর্সি পথে ধরা পড়েন।

আজাদের বিপ্লবী দলের সদস্যদেরকেও হিন্দু বিপ্লবীদের মত জীবন উৎসর্গের শপথ নিতে হত। মুরারীপুকুরের বাগানবাড়ীতে হিন্দু বিপ্লবী যুব ছাত্ররা যেমন একহাতে গীতা অপর হাতে পিস্তল নিয়ে কালীমূর্তির সামনে শপথ গ্রহণ করতেন, মুসলমান ছাত্র যুবকদেরও তেমনি খিদিরপুরের কবরস্থানে একহাতে কোরান এবং আর এক হাতে পিস্তল স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করতে হ'ত।[26]

(৪)

প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হলে তুর্কী সুলতান যিনি ছিলেন মুসলিম জাহানের খলিফা বা ধর্মীয় প্রধান, তাঁর ভবিষ্যৎ এবং মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম তীর্থস্থানগুলির পবিত্রতা রক্ষা সম্পর্কে সারা মুসলিম দুনিয়ার দুশ্চিন্তার ছায়া নেমে আসে। তুর্কী সুলতানের যথাযথ মর্যাদা এবং মুসলিম তীর্থস্থানগুলির পবিত্রতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের মুসলমানরা সারাভারত খিলাফৎ কমিটি গঠন করে ১৯১৯-এর মার্চে খিলাফৎ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ উপলক্ষ্যে এদেশের ব্রিটিশ সরকার সাড়ম্বরে শান্তি উৎসব পালনে উদ্যোগী হন। বাংলার খিলাফৎ কমিটি সরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শান্তি উৎসব বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শান্তি উৎসব বয়কটে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন গ্রাম বাংলার মুসলমান

ছাত্ররা। শান্তি উৎসব পালনের সরকারী দিন ধার্য হয়েছিল ১৯১৯-এর ১২ই ডিসেম্বর। সাম্প্রতিককালে কেনেথ ম্যাকফারসন বলেছেন, সরকার যে রকম পরিকল্পনা করেছিলেন সেই মতই শান্তি উৎসব উদযাপিত হয়েছিল এবং শান্তি উৎসব বিরোধীরা গ্রাম বাংলায় ব্যর্থ হয়েছিলেন।[২৭] কিন্তু সরকারী প্রতিবেদন থেকেই জানা যায় মুসলমান ছাত্ররা হিন্দু ছাত্রদের সহযোগিতায় বাংলার প্রায় সর্বত্রই সরকারী প্রয়াস বানচাল করে দেন। বরিশাল, চাঁদপুর, রামগঞ্জের মুসলমান ছাত্ররা উৎসব সজ্জা ভেঙ্গে তছনছ করেন এবং ইউনিয়ন জ্যাক টেনে নামিয়ে দেন। মুসলমান অধ্যুষিত নোয়াখালির চাটখিল হাইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বিতরণের জন্য আনা মিষ্টি ছাত্ররা ছুঁড়ে ফেলে দেন। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ, লালগোলা, কান্দী প্রভৃতি স্থানের স্থানীয় শান্তি কমিটি ছাত্রদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করতে এলে মুসলমান ছাত্ররা হিন্দু ছাত্রদের সংগে একসাথে ঐ মিষ্টি গ্রহণে অস্বীকার করেন। বাঁকুড়ায় স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শান্তি উৎসবে যোগদান 'হারাম' এই শিরোনামায় খিলাফৎ কমিটির হ্যাণ্ডবিল পাঠ করে শুনালে ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধভাবে সেদিন তাদের ক্লাস বয়কট করেন। চট্টগ্রামেও শান্তি উৎসব পালনে সকল সরকারী প্রচেষ্টাই ছাত্ররা ব্যর্থ করে দেন।[২৭এ]

(৫)

১৯২০-২২ এর সর্বভারতীয় খিলাফৎ-অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্রদের জন্য বিশেষ কর্মসূচী করা হয়েছিল। তা হচ্ছে সরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বয়কট করা। ছাত্ররা, কি হিন্দু কি মুসলমান, সরকারী এবং বেসরকারী উভয় প্রকারের স্কুল কলেজই বয়কট করেছিলেন বিরাট ভাবে। বাংলায় ঠিক কত সংখ্যক মুসলমান ছাত্র এই প্রথম সর্বভারতীয় গণ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন সরকারী প্রতিবেদন থেকে পৃথকভাবে সেই পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। কিন্তু মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলি সম্পর্কে সরকারী প্রতিবেদন এবং সমকালীন পত্র-পত্রিকা এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করে।

সরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা বয়কটে চট্টগ্রাম বিভাগের মুসলমান ছাত্ররা অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২০র ৮ই নভেম্বর থেকে চট্টগ্রাম কলেজ এবং স্থানীয় মুসলিম হাইস্কুলের ছাত্ররা ধর্মঘট ও ক্লাশ বয়কট কর্মসূচীতে ব্যাপক আকারে অংশ গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচী গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরও বেশ কিছুদিন চলেছিল। এন সি বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি চারণা থেকে জানা যায় চট্টগ্রাম ছিল বিশেষ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। সেখানে অসহযোগ আন্দোলন যে প্রচণ্ড তীব্রতা লাভ করেছিল তার প্রভাব সরকারী বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার

পড়েছিল। সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কটের কর্মসূচী প্রায় সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল।[২৮] চট্টগ্রাম বিভাগকে অনুসরণ করে পূর্ববাংলার ঢাকা, নোয়াখালী, কুমিল্লা মৈমনসিংহ, রংপুর, পশ্চিম বাংলার হাওড়া, হুগলী, খড়্গপুর সর্বত্রই বয়কট আন্দোলন দারুনভাবে সফল হয়েছিল।[২৯]

একটি বেসরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে একমাত্র রাজশাহী বিভাগেই প্রায় ২২000 মুসলমান ছাত্র "সরকারী গোলামখানা" ত্যাগ করেন।[৩০] ১৯২৩ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী প্রতিবেদনেও স্বীকার করা হয়েছিল কয়েকটি প্রধান প্রধান কেন্দ্রে বয়কট আন্দোলনে বেশ ভাল সাড়া ("Impressive Response") দেখা গেছে।[৩১] বস্তুত, ১৯২০ র নভেম্বর মাসে যে ছাত্র ধর্মঘট ও সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বয়কট আন্দোলন শুরু হয়েছিল সরকারী প্রতিবেদন অনুসারে তা ছিল প্রধানত মুসলমান ছাত্র ধর্মঘট ও বয়কট।[৩২]

স্বদেশী আন্দোলনের যুগের বাঙালী হিন্দু ছাত্রদের মত অসহযোগ খিলাফৎ আন্দোলনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কটের পাশাপাশি ন্যাশনাল স্কুল বা 'জাতীয়' বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার এবং 'জাতীয় শিক্ষা' গ্রহণের কর্মসূচীতে হিন্দু ছাত্রদের পাশাপাশি মুসলমান ছাত্ররাও অংশগ্রহণ করেন। কলকাতায় ১৯২০র ৫ই নভেম্বর চীৎপুরের বিখ্যাত নাখোদা মসজিদে জাতীয় মাদ্রাসার উদ্বোধন হলে কলকাতার মুসলমান ছাত্ররা দলে দলে সেখানে ভর্তি হন। মৈমনসিং জেলার কারাতিয়ার হাফিজ মহম্মদ আলী ইনস্টিটিউট একটি জাতীয় বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল।[৩৪] ঐ জেলায় বেইলুর বাজারে একটি জাতীয় বিদ্যালয় খোলা হয়। আবুল মনসুর আহমেদ এবং আবুল কালাম সামসুদ্দিন ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হলে ঐ বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্ররা বিরাট সংখ্যায় ভর্তি হন।[৩৫] এই ধরনের জাতীয় বিদ্যালয় হুগলীর ফুরফুরায়[৩৬], চট্টগ্রামে[৩৭] ও ঢাকায়ও[৩৮] স্থাপিত হয়েছিল। মুসলমান ছাত্ররা ঐ সব বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে 'জাতীয় শিক্ষা' গ্রহণ করতে থাকেন। এই প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত ব্রজযোগিনী জাতীয় বিদ্যালয়ের মত কিছু কিছু জাতীয় বিদ্যালয়ের পরিচালক সভা আরবি-ফার্সী পড়ানো বন্ধ করে দেওয়ার এবং কেবলমাত্র সংস্কৃত পড়া চালু রাখার ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করায় বহুস্থানে মুসলমান ছাত্রদের জাতীয় বিদ্যালয় থেকে দূরে সরিয়ে রেখে ছিল।[৩৯]

অসহযোগ খিলাফৎ আন্দোলনের প্রচার কার্যেও বহু মুসলমান ছাত্র অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নেতৃত্বের নির্দেশ বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেওয়ার কাজে, প্রচার পত্র বিলির কাজে, তহবিল সংগ্রহে এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে মুসলমান ছাত্ররা সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তাছাড়া দেশ-প্রেমমূলক

গান—'সারা জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা', বেঁচে থেকে আর কি লাভ আছে, লাগুক জীবন দেশের কাজে' অথবা 'আয় সবে মিলে হিন্দু মুসলমান...' ইত্যাদি গেয়ে গান ছাত্ররা জনসাধারণের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে সাহায্য করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় খিলাফৎ-অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার মুসলমান ছাত্রদের এই প্রশংসনীয় ভূমিকা খুবই কম আলোচিত হয়েছে।[৪০]

(৬)

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার এবং খিলাফৎ আন্দোলনের অগৌরবজনক পরিসমাপ্তি, শুদ্ধি সংগঠন আন্দোলন[৪১] এবং তার প্রতিক্রিয়ায় তাঞ্জিম-তবলীগ[৪২] আন্দোলন, বেঙ্গল প্যাক্টের মাধ্যমে[৪৩] সাময়িক আশার ফানুসসৃষ্টি তারপর তাকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা, সারাদেশ জুড়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা এবং হিন্দুমহাসভার নেতাদের মধ্যকার বহরম-মহরম, সর্বোপরি প্রজাসত্ব সংশোধনী বিল (১৯২৮)কে কেন্দ্র করে স্বরাজ্য দল ও বাঙালী মুসলমানদের প্রগতিশীল অংশের বিরোধ তুঙ্গে উঠে।[৪৪] এই সব ঘটনা ধীরে ধীরে বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে সাহায্য করে। কংগ্রেস ও স্বরাজ্যদলের জাতীয়তাবাদকে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আখ্যা দিয়ে এই সময় তাঁরা বলতে থাকেন, তাঁরা যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন দেখেন তা হচ্ছে বৈচিত্র্যময় জাতীয়তাবাদ যেখানে প্রতিটি জাতিই তার নিজস্ব স্বত্বা অক্ষুণ্ণ রেখেও ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের সেবায় নিয়োজিত হতে পারবে।[৪৫] এই আদর্শবাদের ভিত্তিতে ১৯২৭ সালে সারা বাংলা মুসলীম ছাত্র ইউনিয়ন ( All Bengal Muslim Students Union ) মুসলমান ছাত্রদের সংগঠিত করার কাজে ব্যাপৃত হয়। যদিও এই সংগঠনটির কার্যকাল ছিল সীমিত কিন্তু এই মুসলমান সংগঠনটি ১৯১৬-এ যে মুসলমান ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল তা থেকে ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। কারণ এই প্রথম একটি আদর্শ ভিত্তিক মুসলিম ছাত্রসংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। এই ধরনের ছাত্রসংগঠন গড়ে তোলার পিছনে 'দি মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক মুজিবর রহমান এবং মৌলভী ফজলুল হকের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে।[৪৬]

ইতিমধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের পর কিছুদিন স্বাধীনতা আন্দোলনে ভাটার পর্ব চললেও ১৯২৫-২৬ সালের পর থেকে আবার নতুন করে গণ আন্দোলনের বিকাশ ঘটতে থাকে। গণ সংগ্রামের অংশ হিসাবেই সাধারণ ছাত্রদের সংগ্রাম ও সংঘবদ্ধ হবার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। সারা দেশ জুড়ে একটি বিশেষ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় সাইমন কমিশন বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত শাসন আইন সংশোধনের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি

কমিশন নিয়োগ করেন। ঐ কমিশনের সদস্য হিসাবে একজন ভারতীয়কেও না নেওয়ায় দেশের অন্যান্য অংশের মত ছাত্ররাও একে ভারতবাসীদের প্রতি অসম্মান বলে মনে করে। ফলে দীর্ঘদিনের জড়তা কাটিয়ে সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই কমিশন বিরোধী সংগ্রামের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ১৯২৮ এর ৩রা ফেব্রুয়ারি দেশের সর্বত্র হরতাল পালন করে সাইমন কমিশনের বিরোধিতা করা হয়। ঐদিন কলকাতার সমস্ত স্কুল কলেজেও ধর্মঘট হয়েছিল। অন্যান্যদের সংগে মুসলমান ছাত্ররাও দলে দলে ঐ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল।[৪৭] ঢাকা, চট্টগ্রাম, মৈমনসিং, ফরিদপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া প্রভৃতি জেলা শহরেও হরতাল পালিত হয়েছিল। সাইমন কমিশন বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯২৮ এর সেপ্টেম্বরে নিখিল বংগ ছাত্র সমিতির (এ. বি. এস. এ) প্রতিষ্ঠা হয়।[৪৮] দুর্ভাগ্যের বিষয় ঐ ছাত্রসংগঠনে মুসলমান ছাত্রদের প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। এ. বি. এস.-এর বিভিন্ন প্রাদেশিক সম্মেলনের কোনটিরও কার্যকরী সমিতি এবং পরিচালক মণ্ডলীতে একজন মুসলমান ছাত্রেরও নাম পাওয়া যায়না।[৪৯] এর কারণ, ১৯২৮এ সাইমন কমিশনের সামনে ঐক্যবদ্ধ সাংবিধানিক দাবী উপস্থিত করার শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছিল স্যার আবদুল রহিমের নেতৃত্বাধীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের সংগে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র বোস প্রমুখ স্বরাজ্য কংগ্রেস দলের আলোচনা[৫০] ব্যর্থ হওয়ার ফলে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও জিন্না উত্থাপিত মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট চৌদ্দদফা দাবী জাতীয় কংগ্রেস প্রত্যাখান করেছিল। জাতীয় স্রোতধারা থেকে বাংলার মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতা এরপর থেকে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। স্বভাবতই এ সবের প্রভাব বাংলার মুসলমান ছাত্রদের মধ্যেও পড়েছিল।

(৭)

এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৩০-এ গান্ধিজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের শুরু। এবার কিন্তু বাংলার মুসলমান জনসাধারণ ও ছাত্ররা অসহযোগ আন্দোলনের সময়কার মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন নি। ইতস্ততঃ সংগঠিত কিছু কর্মসূচী অবশ্য তাঁরা পালন করেছিলেন। যেমন, ১৯৩০-এর ২৬শে জানুয়ারী ঢাকা মুসলিম হলের ছাত্ররা হোস্টেলে আলোকসজ্জা করে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে 'বন্দেমাতরম', 'গান্ধিজী কি জয়,' 'আল্লা হো আকবর' ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান পথ পরিক্রমা করেন, জনসভায় সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত পুস্তক পাঠ এবং কাঁথিতে লবণ সত্যাগ্রহে যোগদানের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করেন।[৫১] ঢাকার মুসলমান ছাত্রদের এধরণের কার্যকলাপের পিছনে

মনে হয় মোতাহর হোসেন, এ. এফ. রহমান, আবদুল ওদুদ, আবদুল কাদের প্রমুখ শিক্ষক-অধ্যাপকদের প্রগতিশীল প্রভাব হয়তো কাজ করেছিল। কিন্তু ১৯৩০-এর মে মাসের শেষের দিকে প্রথমে ঢাকায় ও পরে কিশোরগঞ্জের দাঙ্গা হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে আবার তিক্ত করে ফেলে। সেই সংগে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় (১৯০৫-০৮) যেমন জমিদার-মহাজন বিরোধী কৃষক কর্মসূচীর অভাব স্বদেশী আন্দোলন থেকে গ্রাম বাংলার মুসলমান কৃষকদের দূরে ঠেলে দিয়েছিল, আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ও কৃষক কর্মসূচীর অভাব গ্রামীন মুসলমান জনসাধারণকে ঐ আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল—এইসব কিছুর প্রভাব মুসলমান ছাত্রদেরও প্রভাবিত করেছিল।

ত্রিশের দশক ছিল মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে রাজনৈতিক বিভ্রান্তির দশক। মুসলিম সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলনের স্রোতধারার মধ্যে রাখার ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেসের ব্যর্থতা, বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারে কৃষক প্রজাপার্টী ও মুসলিম লীগের মধ্যকার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাংলার মুসলমান ছাত্রদের রাজনৈতিক ভাবে বিভ্রান্ত করেছিল। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি হিন্দু সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ভীতিও কলকাতায় বসবাসকারী মুসলমান কলেজ ছাত্রদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে নজরুল ইসলামের 'হিন্দুয়ানিভাবে গদ গদ হয়ে' গান, কবিতা ইত্যাদি লেখাকে 'বেহায়াগিরি' এবং এর ফলে বাংলার মুসলমানরা 'হিন্দুর কালচারাল গোলামে' পরিণত হয়েছে, মুসলমানদের বাঁচতে হলে যে কোন মূল্যে 'হিন্দুদের কালচারাল কনকোয়েস্টস্' বন্ধ করাতেই হবে—এই ধরণের মনোভাব বেশীর ভাগ বাঙালী মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে দৃঢ়মূল হচ্ছিল। হিন্দু কালচারাল কনকোয়েস্টস্ বিরোধী জিগীরের বিরুদ্ধে '৫প্রেম নেই'এ বর্ণিত সেইসময়কার জনৈক মুসলমান ছাত্রনেতা মোতাহের হোসেন চৌধুরীর কলকাতার কারমাইকেল হোস্টেলে প্রদত্ত বক্তৃতা মুসলমান ছাত্রদের অন্ততঃ একাংশের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ থাকার আকুল আগ্রহই প্রকাশ পায়। তিনি যুক্তি দিয়ে সেদিন বলার চেষ্টা করেছিলেন যে হিন্দুর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অনেকখানি মুসলমানেরও উত্তরাধিকার—তার কারণ হিন্দুর অনেক কিছুই মুসলমানরা জানে, বুঝে ও উপভোগ করে। মুসলমানরা কষ্ট পায় এই কথা ভেবে যে হিন্দুরা তাদের সম্পর্কে কিছুই জানে না—জানতে চায়ও না। তাঁর মতে 'হিন্দুর ঐতিহ্যে নজরুল তথা মুসলমানের উত্তরাধিকার রয়েছে' বলেই নজরুল হিন্দুর ঐতিহ্য নিয়েও রচনা লিখেছেন। কিন্তু 'মুসলমান ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথ তথা হিন্দুর উত্তরাধিকার নেই। প্রাণের যোগ নেই বলেই বহিরাগত ধর্ম ও সংস্কৃতি উপলব্ধী করা' হিন্দুর পক্ষে কষ্টসাধ্য। কিন্তু মাটির বাঁধন দেশজ ঐতিহ্য

ও সংস্কৃতিই এদেশীয় মুসলমানকে এদেশীয় করে তুলেছে। 'হিন্দুর ঐতিহ্য এবং মুসলমানের ঐতিহ্য—এই দুই-এর সংমিশ্রণের দায়িত্ব মুসলমানেরই, হিন্দুর নয়।' কারণ হিন্দুর দুই উত্তরাধিকার নয় কিন্তু মুসলমানের তা আছে'[৫২] ইত্যাদি ইত্যাদি। বলাবাহুল্য 'প্রেম নেই'এর ঐ মুসলমান ছাত্র-নেতার বক্তব্য খুবই যুক্তিপূর্ণ হলেও সেদিনের উত্তেজনা-আবেগপ্রবণ রাজনীতির সাম্প্রদায়িক বাতাবরণে তা কোন দাগই কাটতে পারেনি শ্রোতাদের মনে।

( ৮ )

ত্রিশের দশকের শেষের দিকে বাংলার মুসলিম রাজনীতির কেন্দ্র ছিল দুটি—একটি কলকাতায়, কলকাতার লাটকাউন্সিল ; অপরটি ঢাকায়, ঢাকার নবাব পরিবারের আবাসস্থল আহসান মঞ্জিল। কলকাতায় তখন ইসলামিয়া কলেজ এবং বেকার হোস্টেল ছিল মুসলিম ছাত্র রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। ইসলামিয়া কলেজের ছেলেদের প্রায় সবাই ছিলেন লীগপন্থী। তবে কলেজে ইউনিয়নের নির্বাচনের সময় মুসলমান ছাত্ররা দু'দলে ভাগ হয়ে যেতেন—উর্দুপন্থী এবং বাংলাপন্থী। উর্দুপন্থীরা অবশ্য নিজেদের কুলীন মনে করতেন।[৫২এ] বেকার হোস্টেলের সুপার সাখেদুর রহমান এবং ইসলামিয়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ই. জাবেরী ছিলেন আলিগড়ে শিক্ষিত। তিনি কলকাতার মুসলমান ছাত্রদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতেন। বেকার হোস্টেল ছাড়াও আরও দুটি মুসলিম ছাত্রদের হোস্টেল ছিল—কারমাইকেল এবং টেলার হোস্টেল। এখানে সাধারণতঃ এম. এ. এবং আইনপাঠরত ছাত্ররাই থাকতেন।[৫৩] মুসলমান ছাত্রদের অধিকাংশই ছিলেন লাট-কাউন্সিলের মুসলীম লীগ নেতা শহীদ সুরাবর্দী অথবা খাজা নাজিমুদ্দিনের সমর্থক।[৫৪] সারা বাংলা ছাত্র এসোসিয়েশন ছিল মুসলমান ছাত্রদের নিজস্ব সংগঠন যদিও কিছু মুসলমান ছাত্র সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের প্রাদেশিক শাখারও সদস্য ছিলেন। এ. ওয়াসেখ এবং আবু সৈয়দ চৌধুরী ( ইনি পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন কিছুকাল ) ছিলেন ঐ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সম্পাদক। মুসলিম লীগের মত মুসলমান ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে দীর্ণ ছিল। ওয়াসেদ বিরোধীরা কিছুকালের মধ্যেই সারাভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন গঠন করেন। কিছুকাল পরে অবশ্য উভয় সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সারা বাংলা মুসলিম ছাত্র লীগ গঠন করে। ওয়াসেখ ও সাদেকর যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হন।[৫৫] ১৯৪২-এ মুসলিম ছাত্র লীগের চুঁচুড়া সম্মেলনে সাদেকর রহমান সভাপতি এবং আনোয়ার হোসেন সম্পাদক নির্বাচিত হলেও ১৯৪৩-এ কুষ্টিয়া সম্মেলনে শাহ আজিজুর রহমান সম্পাদক নির্বাচিত হন। আজিজুর রহমান ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দীনের সমর্থক।[৫৬] কুষ্টিয়া

সম্মেলনের (১৯৪৪) পর থেকে নাজিমুদ্দিন সমর্থক সাদেকর-আজিজুর রহমানের গোষ্ঠীর সংগে সুরাবর্দী অনুবর্তী নুরুদ্দিন-মোয়াজ্জেম হোসেন গোষ্ঠীর বিরোধ তুঙ্গে উঠে। শেষোক্ত গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রনাধীনে ছিল কলকাতা জেলা মুসলিম ছাত্রলীগ। কলকাতার মুসলিম ছাত্র-রাজনীতির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব শেষপর্যন্ত জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল।[৫৭]

তুলনামূলকভাবে ঢাকায় মুসলিম ছাত্র রাজনীতি ছিল অন্য ধরণের। ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ, ঢাকা নবাব পরিবারের নিয়ন্ত্রণে থাকায় জমিদারী মেজাজে তা পরিচালিত হত। সে সময় প্রায় প্রতিবছর হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা ঢাকায় লেগে থাকতো। স্বভাবতঃই ধর্ম যতটা মুসলিম ছাত্র রাজনীতিকে সেদিন প্রভাবিত করেছিল, ক্ষমতা লাভের প্রশ্ন অথবা মন্ত্রিসভাকে সমর্থন বা বিরোধিতার প্রশ্ন ততটা করেনি। জেলা মুসলীম লীগের মতোই জেলা মুসলিম ছাত্র আন্দোলনও আহসান-মঞ্জিল থেকেই নিয়ন্ত্রিত হত। কিছুকাল পর, বিশেষ করে, ১৯৪৩-এর নভেম্বরে বর্ধমানের আবুল হাসিম বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হবার পর থেকেই নবাব-পরিবার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হওয়ার প্রবণতা ঢাকা মুসলিম ছাত্র আন্দোলনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। ১৯৪২-এ ঐ ধরণের প্রবণতার ছাত্ররা সারা বাংলা মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন, ঢাকা শাখা প্রতিষ্ঠা করে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট লীগে ঐসময় বদরুদ্দিন এ. সিদ্দিকী এবং ফরিদ আহমেদ ছিলেন জনপ্রিয় ছাত্রনেতা। অন্যান্য প্রগতিপন্থী ছাত্রনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সর্দার ফজলুল করিম, কাজী জহুরুল ইসলাম প্রমুখেরা।[৫৮] ঢাকা ইউনিভার্সিটির মুসলমান ছাত্রদের উদ্যোগে ঐ সময় 'ফর্টনাইটলি পাকিস্তান' নামে একটা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনকে ঐ পত্রিকায় মুসলমানদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন বলে প্রচার করা হয়।[৫৯]

আবুল হাসিম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মুসলিম ছাত্র রাজনীতি লাট-কাউন্সিল অর্থাৎ সংসদীয় রাজনীতির আবর্তন থেকে মুসলিম লীগ সংগঠনমুখী রাজনীতিতে পরিবর্তিত হয়। ১৯৪৪ এর ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জে মুসলমান ছাত্রদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আবুল হাসিম ঐ সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে আহসান মঞ্জিলের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকেই বাংলার রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাধা হিসাবে চিহ্নিত করেন। সেই সংগে তিনি ধনকুবের ইস্পাহানীদের প্রভাবমুক্ত মুসলিম লীগ গঠনে ছাত্রসমাজের কাছে আহবান জানান। ধনতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র এবং সকল প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আবুল হাসিমের সংগ্রামের আহ্বান সেদিনকার বাংলার মুসলমান ছাত্রদের সামনে নূতন আশার আলোকবর্তিকা

তুলে ধরেছিল।[৮০] মুসলিম লীগের নূতন সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মসূচীর বার্তা গ্রামে গঞ্জে পৌঁছে দিতে মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মীরা অগ্রসর হয়েছিলেন।

(৯)

বাংলার মুসলমান ছাত্রদের বেশীর ভাগ মুসলিম লীগ রাজনীতিতে আকর্ষিত হলেও তাঁদের অন্তর্নিহিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানসিকতা বারবার তাঁদেরকে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতধারায় টেনে এনেছিল। এইরকমই একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন ছিল ১৯৪০-এর হলওয়েল মনুমেণ্ট ভেঙ্গে ফেলার আন্দোলন। সিরাজুদ্দৌলাকে বাঙালী জাতীয়তার প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সাম্রাজ্যবাদীদের মিথ্যাপ্রচারের প্রতীক এই মনুমেণ্ট ভেঙ্গে ফেলা ছিল আন্দোলনের উদ্দেশ্য। সারা বাংলা মুসলিম ছাত্র লীগের আবদুল ওয়াসেখ, নরুল হুদা এবং আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সুভাষ চন্দ্র বোস তাঁর পরিচালিত ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মীদের নিয়ে ঐ আন্দোলনে যোগ দিলে তা এক ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। আন্দোলনকে 'জাতীয়' রূপ দেওয়ার জন্য ১৯৪০-এর ৩রা জুলাই 'সিরাজস্মৃতি দিবস' হিসাবে পালন করা স্থির হয়। এই উপলক্ষ্যে ১লা জুলাই কলকাতার এ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত ছাত্র-জনসাধারণের জনসভায় ছাত্রনেতা ওয়াসেখ এবং নূরুল হুদা ঐ সভায় তেজোদৃপ্ত বক্তৃতা দেন। স্থির হয় সুভাষ বোসের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহীরা কুড়াল হাতে হলওয়েল মনুমেণ্ট ভাঙ্গতে অগ্রসর হবে। কিন্তু সুভাষবোসকে ২রা জুলাই রাত্রেই ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। এর প্রতিবাদে এবং সুভাষ বোসের মুক্তির দাবীতে প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন এবং প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ইসলামিয়া কলেজ সহ কলকাতার বিভিন্ন কলেজের হিন্দু-মুসলমান ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ মিছিল করতে থাকেন। সেই সংগে সত্যাগ্রহও পুর্ণোদ্যমে চলে। মিছিল করা উপলক্ষ্যে ইসলামিয়া কলেজে পুলিশ মিলিটারী হামলা হয়। ছাত্রনেতা ওয়াসেখ এবং আনোয়ার হুসেন আহত হয়ে হাসপাতালে প্রেরিত হন। নরুল হুদার নেতৃত্বে বহু মুসলমান ছাত্র তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবের ঝাউতলার বাড়ি ঘেরাও করে। এরপর ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামিয়া কলেজে পুলিশী অত্যাচারের তদন্তের এবং সুভাষ বোসের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সামনে সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। ইসলামিয়া কলেজে পুলিশী হামলার তদন্তের জন্য একজন হাইকোর্টের বিচারপতির পরিচালনায় তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। সুভাষ বোসের মুক্তির

ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়ে ফজলুল হক ছাত্রদের সেদিন শান্ত করেছিলেন।[৬১]

১৯৪৫এ ফ্যাসিস্ত শক্তির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। অন্যান্য বহু ঔপনিবেশিক দেশের মতো ভারতবর্ষেও ১৯৪৫ এর শেষ ভাগ থেকেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম যুদ্ধ-পূর্ব যুগের তুলনায় কয়েকগুণ তীব্রতা নিয়ে সমগ্র দেশবাসীর সামনে হাজির হয়। এর প্রথম বহিঃপ্রকাশ ১৯৪৫ এর ২৯শে আগষ্ট। ঐদিন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ১৫০০০ ছাত্রছাত্রী ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে সমাবেশ ও মিছিল করে।[৬২] ঐ বছরেই আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম হল ২১শে নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবীতে ছাত্রদের সংগ্রাম। ছাত্ররা শুরু করলেও পুলিশ মিলিটারীর নির্মম গুলি চালনার প্রতিক্রিয়ায় ঐ সংগ্রাম পরিণত হয়েছিল শ্রমিক ও ছাত্রসহ সমস্ত জনগণের সংগ্রামে। পুলিশের গুলিতে ও লাঠিতেকমপক্ষে ৫০ জন নিহত ও ৩০০ জন আহত হয়েছিলেন।[৬৩] শহীদ হয়েছিলেন ছাত্র রামেশ্বর ব্যানার্জি এবং শ্রমিক আবদুল সালাম। ২২শে নভেম্বর প্রায় দু মাইল লম্বা শোক মিছিলে সর্বস্তরের মানুষের সংগে কলকাতার কলেজ, মাদ্রাসা, স্কুল, ও মক্তবের হিন্দু-মুসলমান ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ২৩শে আবার জনতার উপর পুলিশের গুলি চললে রাস্তায় রাস্তায় শুরু হয়ে যায় জনতার সংগে পুলিশ-মিলিটারীর সংঘর্ষ।[৬৪] ২১ থেকে ২৩শে নভেম্বরের মধ্যে পুলিশের গুলিতে ৩৩ জন নিহত এবং ২০০ জন আহত হন।[৬৫] ২৪শে নভেম্বর হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান শহীদ আবদুল সালেমের মৃতদেহ নিয়ে মোহম্মদ আলীপার্ক থেকে শোকযাত্রায় বের হন।

পরের বছর ফেব্রুয়ারীর গোড়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম বীর আবদুল রশিদ আলীকে ইংরেজ সরকার ৭ বছর কারাদন্ডে দণ্ডিত করলে ১৯৪৬ এর ১১ই থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অভূতপূর্ব ছাত্র-যুব বিক্ষোভ আন্দোলন গড়ে উঠে যাতে আপামর জনসাধারণ যোগ দেয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের উপর প্রতিহিংসামূলক শাস্তি ব্যবস্থা সেদিন দেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষকেই ভীষণ ভাবে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে তুলেছিল। মুসলমান জনসাধারণ এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। বিশেষ করে মুসলমান ছাত্ররা রসিদ আলীর দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। সরকারী প্রতিবেদন অনুসারে ৫ই ফেব্রুয়ারী মুসলমান ছাত্রদের একটা প্রতিবাদ মিছিল শহর পরিক্রমা করে। ৯ই ফেব্রুয়ারী মুসলিম ছাত্র লীগ ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করলেও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে ৮ই তা প্রত্যাহৃত হয়েছিল।[৬৬] কিন্তু ১১ই ফেব্রুয়ারী কলকাতা জিলা মুসলিম ছাত্র লীগের সম্পাদক মোয়াজ্জম হোসেন এবং সিটি ছাত্র

ফেডারেশনের সম্পাদক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের (পঃ বঃ ইতিহাস সংসদের বর্তমান সহ-সভাপতি) আহ্বানে ঐ দিন বেলা ১১ টায় কলকাতার অধিকাংশ কলেজ, মাদ্রাসা ও স্কুলের হিন্দু-মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমবেত হয়। সভায় প্রথমেই খবর আসে, ডালহৌসী স্কোয়ারে জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে একটি মুসলমান ছাত্রদের শোভাযাত্রার উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে এবং সালে আহমদ সহ ১২ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশী নির্যাতনের সংবাদে উত্তেজিত হয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সমবেত ছাত্ররা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি ও খাকসার দলের পতাকা বাঁধে নিয়ে সুরাবর্দি ও অন্যান্য বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সামনে রেখে এক ঐতিহাসিক মিছিলে ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে অগ্রসর হয়। 'আজ কংগ্রেস ও লীগের পতাকা একই সঙ্গে উড়ছে, এটাই আমাদের জয়ের সূচনা'[৬৮]—সিটি মুসলিম ছাত্র লীগের তরুণ সম্পাদকের সেদিনের এই আবেগমণ্ডিত ঘোষণা ছিল সমবেত সমগ্র হিন্দু মুসলমান ছাত্রদেরই মনের কথা। এর থেকে স্পষ্ট যে বাংলার মুসলমান ছাত্ররা সেদিন পর্যন্তও মনে প্রাণে চেয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি আন্দোলনের মূল স্রোতধারায় থেকে যেতে। তখনকার গোপন সরকারী প্রতিবেদন থেকে জানা যায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে, মুসলিম ছাত্র লীগ নেতৃত্ব ছাত্র ফেডারেশনের সংগে যুক্ত মিছিল সংগঠিত করার পরিকল্পনা আগে থেকেই করেছিলেন। শুধু তাই নয় তাঁরা জেলায় জেলায় মুসলিম ছাত্র লীগ সংগঠনের কাছে ছাত্র ফেডারেশনের সংগে সর্বত্র একত্রে বিক্ষোভ, মিছিল ও সমাবেশের নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন।[৬৯]

মিছিল ভঙ্গ করতে কয়েকশ সার্জেন্ট, পুলিশ ও গুর্খারা শান্ত শোভাযাত্রীদের উপর খেপাকুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শতাধিক ছাত্র আহত হন। ২০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আহত মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন রসিদা খায়ের, মোর্শেদ আলী, উমর আবিদ জুবেরী, জহীরুদ্দীন ফারুকী, আরশেদ আলী, লুৎফার রহমন, মহম্মদ আলী ফারুকী, মহম্মদ আব্দুল্লা, করিম খান প্রমুখ। ছাত্রদের নেতৃত্বে শহরের বিভিন্নাংশে মুসলমান জনতা রাস্তার উপর এসে বিক্ষোভ জানাতে থাকে এবং পরদিন ১২ই ফেব্রুয়ারী ছাত্ররা ধর্মঘট করে। মুসলীম ছাত্রলীগ ও ছাত্রফেডারেশনের সম্মিলিত এক ছাত্রসভার পর, শহীদ সুরাবর্দীর সভাপতিত্বে কংগ্রেস লীগের যৌথ উদ্যোগে ২০ হাজার মানুষের সভা অনুষ্ঠিত হয় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। সভার পর এক বিরাট শোভাযাত্রা ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে অগ্রসর হয়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ছিলেন ছাত্রফেডারেশন ও মোসলেম ছাত্র লীগের নেতৃবৃন্দ। দেখতে দেখতে সেদিনকার শোভাযাত্রা লক্ষাধিক মানুষের জনসমুদ্রে

পরিণত হয়। ১৯২১-এর অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের পর হিন্দু-মুসলমানের এমন অপূর্ব মিলন দৃশ্য আর দেখা যায়নি।[৭০] মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ মিলিটারীকে সেন্ট্রাল এভিনিউ থেকে হাজরা পর্যন্ত কয়েক দফা গুলি চালাতে হয়েছিল। কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠি চার্জ যে কতবার করা হয়েছিল তার হিসাব নেই। কলকাতা ও শহরতলীতে সামরিক আইন জারী করে সেদিন শহরকে তুলে দেওয়া হয়েছিল সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে।[৭১]

রক্তস্নান করে উঠা কলকাতার বুক থেকে রক্তের দাগ মিলিয়ে যাবার আগেই ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬-এ বোম্বাই, করাচী ও কলকাতার বন্দরে অবস্থানরত সামরিক জাহাজের নাবিকরা ধর্মঘট শুরু করে। ১৯শে বোম্বাই-এর রাজপথে ধর্মঘটী নৌসেনারা বিদ্রোহের ঝাণ্ডা হাতে মিছিল করে। ২০শে নৌসেনাদের ধর্মঘট ব্রিটিশ ফৌজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। সেদিন বোম্বাই-এর নৌ সেনাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শুধু বোম্বাইয়ের লক্ষ শ্রমিকরা নয়, করাচী, মাদ্রাজ এবং কলকাতার ধর্মঘটীদের সমর্থনে দেশের সর্বত্র শ্রমিক, ছাত্র ও সাধারণ মানুষ ধর্মঘট ও মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় লক্ষাধিক ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংগে মিছিলে একাত্ম হয়েছিলেন কয়েক হাজার ছাত্র।[৭২] সেদিন তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে তাঁরা হিন্দু না মুসলমান।

আবার ঝড় উঠেছিল ১৯৪৬-এর ২৮শে জুলাই থেকে। সারা ভারত জুড়ে ডাক ও তার শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনের সর্বাত্মক আত্মপ্রকাশ ২৯শে জুলাই-এর সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল। তারই প্রস্তুতিতে ২৮শে জুলাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশনের সংগে সারা বাংলা মুসলিম ছাত্র লীগ সম্মিলিতভাবে ২৯-শের ধর্মঘট ও হরতাল সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে লাউড স্পীকারযোগে ভ্যানে করে প্রচার অভিযান পরিচালনা করে। পরদিনের ঐতিহাসিক ধর্মঘট ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রদের নেতৃত্বে কলকাতার মুসলমান ছাত্ররা হিন্দু ছাত্রদের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন ডালহৌসী স্কোয়ারে রাইটার্স বিল্ডিংসের সামনে পিকেটিং করতে।[৭৩]

কিন্তু তারপর?

১৯৪৬ এর ফেব্রুয়ারী-জুলাই সম্পর্কে গোপন সরকারী প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে কলকাতার ছাত্র বিক্ষোভ এমন রূপ ধারণ করেছিল যে কংগ্রেস ও লীগ উভয় নেতৃত্বই ছাত্রদের আর নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না দেখে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। উভয় নেতৃত্বই আন্দোলনের রাশ শক্ত হাতে টেনে ধরতে চেয়েছিলেন। ঐ সময় মিঃ জিন্না স্বয়ং কলকাতায় একটার পর একটা, সভা করে একই বক্তব্য বার বার ধ্বনিত করেছিলেন—'ভারতে ইসলাম বিপন্ন, 'পাকিস্তান ছাড়া ভারতের মুসলমান জাতি এবং ইসলাম ধ্বংস হয়ে

যাবে', 'ইংরেজ ও হিন্দু গোলামীর বিরুদ্ধে বাঁচবার একমাত্র পথ হলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা' ইত্যাদি ইত্যাদি।[৭৪] বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বাম ও দক্ষিনপন্থী উভয় অংশই মুসলমান ছাত্রদের জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বারে বারে মুসলিম লীগের দলীয় রাজনৈতিক সংঘাতের দিকেই টেনে নিয়ে গেছেন, যাতে করে তারা অমুসলিম ছাত্রদের দ্বারা সংগঠিত আন্দোলনের সংগে যুক্ত না হয়ে পড়ে। কলকাতার বিভিন্ন মুসলিম ছাত্র হোস্টেলের নেতৃস্থানীয় প্রায় ৩০০ ছাত্রকে মুসলিম লীগের হয়ে যশোহর, বাগের হাট, বাখরগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচার কার্যে পাঠানো হয়।[৭৫]

জাতীয় স্তরে একটি ফেডারেল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের তীব্র মতানৈক্য, হিন্দু-মুসলমান নেতৃত্বের একাংশের সহযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে ১৯৪৬-এর 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'—পরে মফঃস্বলেও তার দ্রুত বিস্তার, শরৎচন্দ্র বসু-সুরাবর্দী-আবুল হাসিমের বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার শেষ চেষ্টার চরম ব্যর্থতা, সর্বোপরি যে কংগ্রেস ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ রদের সাম্রাজ্যবাদীর প্রচেষ্টা বানচাল করতে অত্যন্ত গৌরবজনক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, ১৯৪৬-৪৭-এ বাংলার সেই কংগ্রেসের নেতৃত্ব হিন্দুমহাসভা নেতৃত্বের সহযোগিতায় বাংলা বিভাগে উদ্যোগ গ্রহণ করলে দেশবিভাগ সমর্থন ছাড়া বাংলার মুসলমান ছাত্রআন্দোলনের সামনে কোন আর বিকল্প ছিল না।

## তথ্য সংকেত ও টীকা

১। অমলেন্দু দে : বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, (কলিকাতা, ১৯৭৪), পৃ ১৪৭।

২। আবদুল লতিফ : মোহামেডান এডুকেশন ইন ট্রানজ্যাকসনস্, ২য় ভাগ, ১ম খন্ড, ১৮৬৮, পৃ ৪৯-৫০।

৩। অমলেন্দু দে : ঐ, পৃ ১৪৮

৪। এনামুল হক : নবাব বাহাদুর আবদুল লতিফ এন্ড রিলেটেড ডকুমেন্টস্ (ঢাকা, ১৯৬৮), পৃ ৭৩।

৫। অমলেন্দু দে : ঐ, পৃ ১৬৯।

৬। এনামুল হক : ঐ, পৃ ১৮০।

৭। ঐ, পৃ ৭৩।

৮। বেঙ্গল লেগিসলেটিভ কাউন্সিল প্রসিডিংস্, ১৯১৭, ৬৭ খন্ড, পৃ ৫৭৬।

৯। ঐ, ১৯১৩ ৬৫ খন্ড, পৃ ৪১৭।

১০। দি ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম প্রসিডিংস, এপ্রিল, ১৯০৬, বেঙ্গলে

লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রসিডিংস ১৯১৩-১৫, পৃ ৫৭৬—৫৮১, ফজলুল হকের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।

১১। চণ্ডীপ্রসাদ সরকার: দি বেঙ্গলী মুসলিমস্: এ স্টাডি ইন দেয়ার পলিটিসাইজেশন ১৯১২-১৯২৯, পৃ ৩৭—৩৯ এবং ৪৮—৪৯

১২। দি মুসলমান, ১৯ জুলাই, ১৯১২, পৃ ৬।

১৩। ঐ।

১৪। ঐ।

১৫। ঐ, ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯১২, পৃ ৭।

১৬। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রসিডিংস ৪ এপ্রিল ১৯১৩, ১৪ খণ্ড পৃ ৫৭৬-৫৮১ ফজলুল বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।

১৭। দি মুসলমান, ১৯ শে জুলাই, ১৯১২, পৃ ৬, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯১২, পৃ ৯।

১৮। বেঙ্গলে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রসিডিংস ১৯১৩, ফজলুল হক ও আবুল কাসেমের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।

১৯। দি মুসলমান, সেপ্টেম্বর ২৭, ১৯১২, পৃ ৯।

২০। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রসিডিংস ১৩ জানুয়ারী ১৯১৪, ৬৬ খণ্ড, পৃ ১৪—১৬, ফজলুল হকের প্রশ্নের সরকারী উত্তর দ্রষ্টব্য।

২১। দি মুসলমান, ১৭ মে, ১৯১২, পৃ ৬।

২২। মহম্মদ আজিজুল হক: হিস্ট্রি এণ্ড প্রব্লেম অব মোহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল ( কলিকাতা, ১৯১৭ ), ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২৩। চণ্ডীপ্রসাদ সরকার: ঐ, পৃ ৫৪—৫৫।

২৪। জি. বি. আই. বি সিক্রেট ফাইল নং ১৫৩ ( ১৯২০ )।

২৫। বরুন দে: 'ক্যালকাটাস পার্ট ইন দি ফরমেশন অব এ. কে. আজাদ।' ইণ্ডো-ইরানীকা, ১৯৮৮-৮৯ পৃ ১০৪।

২৬। জি. বি. আই বি, সিক্রেট ফাইল নং ঐ।

২৭। কে. ম্যাকফার্সন: মুসলিম মাইক্রোকোসম, ক্যালকাটা মুসলিমস্ ১৯১৮-১৯৩৫, ( ওয়েসবাদেন, ১৯৭৪ ) পৃ ৫৮।

২৭ এ। জি.বি. হোম ( পল ), কনফিডেন্সিয়াল পুলিশ রিপোর্ট, ফাইল নং ৪৭২ ( ১৯১৯ ), স্টেট আরকাইভসে রক্ষিত ফ্রিডম মুভমেন্ট পেপারস্ নং ৭৬।

২৮। এন. সি. ব্যানার্জি: এ্যাট দি ক্রসরোডস্ ( কলিকাতা, ১৯৫০ ),

২৯। জাব/ পল কনফিডেন্সিয়াল ফাইল নং ৩৯৫/১৯২৪, সিরিয়াল নং ২, চীফ সেক্রেটারী জিবি. টু জি. আই ( হোম ) সেক্রেটারী নং ১২৬৬ পি, ৩১. ১. ২৫।

৩০। ইসলাম দর্শন, ১৩৩১ (বাংলা), ১৯২৪, পৃঃ ৫৪; মুসলিম পত্র-পত্রিকায় সরকারী স্কুল কলেজকে ঐ সময় গোলাম খানা বলা হত।

৩১। সিক্সথ্ কুইনকুইনিয়্যাল রিভিউ ১৯২৩ 'এডুকেশন ইন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি' পৃ: ৯০।

৩২। জি. বি. (পল), কনফিডেন্সিয়াল ফাইল নং ৩৯৫/১৯২৪, সিরিয়াল নং ২।

৩৩। দি মুসলমান, ১২ই নভেম্বর, ১৯২০, পৃ: ৩, ৬।

৩৪। ঐ, মার্চ ১১, ১৯২১, পৃ: ৪।

৩৫। আবুল মনসুর আমেদ: আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃ: ৩৪।

৩৬। জি. বি. আই. বি কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট ফাইল নং ২৬৭/১৯২০, ৪র্থ খণ্ড।

৩৭। আল এসলাম, পৌষ. ১৩২৭, পৃ: ৪৯২।

৩৮। দি মুসলমান, ২৭ মে, ১৯২১, পৃ: ৬।

৩৯। ইতিহাস অনুসন্ধান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪২৫।

৪০। চণ্ডীপ্রসাদ সরকার, ঐ' পৃ: ১২৮—১২৯, ১৩১।

৪১। ১৯২৬ সাল থেকে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যায়। ঐ সময় আর্যসমাজ এবং হিন্দু মহাসভা ধর্মান্তরিত মুসলমানকে পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার আন্দোলন শুরু করে। সেই সংগে দাঙ্গার সময় মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধে সংগঠন গড়ে তোলার কর্মসূচীতে গ্রহন করা হয়। এই ধরনের কার্যকলাপ শুদ্ধি-সংগঠন আন্দোলন নামে পরিচিত হয়।

৪২। হিন্দু সমাজের শুদ্ধি-সংগঠন আন্দোলনের পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে হিসাবে মুসলমানরা তনজীম ও তবলীগ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

৪৩। চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯১৯ এর ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থাকে অচল করে দিতে এবং সংসদীয় আন্দোলনের দ্বারা সংসদীয় আন্দোলনের দ্বারা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে ১৯২৩ সালে বাঙ্গালী মুসলমানদের সংযতশীল অংশের সহযোগিতা কামনা করেন। বাঙ্গালী মুসলমান নেতৃত্বের ঐ অংশটি স্বরাজ্যদল তথা প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্বের সংগে মুসলমান সম্প্রদায়ের আর্থ-রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সমঝোতায় আসার বিনিময়ে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রস্তাবে সম্মতি জানান। ঐ সমঝোতায় বেঙ্গল-প্যাক্ট নামে পরিচিত। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলনে পূর্বতন বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের চাপে ঐ প্যাক্ট বাতিল হয়।

এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য ইতিহাস অনুসন্ধান—১ (১৯৮৬), পৃ ১৫৪—১৫৬ দ্রষ্টব্য।

৪৪। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনকে সংশোধন করে জমিদারকে বায়তদের খাজনা বৃদ্ধি করার অধিকার দেওয়ার জন্য ১৯১৮ এ বাংলার লাট কাউন্সিলে বিল উত্থাপন করা হয়। কংগ্রেস স্বরাজদল জমিদারদের পক্ষ সমর্থন করেন। পক্ষান্তরে জমিদার ছাড়া আর সব মুসলমান রায়তের স্বার্থরক্ষায় সংশোধনীর বিরোধিতা করেন।

৪৫। দি মুসলমান, ২৩ এপ্রিল, ১৯২৭, পৃ ৪।

৪৬। চণ্ডীপ্রসাদ সরকার : ঐ, পৃ ২০৭।

৪৭। তানিকা সরকার : বেঙ্গল ১৯২৮—৩৪ (দিল্লী, ১৯৪৯ পৃ ১৩-১৪।

৪৮। অমরেন্দ্র নাথ রায় স্টুডেন্টস্ ফাইট এর ফ্রিডম (কলিকাতা, ১৯৬৭), পৃ ১৭।

৪৯। ঐ, বিভিন্ন প্রাদেশিক সম্মেলনের বিবরনী দ্রষ্ট্ব্য।

৫০। আবুল মনসুর আমেদ : ঐ, পৃ ৬০-৬১।

৫১। তানিকা সরকার : ঐ, পৃ ১০৫।

৫২। গৌরকিশোর ঘোষ : প্রেম নেই (কলিকাতা, ১৯৮১) পৃ ২২৯-২৩০।

৫২এ। ভবতোষ দত্ত : আট দশক, (কলিকাতা, ১৯৮৮) পৃ ১১৭।

৫৩। শীলা সেন : মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল ১৯৩৭—১৯৪৭, (নিউদিল্লী, ১৯৭৬), পৃ ১৮৮।

৫৪। ঐ, পৃ ১৮৯।

৫৫। ঐ, পৃ ১৮৭।

৫৬। পৃ ১৮৮।

৫৭। ঐ, পৃ ১৮৯।

৫৮। ঐ, পৃঃ ১৮৮।

৫৯। ঐ, পৃ ১৭৯।

৬০। ঐ, পৃ ১৮৫

৬১। আবুল মনসুর আমেদ : ঐ পৃ ২০৪—২০৬।

৬২। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি : সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর, (কলিকাতা, ১৯৮৬), পৃ ২৯।

৬৩। ঐ, পৃ ৩০।

৬৪। অমলেন্দু সেনগুপ্ত : উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, (কলিকাতা ১৯৮৯), পৃ ৪৩—৫০।

৬৫। সুমিত সরকার : মডার্ন ইণ্ডিয়া ১৮৮৫—১৯৪৭, (দিল্লী, ১৯৮৩), পৃ ৪২১।

৬৬। অমলেন্দু দে : মুসলিম লীগ রাজনীতি : কয়েকটি প্রশ্নের বিশ্লেষণ—
পাদটীকা নং ৬৩, ইতিহাস অনুসন্ধান—৫, পৃ ৭৬।

৬৭। অমলেন্দু সেনগুপ্ত : ঐ পৃ ৫৭।

৬৮। ঐ, পৃ ৫৯।

৬৯। অমলেন্দু দে : ঐ পাদটীকা নং ৫৩, ইতিহাস
অনুসন্ধান—৫, পৃ ৭৪।

৭০। অমলেন্দু সেনগুপ্ত : ঐ, পৃ ৬৩—৬৪

৭১। ঐ, পৃ ৬৮

৭২। ঐ, পৃ ১০৬

৭৩। ঐ, পৃ ১৬৭—১৬৯

৭৪। অমলেন্দু দে : ঐ, পৃ. ৬৪, ৮২।

৭৫। ঐ, পৃ ৮৩, পাদটীকা ৬৭।

# এত বিদ্রোহ কখনও দেখেনি কেউ

## বাংলার ছাত্র-আন্দোলন ( ১৯৩৭-৪৭ )

### গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৪-এ যখন ভারত জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন শেষ হচ্ছে, যখন আন্দামানে, বক্সায়, দেওলীতে, হিজলিতে, ভারতের বিপ্লবী যৌবন আত্ম-জিজ্ঞাসায় নিমগ্ন, তখন বাংলাদেশে ইংরেজ সরকারের তাণ্ডব দমননীতি চলছে, যার নাম ছিল অ্যান্ডারসনী রাজ।[১] তার বর্ণনা দিয়ে "আত্মজীবনী"-তে জওহরলাল নেহরু লিখেছেন : "বাংলার বহু অঞ্চলে তখন এক অভূতপূর্ব অবস্থা।...যে সব ছেলে বা মেয়ের বয়স ১২ থেকে ২৫-এর মধ্যে, তাদের প্রত্যেককে সর্বদা সঙ্গে সরকার প্রচারিত পরিচয়পত্র রাখতে হ'ত। হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে স্কুল-কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। ছেলেমেয়েরা কি পোষাক পরবে, সরকার তা স্থির করে দেয়। বহু স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয় বা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। সাইকেলে চড়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়। পুলিশের কাছে বহু ছাত্রকে নিয়মিত হাজিরা দিতে হ'ত, সূর্যাস্তের মধ্যে বাড়ি ফিরতে হত ; বহু ক্ষেত্রে সান্ধ্য আইনও জারি ছিল। বিরাট অঞ্চল যেন ছিল বন্দী শিবির বা বিদেশী ফৌজের দখলে।[২]

১৯৩১-এ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগ্রাম যখন তুঙ্গে, তখন বিপ্লবভীত জাতীয় নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সঙ্গে আপস করে স্বাক্ষর করলেন গান্ধী আরউইন চুক্তি। তার একপক্ষকাল পরে, ২৩ মার্চ ফাঁসী হল ভারতের যৌবনের প্রিয় বিপ্লবী নেতা ২৪ বছর বয়স্ক সর্দার ভগৎ সিং-এর, রাজগুরুর, শুকদেবের।[৩] ভারতের যৌবন ফেটে পড়ল বিক্ষুব্ধ মিছিলে। করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে যুবসমাজের প্রতিবাদ মিছিলে ধ্বনি উঠল : নও জোয়ানকা কেয়া মিলা, ভগৎসিংকো ফাঁসী মিলা। করাচীর ছাত্ররা গান্ধীজিকে অভ্যর্থনা জানালেন, তাঁর হাতে এক স্তবক কালো রঙের গোলাপ ফুল তুলে দিয়ে।[৪]

১৯৩৪-এ কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রত্যাহার করলেন দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন। হাজার হাজার কারারুদ্ধ ও অন্তরীণ ছাত্রযুব কর্মীর মনে তখন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ ও আত্মজিজ্ঞাসা। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামী শ্রমিক নেতা রজনী মুখার্জীকে ঘিরে কলকাতায় গড়ে উঠল একটি

ছাত্রগোষ্ঠী, তাদের মধ্যে ছিলেন ধরিত্রী গাঙ্গুলি, উমাপদ মজুমদার প্রমুখ। ১৯৩৩-এ হিটলারের ক্ষমতা দখলের পর জার্মানীতে গ্রেপ্তার হ'ন তরুণ ভারতীয় কমিউনিস্ট ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথের বড় ছেলে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মুক্তি পেয়ে তিনি দেশে ফিরলে তাঁকে ঘিরেও গড়ে ওঠে এক ছাত্র যুব গোষ্ঠী—সনৎ রায়চৌধুরী, অরুণ ব্যানার্জি প্রমুখ তাঁদের মধ্যে প্রধান। ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে সামনে রেখে তাঁর পুত্র নির্মল সেনগুপ্ত, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রমুখ গড়ে তোলেন বেঙ্গল লেবার পার্টি—সমাজতন্ত্রের আদর্শ সামনে রেখে। তাঁদের সমর্থক ছাত্রযুবকর্মী প্রমোদ সেন, নন্দলাল বসু প্রমুখ গড়ে তুলতে থাকেন একটি ছাত্রগোষ্ঠী।

সর্বোপরি সদ্য বেআইনী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা নেতৃত্বও চিন্তা করতে থাকেন গণ ছাত্র আন্দোলন গড়ার। তমলুকের বামপন্থী যুব-কংগ্রেস সংগঠক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৪-এ যোগ দেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে, তাঁকেই পার্টি দায়িত্ব দেয় ছাত্র আন্দোলন গড়ার। তাঁর কথাতেই এযুগের একটু বর্ণনা দেব :

।। ১৯৩৪-এর এপ্রিল মাসে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হ'লাম। কলকাতার বিভিন্ন কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বামপন্থী মনোভাবসম্পন্ন অগ্রসর ছাত্রদের নিয়ে মার্কসবাদ—লেনিনবাদের ক্লাস শুরু করলাম। আমারই মতো সদ্য জেল প্রত্যাগত নৃপেন চক্রবর্তী ও তাঁর কিছু সহযোগী সঙ্গী মিলে আমরা বঙ্গীয় তরুণ ছাত্রসংঘ গঠন করি। অল্পদিনের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার এই সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করে।…এই সময় ছাত্র আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের জন্য বামপন্থী মনোভাবাপন্ন বিভিন্ন দল ও গ্রুপের ছাত্রদের তরফ থেকে আগ্রহ দেখা যাচ্ছিল। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে পুরানো দু'ট ছাত্রসংগঠন ( এ. বি. এস. এ. ও বি. পি. এস. এ. ) প্রায় উঠে গিয়েছিল বললেই চলে। তাই কমিউনিস্ট পার্টির অনুগামী, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুগামী ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামী ছাত্রদের সবলকে জড়ো করে ও বিভিন্ন কলেজ থেকে ছাত্র প্রতিনিধি নিয়ে ১৯৩৫-এর ডিসেম্বরে একটি প্রাদেশিক ছাত্রসম্মেলন হয়।।[৫]

এই ছাত্রসম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির প্রচার-সচিব ছিলেন কালীপদ মুখোপাধ্যায় ( তখন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, পরে আই. এন. টি. ইউ. সি.র বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা )। তাঁরই নামে ইংরেজিতে একটি ইশতাহার ছেপে সম্মেলনের আগে ছাত্রসমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়। ১৯৩৫-এর ৯ ডিসেম্বরে কলেজ স্কোয়ার অ্যালবার্ট হলে ( এখন যেটি কফি হাউস ) অনুষ্ঠিত ছাত্র প্রতিনিধিদের সভাতে ইস্তাহারটি প্রস্তাব হিসাবে গৃহীত হয়।[৬]

সংস্কৃতির জগতের সুপরিচিত সংগঠক ও ইতিহাস-গবেষক প্রয়াত চিন্মোহন সেহানবীশ উপস্থিত ছিলেন এই সম্মেলনে। স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেছেন: "ছাত্র সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সভাতে সৌমোন ঠাকুরের সমর্থকরা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য সৌমেন্দ্রনাথের নামই করল; রায়পন্থীরা প্রস্তাব করল নেহেরুপন্থী নেতা রফি আহমদ্ কিদোয়াই-এর নাম; আর বিশ্বনাথ প্রমুখ কমিউনিষ্টরা প্রস্তাব করল হীরেনবাবুর (অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) নাম। আমি হীরেনবাবুর নাম সমর্থন করে বললাম, ইনি তরুণ অধ্যাপক, তাছাড়া মার্কসবাদী মতাদর্শের জন্য সম্প্রতি চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন। এঁকেই সম্মেলনে সভাপতি করা উচিত। প্রস্তাবটি শেষ অবধি গৃহীত হ'ল এবং সম্মেলনের খসড়া প্রস্তাব রচনা করার কমিটিতে আমিও স্থান পেলাম।"[৭]

পূর্বেই উল্লিখিত ইশতাহারটির মুখবন্ধে লেখা ছিল: "সাম্প্রতিককালে সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ কায়রোতে ছাত্রদের নির্মমভাবে গুলি করে মেরেছে; লাহোরে ভারতীয় ছাত্রদের উপর বর্বর লাঠি চালনা করেছে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিবিপ্লবী চিয়াং সরকারের বিরুদ্ধে পিকিং শহরে চীনা ছাত্ররা বিরাট মিছিল সংগঠিত করেছে। এসব কিছু থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে ছাত্ররা আর কোনও দেশেই সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রতা ও দমননীতি মুখ বুজে সহ্য করতে রাজী নয়। ছাত্ররা! বন্ধুরা! আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে কি কোনও অসন্তোষ নেই? আমরা কি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে নিপীড়িত নই? অনেক দিন আমরা ঝিমিয়ে কাটিয়েছি, আর নয়! জেগে উঠুন বন্ধুরা, সারা বিশ্বের সংগ্রামী ভাইদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের ন্যায্য দাবী পেশ করুন, গড়ে তুলুন একটি নিখিলবঙ্গ ছাত্র সংগঠন।"[৮]

১৯৩৫-এর ডিসেম্বরে ঐ সম্মেলন থেকেই জন্মলাভ করল একটি প্রাদেশিক ছাত্রসংগঠন, তার নাম হল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র লীগ, সাধারণ সম্পাদক হলেন বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়।

এর কয়েকমাস পরে ১৯৩৬-এ লখনৌতে অনুষ্ঠিত হ'ল এক সারা ভারত ছাত্রসম্মেলন—প্রধানতঃ নেহেরু পন্থীদের, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামীদের ও কমিউনিষ্টদের মিলিত উদ্যোগে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জওহরলাল নেহরু, সভাপতিত্ব করেন মহম্মদ আলি জিন্নাহ্। সেই সম্মেলন থেকে জন্মলাভ করে নিখিল ভারত ছাত্র-ফেডারেশন। ঐ বছরই অক্টোবর মাসে কলকাতাতে, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠকদের উদ্যোগে কলকাতায় আর একটি প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল। সেখান থেকেই জন্ম নিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন। তার প্রথম

সাধারণ-সম্পাদক হলেন কালীপদ মুখোপাধ্যায়। সভাপতি হলেন নির্দলীয় বামপন্থী ছাত্র কে. এম. আহমদ। ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র লীগ তখনই মিশে গেল না, কিন্তু আন্দোলনের ক্ষেত্রে একসঙ্গেই কাজ করতে লাগল।

১৯৩৬-এর শেষভাগে একটি ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সামরিক শিক্ষা দেবার জন্য একটি বাহিনী গঠিত হয়—University Training Corps (U. T. C.)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য নির্দেশ জারী করলেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে যে কুচকাওয়াজ হবে, তাতে U. T. C-র ছাত্রদের ইংরেজদের পতাকাকে অভিবাদন করতে হবে।। ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং বিদ্যাসাগর কলেজের দুই রায়পন্থী ছাত্রনেতা ধরিত্রী গাঙ্গুলী ও উমাপদ মজুমদার ছাত্রদের সর্বাত্মক বিক্ষোভ ধর্মঘটের অন্যতম নেতা হওয়ায়, তাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারী করা হয়। প্রতিবাদে ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র লীগ একত্রে, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সারা কলকাতাব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট সংগঠিত করে এবং বিরাট ছাত্রমিছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গিয়ে এই বহিষ্কার আদেশের প্রত্যাহার দাবী করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট নীতি স্বীকার করে, বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। ইংরেজের পতাকাকে সেলাম করার প্রথাও লুপ্ত। এটা ছাত্র আন্দোলনের একটা বড় মাপের গণতান্ত্রিক জয়।[৯]

১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭-এ বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচন হয়। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতাহারে সমস্তরকম দমনপীড়নমূলক আইন রদ ও সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি ছিল। ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৬টিতে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করে ও শর্তাধীনে মন্ত্রিসভা গঠন করে। এই সমস্ত প্রদেশে অধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি পায়। বাংলাদেশে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজাদলের মিলিত মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির প্রশ্নে তারা নীরব থাকে।

তখন ১৯৩৭-এর ২৪শে জুলাই সুদূর আন্দামানের বন্দীশালায় আটক দুই শতাধিক বিপ্লবী বন্দীর মধ্যে ১৮৭ জন অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। তাঁদের দাবী ছিল: সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর বিনাশর্তে মুক্তি এবং অবিলম্বে আন্দামান থেকে বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনা। ২ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে বিরাট জনসভা হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।[১০] ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্রলীগের যুক্ত উদ্যোগে পরিচালিত বিশাল ছাত্রমিছিল শহর পরিক্রমা করে টাউনহলের সভায় যোগ দেয়।[১১]

আবেগজড়িত স্বরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর লিখিত ভাষণে বলেন, "রাজনৈতিক বন্দীরা দাবী করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আন্দামান হইতে ফিরাইয়া আনা হউক।

এই দাবী ন্যায্য এবং সামান্য।...ভারতবর্ষে যে সকল প্রদেশে গণপ্রতিনিধিগণ শাসনরশ্মি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সকল প্রদেশে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা সংকোচক সমস্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। শুধু বাংলাদেশেই শত শত যুবক এখনও বিনা বিচারে আবদ্ধ আছে। বাংলাদেশে প্রায়ই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে শাসকবর্গ জনমতের তোয়াক্কা রাখেন না। বাংলায় ব্যক্তিস্বাধীনতা মরুভূমির মরীচিকার মতই অলীক।...আমরা জানি, ইতিপূর্বে আর একবার আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনজন বন্দীর মৃত্যু হইয়াছিল। অনশনকারী বন্দীদিগকে বলপূর্বক খাওয়াইবার যে নিষ্ঠুর নীতি তাহাই ঐ তিনজনের মধ্যে দুইজনের মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ। আমরা আবার উহা অপেক্ষা অধিক বন্দীকে, ঐরূপ শোচনীয়ভাবে মরিতে দিব কি? বাংলা গবর্নমেণ্ট দিবেন কি?"[১২]

ঐ বন্দীমুক্তি সভার শেষে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্পাদক করে 'আন্দামান রাজনৈতিক বন্দী সাহায্য সমিতি' গঠিত হয় ও কমপক্ষে অবিলম্বে সমস্ত রাজবন্দীকে দেশে ফিরিয়া আনার জন্য গণআন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। ১৪ আগষ্ট "আন্দামান বন্দীমুক্তি দিবস"রূপে পালিত হয়। ছাত্র লীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে ছাত্র ধর্মঘট হয় সারা কলকাতায়। এক মাইল দীর্ঘ ছাত্র মিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে স্ট্র্যান্ড রোডে পড়লে, পুলিশ সেখানে মিছিলের উপর বর্বর লাঠি চালনা করে। আহত হন ছাত্র নেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, উমাপদ মজুমদার ও আরও ২০ জন ছাত্রছাত্রী। প্রতিবাদে আইনসভা থেকে বেরিয়ে আসেন বেশ কয়েকজন সদস্য—কমলকৃষ্ণ রায়, বঙ্কিম মুখার্জি, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রমুখ। কয়েকজন ছাত্র নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তারও করে।[১৩]

এই লাঠিচালনা ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পরদিন ১৫ আগষ্ট শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিরাট জনসভা হয়। ধর্মঘট করে' প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী। তাঁরা এসে যোগ দেন শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভাতে।[১৪] ছাত্রদের দাবীর সমর্থনে মুখর হয় সারা দেশ। ১৭ আগষ্ট শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটি বিরাট ছাত্র সমাবেশ থেকে ঘোষণা করা হয় যে আন্দামান বন্দীরা দেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত, ছাত্র আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। সমাবেশে সভাপতিত্ব ছাত্রনেতা উমাপদ মজুমদার, বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট ছাত্রনেতারা—বিশ্বনাথ মুখার্জি; ধরিত্রী গাঙ্গুলী, বিশ্বনাথ দুবে, শ্রমিক নেতা রজনী মুখার্জি ও বন্দীমুক্তি সাহায্য সমিতির সম্পাদক সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১৫]

২৮ আগষ্ট ছাত্র ধর্মঘট হল সমগ্র বাংলাদেশে। কলকাতায় বিশাল

ছাত্র সমাবেশ হ'ল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে, সভাপতিত্ব করলেন ছাত্রনেতা নন্দলাল বসু। সভাতে প্রস্তাব হল যে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক সকলে মিলে বন্দীমুক্তির দাবীতে সর্বাত্মক ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। জাতীয় কংগ্রেসকে সক্রিয় সমর্থন জানাতে হবে ছাত্রদের এই আন্দোলনকে।[১৬]

বন্দীমুক্তি আন্দোলনের এই পর্বের কথা বলতে গিয়ে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় লিখছেন :

"সমস্ত কমিউনিষ্ট ও বামপন্থী ছাত্রদের সম্মিলিত যোগদানে এই আন্দোলন দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠল ও সাফল্য লাভ করল। এই আন্দোলনের ভিতর দিয়েই সর্বপ্রথম অসংখ্য স্কুলে কলেজে ছাত্রদের আন্দোলন কমিটি গঠিত হল। এগুলিই হয়েছিল ভবিষ্যতে ছাত্র ফেডারেশনের ব্যাপক ও শক্তিশালী সংগঠনের ভিত্তি।...এই ১৯৩৭ সালেরই ডিসেম্বরের শেষে অ্যালবার্ট হলে ছাত্র ফেডারেশনের প্রাদেশিক সম্মেলনে নূতন কর্মসূচী ও গঠনতন্ত্র গৃহীত হ'ল এবং আমি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলাম।"[১৭]

১৯৩৮ সালের সূচনাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন বন্দীমুক্তির আন্দোলন আরম্ভ করল। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে ফিরে এলেন ও বন্দীমুক্তির আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন। ১৯৩৮-এর ১৪ মার্চ সারা বাংলা বন্দীমুক্ত দিবস হিসাবে পালিত হ'ল। এই দিবস পালন করার জন্য দেশবাসীর কাছে ঐক্যবদ্ধ আহ্বান জানালেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশরফ উদ্দীন আহমদ, সহ-সভাপতি বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নেতা গুণদা মজুমদার, বঙ্গীয় লেবার পার্টির সম্পাদক কমল সরকার, কমিউনিষ্ট নেতা মুজফ্ফর আহমদ ও বঙ্কিম মুখার্জি, রায়পন্থী শ্রমিক নেতা রজনী মুখার্জি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়।[১৮] ঐদিন কলকাতার টাউন হলে ছাত্র যুবসমাজের বিশাল বন্দীমুক্তি সমাবেশে, সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বসু বল্লেন : "যতদিন একজনও রাজনৈতিক বন্দী কারারুদ্ধ থাকবেন, ততদিন আমাদের এই বন্দীমুক্তি আন্দোলন থামবে না।"[১৯]

অবশেষে, ১৯৩৮-এর জুলাই মাসে হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিল যে একমাত্র দীর্ঘ মেয়াদী দণ্ড প্রাপ্ত বিপ্লবী বন্দীরা ছাড়া, আর সমস্ত বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের ও দণ্ডাপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের সরকার বিনাশর্তে মুক্তি দেবে। সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে না পারলেও, বাংলার ছাত্রসমাজ, এই ঘোষণাকে বন্দীমুক্তি আন্দোলনে ছাত্রসমাজের এক বিরাট জয় বলেই অভিনন্দিত করল। হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দী কারামুক্ত হয়ে এলেন, অভিনন্দন জানালেন বাংলার ছাত্র আন্দোলনকে। মুক্ত বন্দীদের শতকরা

পাঁচাত্তর ভাগই আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে, প্রধানতঃ কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসাবেই।

## ছাত্র-আন্দোলন সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়ল (১৯৩৮-৩৯)

১৯৩৭ সালে ডিসেম্বরে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক ছাত্র-সম্মেলন থেকে বাংলার ছাত্র আন্দোলনের জন্য একটি সামগ্রিক কর্মসূচী গৃহীত হয় এতেই সর্বপ্রথম কয়েকটি মূলনীতি ঘোষণা করা হয়—ছাত্র-আন্দোলন জাতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে কাজ করবে, কিন্তু কোনও বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর লেজুড়ে পরিণত হবে না। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার দাবি বা বন্দীমুক্তির দাবি ছাড়াও, ছাত্ররা তাদের নিজস্ব শিক্ষাগত দাবি নিয়েই দৈনন্দিন আন্দোলন করবে। তা ছাড়া, দেশের শ্রমজীবী জনসাধারণের সমস্ত রকম দাবি ও সংগ্রামের সমর্থনেও তারা সামিল হবে। তা ছাড়া থাকবে নানান ধরনের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কাজকর্ম। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে এই-সমস্ত কর্মসূচীকে ভিত্তি করে অগণিত ছাত্রসংগ্রাম পরিচালিত হয় এবং ছাত্র ফেডারেশন ছড়িয়ে পড়ে বাংলার প্রায় সমস্ত শহরে ও বহু গ্রামেও। বিশ্বনাথ মুখার্জি লিখেছেন: "এই সময়ে রাজনীতিক্ষেত্রে, সমাজজীবনে, শিক্ষাক্ষেত্রে, স্কুল-কলেজে ছাত্রদের অধিকার ও বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী যে অসংখ্য গণসংগ্রাম ও গঠনমূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করেছে, তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে, সে এক মহাভারত হয়ে যাবে।"[২০]

তবু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া দরকার। কলেজে ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে বহু ধর্মঘট-সংগ্রাম পরিচালিত হয়। তার মধ্যে স্কটিশ চার্চ সেন্ট জেভিয়ার্স ও দৌলতপুর কলেজের ছাত্র-ধর্মঘটগুলিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৮-এ হরিপুরা অধিবেশনের সময় সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তিনি ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। ১৯৩৮-এ কলেজের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে, স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র সংসদ সুভাষচন্দ্রকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানায়। তাতে বাধা দেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। প্রতিবাদে স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করে। দীর্ঘদিন ধরে চলে সেই ধর্মঘট। তার নেতৃত্ব দেন ছাত্র ফেডারেশন ও তার স্থানীয় কর্মীরা—প্রশান্ত সান্যাল, অমিয় মুখার্জী, অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য, দিলীপ রায়চৌধুরী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বর্তমানের খ্যাতিমান প্রগতিশীল চলচ্চিত্র-পরিচালক মৃণাল সেনও ছিলেন এই ছাত্র-ধর্মঘটের ও ছাত্র ফেডারেশনের একজন কর্মী। সারা কলকাতার ছাত্ররা ধর্মঘটী স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত কলেজের কর্তৃপক্ষ

নীতি স্বীকার করেন—জয়যুক্ত হয় ছাত্র-আন্দোলন।[২১] ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাও ছড়িয়ে পড়ে নতুন নতুন কেন্দ্রে।

এই সময়ই নির্বাচিত ছাত্র সংসদের দাবিতে ধর্মঘট হয় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। সেখানে ছাত্রনেতাদের অন্যতম ছিলেন সুভাষচন্দ্রের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র—অরবিন্দ ও কল্যাণ বসু। ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে সারা কলকাতার ছাত্ররা এখানেও ধর্মঘটী ছাত্রদের পাশে সমবেত হয়। পরিপূর্ণ বিজয় এখানে সম্ভব হয় না। অরবিন্দ বসুকে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ছেড়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হতে হয়, কিন্তু কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত ছাত্রসংসদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন।

খুলনা জেলার দৌলতপুর কলেজের ছাত্ররাও, ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে নির্বাচিত ছাত্রসংসদের দাবিতে দুবার দীর্ঘ ধর্মঘট সংঘটিত করেন ও অনশন ধর্মঘটও করেন। সেখানকার কর্তৃপক্ষও শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত ছাত্রসংসদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন।[২২] এর পর প্রায় প্রত্যেক কলেজেই নির্বাচিত ছাত্র-সংসদ চাই' এই রণধ্বনি নিয়ে বাংলার ছাত্রসমাজ সংগ্রামের ময়দানে নেমে পড়েন এবং প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জয়যুক্ত হয়। তার ফলে ছাত্র ফেডারেশনও হয়ে ওঠে কলেজের ছাত্রদের প্রায় একমাত্র সর্বজনপ্রিয় ছাত্রসংগঠন।

অপর একটি আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্র ফেডারেশন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে এবং সেই আন্দোলনটির মধ্য দিয়ে সূচিত হয় এক অসাধারণ সামাজিক প্রগতিশীল জয়।

শত বছরের পুরানো স্বৈরাচারী জের টেনে প্রায় প্রতিটি ইস্কুলেই তখনও চালু ছিল ভয়াবহ দৈহিক প্রহার ও বেত্রাঘাতের প্রথা। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় ছাত্র ফেডারেশন। ব্যাপক প্রচার-আন্দোলন চালানো হয় স্কুলগুলিতে এবং সাধারণভাবে শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে। তার ফলে বহুলাংশে এই দাবি স্বীকৃত হয় এবং সরকারিভাবে ছাত্রদের দৈহিক নির্যাতন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে স্কুলের ছাত্রদের মধ্যেও ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র ফেডারেশন গভীর শিকড় গাঁথতে সক্ষম হয়।[২৩]

ত্রিশের দশকে বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার বাংলাদেশ, বিশেষতঃ পূর্ববাংলায় ও মেদিনীপুরে, ছাত্রদের উপর বহু কঠোর বিধিনিষেধ জারি করেছিল। এই-সমস্ত অঞ্চলে সকল ছাত্রকেই পরিচয়পত্রস্বরূপ নিজের সঙ্গে নানান রঙের কার্ড রাখতে হত, এবং কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়মিত নিজেদের দৈনিক কাজকর্মের জন্য কৈফিয়ত দিতে হত। ১৯৩৮ সালেও এইসব কঠোর ব্যবস্থা চালু ছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ১৯৩৮-এ ছাত্রজীবনে এই দমননীতির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করে। সে যুগের

ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সঠিকভাবেই লিখেছেন যে 'আন্দোলনের ঝড়ে এই অবস্থা উড়ে যায় এবং এইসব জায়গার ছাত্ররা মুক্ত হয়।"[২৪]

বাংলার ছাত্র-আন্দোলনের এই ব্যাপ্তি ও গভীরতা শুধু সাম্রাজ্যবাদকেই আতঙ্কিত করে নি, দেশের কায়েমী স্বার্থকেও বিচলিত করেছিল। ফলে ছাত্র-আন্দোলনকে বহু নিন্দা, কুৎসা ও আক্রমণেরও মোকাবিলা করতে হয়। তার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন বের করলেন তাঁদের মাসিক মুখপত্র 'ছাত্র অভিযান'। ছাত্র ধর্মঘট পরিচালনায় দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে প্রদেশের অন্যতম প্রধান ছাত্রনেতা প্রভাত দাশগুপ্ত লিখলেন "ছাত্র ধর্মঘটগুলি কি অকারণে ছেলেখেলা, না কোনও কারণসমষ্টির অবশ্যম্ভাবী ফল? ছাত্রফেডারেশন কি শিক্ষায়তনে নিয়মানুবর্তিতা ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সত্যিই জেহাদ ঘোষণা করছে, না শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সত্যিকারের সম্বন্ধ স্থাপনে সচেষ্ট? বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন তার এই দুই বৎসরের জীবনে প্রায় ৭০টি ধর্মঘট পরিচালনা করেছে। তাদের একটিও বিনা কারণে বা ছাত্র ফেডারেশনের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য হয় নি। তাদের প্রত্যেকটি ছাত্রদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশে যত বড় বড় ছাত্র-ধর্মঘট হয়েছে তার কয়েকটার ইতিহাস আলোচনা করলেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।'[২৫]

আর একটি দিক থেকেও এই ব্যাপক প্রগতিশীল ছাত্র-আন্দোলন আক্রান্ত হতে থাকে। অতি-বামপন্থী মহল থেকে সমালোচনা আসতে থাকে যে আমাদের দেশের ছাত্রসমাজ পেটি-বুর্জোয়া বা মধ্যশ্রেণী থেকে আসছে, তাই সর্বহারা বিপ্লবের তারা মিত্র হতে পারে না। সুতরাং বামপন্থীদের, ছাত্র-আন্দোলন করে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। তার জবাব দিতেও ছাত্র ফেডারেশনের নেতারা দ্বিধা করেন নি। ছাত্রনেতা রমেন ব্যানার্জী লেখেন: "ছাত্র-আন্দোলনকে আদৌ বিপ্লব-বিরোধী মনে করবার কোনও কারণ নেই। ধনিক-শ্রেণীর শোষণের ফলে নিম্নমধ্যবিত্তরা সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হতে থাকে এবং এই শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার চেষ্টা করে এবং শ্রমিক-চাষীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এগোয়।...সুতরাং ছাত্র-আন্দোলন যদি পেটি-বুর্জোয়া আন্দোলনও হয়, তবু তাকে ঠিকমত পরিচালনা করলে সে যে বিপ্লবী শক্তিরূপে দেখা দেবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।"[২৬]

এই যুগে ছাত্র-আন্দোলনের আর একটি বড় অবদান, কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায়, ল্যাণ্টার্ন স্লাইড সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ব্যাপক নিরক্ষরতা-বিরোধী অভিযান ও সেই সঙ্গে সঙ্গে কৃষক-জনতার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া। সে-যুগের ছাত্র-আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি কে. এম.

আহমদ, স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এ সম্বন্ধে লিখছেন : "১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে বি. পি. এস. এফ গণসাক্ষরতা অভিযান সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিল। দেশবাসীর উপর সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিবরণ দিতে ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইড তৈরী হল। সেই নিয়ে দল ছড়িয়ে পড়ল। অবনী লাহিড়ীর নেতৃত্বে পরিচালিত দলটির সঙ্গে বার্মার একদল ছাত্রনেতাও যোগ দিলেন। আমাদের গণসাক্ষরতা অভিযানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাঁরা উৎসুক ছিলেন। দলটি যখন ২৪ পরগনার শ্রমিক ও কৃষক এলাকায় ঘুরতে লাগল, তখন সত্যি সত্যিই হাজার হাজার লোক লোক তাদের কথা শোনার জন্য সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় জড়ো হতে লাগলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে পুলিশী তৎপরতা শুরু হল। আদেশ জারি হল এই দল গ্রামের ভিতর গিয়ে প্রচার করতে পারবে না।"[২৭] (আন্দোলনের দিনগুলির স্মৃতিচারণা, স্মারকগ্রন্থ, ১৯৭৬)। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ও এ সম্বন্ধে একই কথা বলেছেন : "ছাত্রদের প্রধান সামাজিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটকে একটি ক্ষুদ্র চক্রের হাত থেকে বার করে ছাত্র-সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে ছাত্র ফেডারেশনই পেরেছিল (১৯৩৮)। এই ইনস্টিটিউটেই বহুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে বয়স্ক সাক্ষরতা দান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ট্রেনিং দিয়ে, ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে গ্রামে পাঠাতে পেরেছিল ছাত্র ফেডারেশন।"[২৮]

জাতীয় দাবি ও ছাত্রদের নিজস্ব দাবির উপর আন্দোলন করা ছাড়াও ছাত্র ফেডারেশন প্রগতিশীল ছাত্রসমাজের দৃষ্টিকে ফিরিয়েছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গী ধর্মঘটগুলির সমর্থনেও। তার সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ঘটনাটি ঘটে রানীগঞ্জে কাগজের কলের দীর্ঘ ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে। দালাল-ভর্তি লরি চালিয়ে কারখানায় ঢোকবার চেষ্টা করছিল মালিকদের হাতের লোক, সাহেব ইঞ্জিনীয়ার। বর্ধমানের ছাত্রনেতা ও তখন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী সুকুমার ঝাঁপিয়ে পড়লেন লরির পথ আটকে। তাঁকে চাপা দিয়ে হত্যা করে চলে গেল লরি। ফেটে পড়ল শ্রমিকদের বিক্ষোভ। "সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল হরতাল— রানীগঞ্জে, আসানসোলে, বর্ধমানে। বর্ধমানের ছাত্ররাও করল ধর্মঘট। তিন দিন, তিন রাত ধরে হরতাল চলল রানীগঞ্জে। শোকে মুহ্যমান হয়ে অনেকে আহার ছেড়ে দিল। শহরে বাতি জ্বলল না, রাস্তাঘাট পরিষ্কার হল না। ···পেপার মিলের বাবুর্চি-খানসামারা কাজ ছেড়ে দিল। মেথরেরা চলে গেল। খোদ ইউরোপীয়ান অফিসাররা পালিয়ে গিয়ে আসানসোলে আশ্রয় নিল। শিয়াল-কুকুরও যেন ডাক বন্ধ করল—এমনি শ্মশানপুরী হয়ে উঠল রানীগঞ্জ।"[২৯]

এই যুগে ছাত্র-আন্দোলনের আর-একটি স্মরণীয় কাজ—পৃথিবীজোড়া ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতাকামী

ছাত্র আন্দোলনকে পরিচিত ও যুক্ত করা। স্পেনে গণতন্ত্র রক্ষার ও চীনে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামকে কেন্দ্র করে ছাত্র ফেডারেশন বহু সভা ও মিছিল সংগঠিত করে এবং অগ্রজরা স্পেন ও চীনের প্রতি সৌভ্রাত্রবোধ জানিয়ে যে কমিটিগুলি করেছিলেন, তাদের সমস্ত কাজে সহায়তা করে। স্পেনে পপুলার ফ্রন্টের সরকারের সমর্থনে এবং আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, কলকাতার যে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী জাতীয় কমিটি গঠিত হয় (১৯৩৭), তার সভাপতি ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, এস. এ. ডাঙ্গে, নবকৃষ্ণ চৌধুরী, স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি। সম্পাদক ছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ এক বিবৃতিতে বলেন: 'আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের এই ভয়ংকর বন্যাকে রুখতেই হবে···স্পেনের জনগণের অগ্নিপরীক্ষা ও দুঃখবরণের মুহূর্তে মানবতার বিবেকের কাছে আমি আবেদন করছি। স্পেনের পপুলার ফ্রন্টের পাশে দাঁড়ান, জনগণের সরকারকে সাহায্য করুন, লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি তুলুন: প্রতিক্রিয়া দূর হঠো। লাখে লাখে এগিয়ে আসুন গণতন্ত্রের সাহায্যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষায়।"[৩০]

ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে বাংলার ছাত্ররা এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে। স্পেনের সংগ্রামরত 'আন্তর্জাতিক ব্রিগেডকে অভিবাদন জানিয়ে ছাত্র ফেডারেশন বহু ছাত্রসভা থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করল। ১৯৩৮-এর ৯ জানুয়ারি কলকাতার ছাত্ররা ব্যাপকভাবে সভা করে, চাঁদা তুলে 'চীন দিবস' পালন করল। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ধিক্কারে মুখর হল। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: 'চীনের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারে আজ আমাদের হৃদয় উৎপীড়িত। আমরা অত্যাচারীকে নিন্দা করছি। বলা যেতে পারে, নিন্দা করে কী লাভ? এই দুঃখবোধ দ্বারা দানবের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে, আমরা সেই সৃষ্টির পক্ষে কাজ করছি—এর শক্তি যতই ক্ষীণ হোক, এও সৃষ্টির কাজ।···আমাদের মেশিনগান নেই, কিন্তু আমাদের চিন্তা আছে—তার মূল্য যতটুকুই হোক, তাকে আমরা মহত্তের দিকে প্রয়োগ করব।"[৩১]

এই ১৯৩৮ সালেই স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী, তরুণ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় একটি কবিতা লিখলেন: 'চীন ১৯৩৮'—তা সচকিত করে দিল সমগ্র ছাত্রসমাজকে, সমস্ত কাব্যানুরাগীকে। সুভাষ লিখেছিলেন:

জাপ পুষ্পকে
ঝরে ফুলঝুরি
জ্বলে হ্যাংকাও!
কমরেড আজ
বজ্রকঠিন
বন্ধুতা চাও?

লাল নিশানের
নীচে উল্লাসী
মুক্তির ডাক।
রাইফেল আজ
শত্রুপাতের
সম্মান পাক।

এইভাবে বাংলার ছাত্র-আন্দোলন শুধু দেশের নয়, সর্বদেশের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে জোরালো আন্দোলন গড়ে তুললেন। ১৮৩০-এ কলকাতার একদল ছাত্র ফরাসী বিপ্লবকে অভিবাদন জানিয়ে, মনুমেন্টের মাথায় উড়িয়ে দিয়েছিল স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রীর জয়পতাকাকে। আর তার শতবর্ষ পরে তাদেরই পতাকাবাহী বাংলার ছাত্র-ফেডারেশন ও ছাত্রসমাজ ব্যাপকভাবে এসে দাঁড়াল স্পেন ও চীনের মরণজয়ী ছাত্রযুবসমাজের পাশে, বিশ্বের যুবশক্তির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঘোষণা করল 'নো পাসারান—ফ্যাসিবাদকে রুখবই।

## যুদ্ধ দমননীতি ও সংগ্রাম ( ১৯৩৯-১৯৪১ )

১৯৩৯-এ ভারতের জাতীয় আন্দোলনে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ ও সংঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী, এম. এন. রায়পন্থী ও নির্দলীয় বামপন্থীরা একজোট হয়ে স্থির করলেন যে সুভাষচন্দ্র বসুকেই পুনরায় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করতে হবে। সমগ্র দক্ষিণপন্থীরা মিলিত হয়ে প্রার্থী দাঁড় করালেন পট্টভি সীতারামাইয়াকে, স্বয়ং গান্ধীজী তাঁকে সমর্থন জানালেন। বাংলার ছাত্রসমাজ ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে বিপুলভাবে সমর্থন জানাল সুভাষচন্দ্রকে, বামপন্থী ঐক্যকে। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কিন্তু ত্রিপুরীতে কংগ্রেস অধিবেশনে দক্ষিণপন্থী চক্রান্তে কোণঠাসা হলেন সুভাষচন্দ্র। কয়েক মাস পরে তিনি পদত্যাগ করলেন সভাপতির পদ থেকে। ছাত্রসমাজ তার জবাব দিল, ১৯৩৯-এর শেষে দিল্লীতে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সংগ্রামী কনভেনশনে সুভাষচন্দ্রকেই সভাপতির পদে বরণ করে। ইতিমধ্যে অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে এবং ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দমননীতি চণ্ডমূর্তি ধারণ করেছে। "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও জঙ্গী অভিযান চালাবার উদ্দেশ্যে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন ১৯৩৯ সালের শেষে ও ৪০ সালের জানুয়ারি মাসে দিল্লীতে বিরাট কনভেনশন সংগঠিত করেছিল। তার আগে ত্রিপুরী কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব দ্বিতীয়বারের নির্বাচিত সভাপতি সুভাষ-

বাবুকে অন্যায়ভাবে অপসারিত করলেও, ছাত্র ফেডারেশন দিল্লী কনভেনশনে তাঁকেই সভাপতি হিসাবে নিয়ে এসেছিল। এই কনভেনশনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিনিধিদলই ছিল সবচেয়ে সক্রিয়।"৩২

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাতে বাংলার ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র ফেডারেশনের সবচেয়ে বড় দান, সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির বর্শাফলককে অন্তত সাময়িকভাবে ভোঁতা করে দিতে পারা। বিশ্বযুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে, সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা হুকুম জারি করেছিল যে তাদের অনুমতি না নিয়ে কেউ সভা, মিছিল, এমনকি সংগঠনের কমিটি-সভাও করতে পারবে না। এর বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ সবাই করল, কিন্তু এগিয়ে গিয়ে এই ফতোয়াকে অগ্রাহ্য করার ডাক—কি কংগ্রেস, কি সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক—কেউই দিল না। সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল বাংলার ছাত্র ফেডারেশন, আর তাতে বিপুলভাবে সাড়া দিল বাংলার ছাত্রসমাজ।

ছাত্র ফেডারেশন স্থির করল যে ১৯৪০-এর ২৬ জানুয়ারি, তারা ইংরেজের ফতোয়াকে অমান্য করে, ছাত্র-ধর্মঘট, মিছিল ও সমাবেশ করবে। কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইংরেজ সরকারের আদেশ অমান্য করতে দেশবাসীকে নিষেধ করলেন। বে-আইনী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সে নির্দেশ উপেক্ষা করল। তাদের কলকাতা জেলা কমিটি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এক ইশতাহারে ঘোষণা করল যে বাংলা সরকার যুদ্ধের সুযোগে দেশবাসীর সমস্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতা কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র করেছে। তার বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকেই সংগ্রামী প্রতিরোধের পথে এগিয়ে আসতে হবে। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব আপসের পথে পা বাড়িয়েছেন, আর ফরোয়ার্ড ব্লক গরম বুলি ছাড়লেও কার্যক্ষেত্রে কিছুই করছেন না। ছাত্রদের তাই ছড়িয়ে পড়তে হবে কারখানার গেটে, বস্তিতে, গ্রামে সর্বত্র—সংগঠিত করতে হবে ধর্মঘট ও মিছিল, বানচাল করে দিতে হবে দমননীতির রাজত্বকে—প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনও তার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামে, একটি ইশতাহার বিলি করে। তার মূল বক্তব্য ছিল ইংরেজের বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে, ধর্মঘট করে মিছিল করে, অর্ডিন্যান্স-রাজকে চূর্ণ করে ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালন করো। এই দুটি ইশতাহারই, প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, বাজেয়াপ্ত করে ইংরেজ সরকার।৩৩

১৯৪০-এর ২৫ জানুয়ারি বিদ্যাসাগর, রিপন, সিটি প্রভৃতি কলেজের ছাত্ররা, শত শত সশস্ত্র পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে, ছাত্র ফেডারেশনের পতাকা হাতে বিশাল মিছিল বের করে শহর পরিক্রমা করে। তাদের মুখে ধ্বনি : ১৪৪ ধারা বাতিল করো। অর্ডিন্যান্স-রাজ ধ্বংস হোক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-

বাদ ধ্বংস হোক।[৩৪] পরদিন ২৬ জানুয়ারি কয়েক হাজার ছাত্রের বিরাট জনসভায় ব্যক্তিস্বাধীনতার সংগ্রামকে অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর নামে জারি হয় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। বিশ্বনাথ আত্মগোপন করেন ও প্রায় তিন বছর সাম্রাজ্যবাদী দমননীতিকে এড়িয়ে, ফেরারীর জীবন যাপন করেন। গ্রেপ্তার হন বেশ কয়েকজন ছাত্রনেতা, আত্মগোপন করেন আরও অনেকে। বহিষ্কৃত ও অন্তরীন হন বহু ছাত্রনেতা। এঁদের মধ্যে ছিলেন অবনী লাহিড়ী, প্রশান্ত সান্যাল, নিখিল মৈত্র, অমিয় দাশগুপ্ত, রমেন ব্যানার্জী, প্রভাত দাশগুপ্ত, নিতাই গাঙ্গুলী প্রভৃতি।

১৯৪০-এর জুলাই মাস থেকে কলকাতার ছাত্ররা সামিল হয় এক বিরাট আন্দোলনে। সে আন্দোলনের সূচনা করেন সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৪০-এর পয়লা জুলাই কলকাতার অ্যালবার্ট হলে এক বিরাট ছাত্র ও জন-সভা হয়। কৃষকপ্রজা দলের আইনসভা সদস্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন সভাপতিত্ব করেন। সুভাষচন্দ্র বসু সভা থেকে আহ্বান জানান যে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের নামে অন্যায় কলঙ্ক লেপন করে, কুখ্যাত অন্ধকূপ হত্যার অভিযোগ এনেছিল যে ইংরেজ শাসক—হলওয়েল, তার স্মৃতিস্তম্ভটি কলকাতার বুক থেকে অপসারিত করতে হবে। সারা ভারত মুসলিম ছাত্র লীগের সভাপতি ওয়াসেক বলেন যে ঐ কলঙ্কিত স্মৃতিস্তম্ভটি সরাতেই হবে। সমর্থন করেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের নেতারাও।[৩৫]

২০ জুলাই থেকে দলে দলে ছাত্র ও অন্যান্য সত্যাগ্রহীরা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে হাতুড়ি হাতে স্মৃতিস্তম্ভটি ভাঙতে অগ্রসর হলেন। কলকাতার টাউন হলে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিরাট জনসভা হল। সভাপতিত্ব করলেন সৈয়দ বদরুদ্দোজা। বক্তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের উদাত্ত আহ্বান জানালেন। তারপর বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্র লীগের যৌথ নেতৃত্বে ছাত্রদের বিরাট মিছিল বের হল হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভের উদ্দেশে। ছাত্রনেতারা ছাড়াও আইনসভার দুজন সদস্য—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেনও মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন। পুলিশ শোভাযাত্রীদের উপর বেপরোয়া লাঠিচালনা করে ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে। বহু সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হন। যাঁরা আহত হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুসলিম ছাত্র লীগের সহ-সম্পাদক নুরুল হুদা ও 'ছাত্রশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক, কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মী মারুফ হোসেন।[৩৬]

৫ জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তার প্রতিবাদে ও বর্বর দমননীতির নিন্দা করে, ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্র লীগের যুক্ত আহ্বানে কলকাতা ও শহরতলীর প্রায় সমস্ত কলেজে ছাত্র-ধর্মঘট ও হরতাল

প্রতিপালিত হয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিরাট ছাত্রসভায় সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান ছাত্র ফেডারেশনের নেতা নিখিল মৈত্র ও মুসলিম ছাত্র লীগের নেতা ওয়াসেক।[৩৭]

১০ জুলাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতি এক বিবৃতি দিয়ে বলে যে সীমাবদ্ধ সত্যাগ্রহে এ সংগ্রামে জয়লাভ করা যাবে না —প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট এবং সমস্ত ছাত্র-সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। মুসলিম ছাত্র লীগ এ আহ্বানে সাড়া দেয়। পুলিশী অত্যাচার আরও হিংস্র হয়ে ওঠে—লাঠি চলে ইসলামিয়া কলেজের মধ্যে। মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ছাত্রদের দাবি মানতে অস্বীকার করেন। ছাত্র আন্দোলন আরও ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত হক মন্ত্রিসভা নতি স্বীকার করে—হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণের প্রতিশ্রুতি দেয়, ছাত্র আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ জয় হয়। এই আন্দোলনের একটি নতুন দিক—মুসলিম ছাত্রদের ব্যাপকভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জঙ্গী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ। মুসলিম ছাত্র লীগের মধ্যে একটি বামপন্থী গোষ্ঠীও এই সময় গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলে সুভাষচন্দ্র, কিন্তু একে ব্যাপক গণচরিত্র দিয়ে, তাকে জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল হিন্দু মুসলমান ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। এই আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে, তিন দশক পরে সে যুগের ছাত্রনেতা কে. এম. আহমদ লিখছেন: "১৯৪০-এর জুলাই মাসে ড্যালহাউসি স্কোয়ার থেকে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের জন্য আন্দোলন শুরু হল। ৫ জুলাই সুভাষচন্দ্র বোস গ্রেপ্তার হলেন, অন্যান্যদের সঙ্গে মিলে ছাত্ররা সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দিলেন। ছাত্র-ধর্মঘট সংগঠিত করার জন্য বি. পি. এস. এফ. জনাব ওয়াসেকের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম ছাত্র লীগের সঙ্গে যোগ দিল। ইসলামিয়া কলেজের সামনে এক বিরাট মিছিলের উপর নৃশংস লাঠিচার্জ হল, অনেক ছাত্র আহত হলেন। মুসলমান ছাত্রদের এক বিরাট মিছিল তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের বাড়ি ঘেরাও করল। আমাদের জাতীয় সম্মানের হানিকর সাম্রাজ্যবাদী কুৎসার স্মারক হলওয়েল মনুমেন্ট শেষ পর্যন্ত অপসারিত হল।"[৩৮] (স্মারকগ্রন্থ, ১৯৭৬) বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ও লিখছেন: "সুভাষবাবুর আহ্বানে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের যে ঐক্যবদ্ধ ও জঙ্গী গণসংগ্রাম হয়েছিল, তাতে ছাত্র ফেডারেশন যোগ্যতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিতে পেরেছিল।"[৩৯] (স্মারকগ্রন্থ ১৯৭৬)

১৯৪০-এর শেষে নাগপুরে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে ভেদপন্থীরা ছাত্র আন্দোলনে খানিকটা ফাটল ধরাবার চেষ্টা করেন, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কতকটা সফলও হন। এতে প্রধান উদ্যোগ ছিল কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের, এবং তাঁদের তল্পিবাহক কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের ছাত্র-

নেতাদের। কিন্তু বাংলাদেশে ভেদপন্থীরা বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের পতাকার নিচেই বেশির ভাগ ছাত্র সংহত ও ঐক্যবদ্ধ থাকেন।

১৯৪০-এ সাম্রাজ্যবাদী গোয়েন্দা দপ্তর বাংলার ছাত্র-আন্দোলনকে কী চোখে দেখেছিল, তার একটু নমুনা দিচ্ছি: "বাংলাদেশে প্রাচীরপত্র ও ইশতাহার মারফত ব্যাপক যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার প্রচ্ছন্নভাবে যথেষ্ট চলছে। এর জন্য প্রধানত দায়ী কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন।"[৪০] ভারতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত গোপন দলিল হোম / পল / এফ. এন ৭/১, ১৯৪১ )

নাগপুরে সারা ভারত ছাত্র সম্মেলনের মূল্যায়ন করে সাম্রাজ্যবাদী গোয়েন্দারাও লিখেছিল: "১৯৪০-এর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে ব্যাপক ছাত্র-ধর্মঘট হয়, যার অন্যতম লক্ষ্য ছিল ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে কমিউনিস্টদের প্রতিষ্ঠিত করা। সমাজতন্ত্রীরা কমিউনিস্ট ছাত্র-আন্দোলনের ঘাঁটি বাংলা, পাঞ্জাব, ও মাদ্রাজ শাখাদের বিতাড়নের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কমিউনিস্টরা অনেক বেশি আটঘাট বেঁধে তৈরি ছিল। তারা এখন প্রত্যেক কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে শাখা তৈরি করার চেষ্টা করছে। আগামী ২৬শে জানুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য তারা সর্বত্র ডাক দিয়েছে।"...[৪১] হোম / পল / এফ, এন ৭/১, ১৯৪১ )

সমগ্র ১৯৪১ সাল ধরে, প্রধানত দমননীতির বিরুদ্ধে ও বন্দীমুক্তির দাবিতে বাংলাদেশে প্রবল ছাত্র আন্দোলন চলতে থাকে। সুদূর দেওলীতে রাজবন্দীরা অনশন ধর্মঘট করলে, তাঁদের মুক্তির দাবিতে কলকাতায় ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট হয়। কানপুরে ও গৌহাটীতে ছাত্রদের উপর লাঠি-চালনায় প্রতিবাদেও কলকতায় ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্র ফেডারেশনই প্রধানত এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ফারুকী কলকাতার আশুতোষ কলেজে বক্তৃতা দেবার সময় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। প্রতিবাদে কলকাতার প্রায় সমস্ত কলেজেই ছাত্ররা ধর্মঘট করে। এক কথায় বলতে গেলে, সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধকালীন সন্ত্রাসের নীতিকে বাংলার ছাত্রসমাজ ( ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ ) নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলন ও গণসংগ্রামের পথে কার্যত বানচাল করে দিতে সক্ষম হয়: এটা বড় কম কৃতিত্ব নয়।

## ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনযুদ্ধের যুগ ( ১৯৪১-৪৪ )

১৯৪১ সালের ২২ জুন নাৎসী জার্মানি সোবিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করল—পৃথিবীর প্রথম, এবং তখন পর্যন্ত একমাত্র সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে চাইল। দ্রুত পরিবর্তিত হল সমগ্র বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র। মিত্রপক্ষের

শিবিরে পুরানো বনেদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের অবস্থিতি সত্ত্বেও, যুদ্ধ মূলত হয়ে দাঁড়াল ফ্যাসি-বিরোধী জনযুদ্ধ। ১৯৪১-এর ৭ই ডিসেম্বর জাপানী ফ্যাসিবাদ যুদ্ধে যোগ দিল। ক্ষয়িষ্ণু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের প্রবল আক্রমণ ঠেকাতে পারল না। জাপ বাহিনী দ্রুত দখল করল মালয়, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ; দখল করল ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। ইতিমধ্যে হিটলারের ঝটিকাবাহিনী সুদূর ইউরোপে নরওয়ে থেকে ভূমধ্যসাগরতীরের গ্রীস পর্যন্ত পদানত করেছে। সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল যুবশক্তি সমবেত হল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, সোবিয়েতের পাশে। ভারতের, বাংলায় যুবশক্তিও পিছিয়ে থাকে নি। রবীন্দ্রনাথ তখন মৃত্যুশয্যায়। সেখান থেকেই তিনি সোভিয়েতের জয়কামনা করে আশীর্বাদ পাঠালেন সোভিয়েত সুহৃদ সমিতিকে—যা জন্মগ্রহন করল ১৯৪১-এর জুলাই মাসে, টাউন হলের এক বিরাট জনসভায়। সে সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ মার্কসবাদী বিপ্লবী নেতা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আর তাতে যোগ দেন বাংলাদেশের সেরা বুদ্ধিজীবীরা। সেই সমিতির স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে থাকেন ছাত্র ফেডারেশনের অগণিত কর্মী। কলেজে কলেজে গড়ে ওঠে 'স্টুডেন্টস এইড টু দি সোভিয়েত' কমিটি। প্রগতিশীল ছাত্র-মিছিলে ধ্বনি ওঠে, 'বাংলার ছাত্রযুবক সোভিয়েতের সাথেই আছে।'

১৯৪২-এর জানুয়ারি মাসে পাটনাতে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে বিশ্বযুদ্ধকে ফ্যাসিবাদবিরোধী জনযুদ্ধ বলে অভিহিত করে সমগ্র ছাত্রসমাজকে ফ্যাসিবাদকে প্রতিরোধ করার সংগ্রামে সমবেত হবার আহ্বান জানানো হয়।

হিটলারের দস্যুবাহিনী কর্তৃক সোবিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই চরিত্র পরিবর্তন সম্পর্কে অদ্যাবধি ছাত্র ফেডারেশনও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসা রটনা হয়ে থাকে (সে যুগেও হয়েছে)। তাই সে বিষয়ে সামান্য আলোচনা অবান্তর হবে না। ১৯৪০-এ রামগড়ে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে, কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর ভাষণে বলেন: "ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ প্রতিদিন আরও শক্তিমান হয়ে উঠছে। ভারত মনে করে যে পৃথিবীর শান্তি ও প্রগতির পথে এইটাই সবচেয়ে বড় বিপদ।···ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদকে ভারত কোন দিনই সহ্য করবে না।"

১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে, বার্দোলীতে, কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে জানালো যে "সোবিয়েত ইউনিয়ন যে-সব মানবিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতীক, সেগুলি মানবপ্রকৃতির জয়যাত্রার

পথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি মনে করে যে যুদ্ধের বিভীষিকায় যদি এইসব উদ্যম ও সাফল্য বিনষ্ট হয়, তবে মানবসভ্যতার পক্ষে তা হবে এক চরম সর্বনাশ। কার্যনির্বাহক সমিতি, মাতৃভূমি রক্ষায় সোবিয়েত ইউনিয়নের জনগণের তুলনাহীন বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করেছে এবং তাদের সোচ্চার অভিবাদন জানাচ্ছে।…"

আগেই বলা হয়েছে যে সোবিয়েত ইউনিয়ন যখন আক্রান্ত হল, রবীন্দ্রনাথ তখন মৃত্যুশয্যায়। "যেদিন অপারেশন করা হয়, সেদিন সকাল বেলা, অপারেশনের আধঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে তাঁর এই শেষ কথা: রাশিয়ার খবর বলো। বললুম, একটু ভাল হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে। মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: 'হবে না? ওদেরই তো হবে। পারবে ওরাই পারবে।' তাঁর সঙ্গে আমার এই শেষ কথা। আমি ধন্য যে যেদিন তাঁর মুখের জ্যোতিতে দেখেছি বিশ্বমানবের বন্দনা।"[৪২]

ভারতের, বিশেষত বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক ছাত্র-যুবসমাজের এক বড় অংশ ইংরেজসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত ক্রোধে অন্ধ হয়ে মনে মনে বললেন যে শত্রুর শত্রু নিশ্চয় আমাদের মিত্র। ফ্যাসিবাদী শক্তিদের সহায়তায় তাঁরা ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের স্বপ্ন দেখলেন। ছাত্র ফেডারেশন সাময়িকভাবে অপ্রিয় হবার ঝুঁকি নিয়েও, এই-সব মত ও পথকে ভ্রান্ত, মারাত্মক ও আত্মহত্যার সামিল বলে ঘোষণা করল। ছাত্রসমাজের মধ্যে ছাত্র ফেডারেশন ব্যাপক প্রচারে নামল—সে প্রচারে তাদের প্রধান হাতিয়ার হল মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সুশোভন সরকারের ছদ্মনামে লিখিত একটি পুস্তিকা (বিজন রায়: জাপানী শাসনের আসল রূপ, জুলাই, ১৯৪২)। তাতে লেখা হল: "রাসবিহারী বসু প্রকাশ্যে, সুভাষচন্দ্র বসু সম্ভবত, জাপানের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা দেশভক্ত, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে তাঁদের চোখ অতীতের দিকে। বর্তমান জগতের অবস্থা তাঁরা বুঝতে চাননি। হয়তো তাঁদের বিশ্বাস যে, জাপানকে দিয়ে শুধু কার্যোদ্ধার করে নেবেন। আমরা যেন না ভুলি তার দাম দিতে হবে সাধারণ লোকদেরই। বাঙলার মজুর, কিষান, ছাত্র আর সাধারণ লোকদের আসল স্বার্থ জড়ানো রয়েছে অন্য পক্ষের সঙ্গে।"[৪৩]

এই যুগে ছাত্র ফেডারেশন কী ধরনের কাজ, কেমনভাবে করত, তার চমৎকার বর্ণনা লিখেছেন সে যুগের ছাত্র-সংগঠক রমাকৃষ্ণ মৈত্র: "সাল ১৯৪১ জুন মাস। হিটলার সোবিয়েতকে আক্রমণ করেছে। আর এম. এ. টেম-এ নয়। এতদিন ফুটপাথে হাঁটছিলাম, এবার রাস্তার মাঝ দিয়ে। জনযুদ্ধ! জনযুদ্ধ! মোড় ফিরলেই স্বাধীনতা আর সাম্য!…বোধ হয় ১৯৪২-এর

মাঝামাঝি। ঠিক হল জনযুদ্ধের সংগ্রাম গ্রামে গঞ্জে কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এর জন্যে চাই প্রচার অভিযান। তৈরি হয়ে গেল ছাত্রদের সাংস্কৃতিক ব্রিগেড। প্রথম পর্যায়ের সফরে পড়ল তখনকার বাংলার প্রান্তিক পাঁচটি জেলা: ঢাকা, মৈমনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম। ঠিক মনে নেই, আট থেকে দশজনের একটি দল গড়ে তোলা হল। নেতা—অন্নদা, অরুণ, রমাকৃষ্ণ।...প্রচার অভিযান। মালমশলা? রাতারাতি জলি কল নাটক লিখে ফেললেন। বিষয়—জনযুদ্ধ এবং সম্ভাব্য জাপানী ফ্যাসিস্ট আক্রমণের প্রতিরোধ। জলি বোধহয় লিখেছিলেন ইংরেজিতে। রাতারাতি তার বাংলা করে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের একটা নাটক তৈরি হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সংগ্রামী গান আর সুভাষের সদ্য-লেখা 'জনযুদ্ধের গান'। মালমশলা বলতে এই।

...দিনে গড়ে দশ থেকে বারো মাইল হাঁটা; এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা। গ্রামবাংলার ঘননিবিড় পথে যেতে যেতে গান। বিকেলে পৌঁছানো, সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান। রাতে কোথাও চর্ব্য-চোষ্য, কোথাও মোটাভাত আর কুমড়োর ঘ্যাঁট। ঘুমনো—কোথাও পালঙ্ক, কোথাও খোলা আকাশ।"[৪৪]

প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের দায়িত্ব এই সময় যেমন কঠিন, তেমনই বিপজ্জনক ছিল; একদিকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা ছাত্র ফেডারেশনের উপর দমন-পীড়ন প্রায় অব্যাহত রেখেছিল। অপরদিকে ইংরেজ-বিদ্বেষ থেকে যারা সাময়িক ভাবে ফ্যাসিস্ট শক্তিদেরও বন্ধু মনে করত, তারাও ছাত্র ফেডারেশনের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছিল—দৈহিক আক্রমণও। ১৯৪২-এর ৮ই মার্চ ঢাকার ছাত্র ফেডারেশনের পুরনো কর্মী ও তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয় বাংলার প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ, প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন বাংলার কবি, গায়ক শিল্পী ও সাহিত্যিকরা। ছাত্র-কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় গান লিখলেন:

বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ
রুখবো দস্যুদলকে আজ
দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ
ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরাও ছাত্র ফেডারেশনের কার্যকলাপকে গভীর সন্দেহের চোখে দেখত। রাজশাহী জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলন সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বাংলার গোয়েন্দা দপ্তর, ১৯৪২ এর ১৮ এপ্রিল মন্তব্য করছে যে, 'অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শুভ্রাংশু মৈত্র, ফ্যাসিস্টবিরোধী প্রচারের আড়ালে ইংরেজ সরকারের তীব্র ধিক্কার জানায়..."[৪৫]

বাংলার গভর্ণর সার জন হার্বার্ট ও বড়লাট লিনলিথগোকে এক গোপন

পরে লেখেন ( ২৩ জুলাই, ১৯৪২ ) : 'ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা জাপান বিরোধী জনসভায় যেমন বক্তৃতা করেছে, তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে আমাদের গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে প্রচার বন্ধ করার তাদের কোন বাসনাই নেই।"৪৬ সরকারী গোপন দলিল থেকে এরকম বহু উদ্ধৃতিই খুঁজে পাওয়া যায়।

ইতিহাসের এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে, বাংলার ছাত্র আন্দোলনকে সংহত করার জন্য বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশন ১৯৪২ এর এপ্রিল মাসে খুলনায় প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে ছাত্রসমাজকে জমায়েত করা। তথাপি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও তার আমলাতন্ত্র এই ছাত্র সম্মেলনকে বানচাল করার জন্য কোমর বেঁধে লেগে যায়। প্রাদেশিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদককে তারা গ্রেপ্তার করে ও সম্মেলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। এই দমননীতির বিরুদ্ধে সমগ্র খুলনা জেলায় ও বাংলাদেশে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। শেষ পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনের চাপে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় ও বিপুল উৎসাহের মধ্যে ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৪ ও ৫ এপ্রিল গান্ধী পার্ক মণ্ডপে, ২৪টি জেলা থেকে তিন শতেরও বেশি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সব ভারতীয় ছাত্রনেতা যজ্ঞদত্ত শর্মা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ও সম্মেলনে মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন বাংলার বিশিষ্ট ছাত্রনেতা প্রভাত দাশগুপ্ত। প্রস্তাবের মুখ্য কথা ছিল এই যে জনযুদ্ধের মারফত ফ্যাসিবাদী শক্তিবর্গ যুদ্ধে পরাজিত হলে, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থারও অন্তিম লগ্ন উপস্থিত হবে। সুতরাং ছাত্রসমাজকে সর্বশক্তি দিয়ে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনযুদ্ধের সমর্থনে সমবেত হতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর অবিলম্বে মুক্তি দাবি করেও সম্মেলন সোচ্চার হয়।

ইতিমধ্যে দেশের পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠল। ভারতের জাতীয় নেতাদের দাবি ছিল যুদ্ধের পরেই ক্ষমতা হস্তান্তর ও এই মুহূর্তে জাতীয় সরকার গঠন করতে দেওয়া। স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্সের দৌত্য চার্চিলের বাধায় ব্যর্থ হল এবং অন্ধ বিক্ষোভে দেশ ফুসতে লাগল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে জাতীয় নেতাদের বৃহৎ অংশ মনে করলেন যে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন অনুচিত, কারণ জাপানী ফ্যাসিস্টরা আসছে ইংরেজের শত্রুরূপে নয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ স্বয়ং সে কথা বলে ক্ষুব্ধ মন্তব্য করেছেন : "আমি তাঁর মতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম কিন্তু বহু তর্কবিতর্ক করেও তাঁর মত বদলাতে পারি নি।"৪৭

কারাগারে বসে জওহরলালও লিখেছিলেন : "ভারতবর্ষেও অনেকে

মর্মে মর্মে এই যুদ্ধের বিপ্লবী তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিল। কিন্তু এরকম লোকের সংখ্যা ছিল নিতান্ত পরিমিত।।[৪৮]

১৯৪২-র ৮ই আগস্ট বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হল। ৯ই আগস্ট শুরু হয়ে গেল সাম্রাজ্যবাদের চন্ড দমনীতি ও বেপরোয়া ধরপাকড়। তার বিরুদ্ধে ফেটে পড়ল দেশবাসীর অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ত গণসংগ্রাম। সারা আগস্ট মাস ধরেই সংগ্রামে উত্তাল রইল ভারতবর্ষ। বাংলাদেশও পেছিয়ে রইল না। ১০ই আগস্টই সারা কলকাতার ছাত্ররা ধর্মঘট করল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে বিরাট ছাত্র মিছিল শহরময় শ্লোগান দিয়ে ঘুরল, জাতীয় নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি দাবি করল।[৪৯] ১১ ও ১২ আগস্টেও সমগ্র কলকাতায় ছাত্র ধর্মঘট ও বিরাট মিছিল হল। ছাত্র ধর্মঘটের খবর এল সমস্ত জেলা থেকে, দূরদূরান্ত থেকে। ১৩ আগস্ট কলকাতার ছাত্র-শোভাযাত্রীদের উপর পুলিশ নৃশংস লাঠি চালনা করল। ছাত্র ফেডারেশন প্রতিবাদসভা করল মহম্মদ আলী পার্কে।

ছাত্রদের সম্মিলিত আন্দোলনে আতঙ্কিত সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চাপ দিয়ে সমস্ত কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দিল। ১৫ আগস্ট ঢাকাতে ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট হল। পুলিশ গুলি চালাল ধর্মঘটী ছাত্রদের উপর, হত্যা করল পাঁচ জনকে। প্রতিবাদে পরদিন বাংলা-দেশের সমস্ত স্কুল-কলেজে পরিপূর্ণ ধর্মঘট হয়ে গেল।[৫০]

১৮ থেকে ৩০ আগস্ট, বাংলাদেশের সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির প্রতিবাদে, নিজেদের প্রকাশ স্থগিত করল। ৩১ আগস্ট কাগজগুলি আবার প্রকাশিত হলে, তখন সমস্ত সূত্র থেকে সংবাদ এলে, স্পষ্ট বোঝা গেল যে ১৯৪২এর গোটা আগস্ট মাস, প্রায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশে একটানা ছাত্রধর্মঘট চলেছে। ফলে আতঙ্কিত সাম্রাজ্যবাদীরা এক ফতোয়া জারি করে পুজার ছুটির সঙ্গে ট্রেনে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিল।

কংগ্রেস অ-কমিউনিস্ট বামপন্থী দেশগলির সমর্থক ছাত্রসংগঠনগুলি 'ভারত ছাড়ো' ধ্বনি অব্যাহত রেখে, সংগ্রাম পরিচালনার চেষ্টা করল। কিন্তু কলেজ গুলি বন্ধ থাকায় তারা কার্যত কোনও গণ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে পারল না। তা ছাড়া, সাম্রাজ্যবাদী চন্ড দমননীতিতে ক্ষিপ্ত হয়ে, তারা বহুক্ষেত্রেই ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্পর্কে উদাসীন রইল, এমন কি বেশ কিছুক্ষেত্রে কার্যত ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের সপক্ষে প্রচার করতে থাকল। ছাত্র ফেডারেশনই এ যুগে একমাত্র ছাত্র সংগঠন যে মাথা ঠান্ডা রেখে, সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামও অব্যাহত রাখল, আবার জাপ বিরোধী প্রচারও

জোর কদমে চালাতে থাকল। ১৯৪২ এর ৫ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির সভার মূল প্রস্তাবে বলা হল যে "বর্তমান সংকট সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্টি…ভারতকে ফ্যাসিবাদের হাত থেকে রক্ষা করার নামে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আমলাতন্ত্রের এই শেষ বেপরোয়া চেষ্টা। কিন্তু দমননীতির ফলে আমলাতন্ত্রের একটি উদ্দেশ্যও সফল হয়নি। সমস্ত দেশে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে উঠেছে।…এই অবস্থায় ছাত্র সমাজের কর্তব্য : দেশরক্ষার জন্য জাতীয় সরকারের মুক্তির জন্য আন্দোলন করা…জাতীয় ঐক্যের জন্য সংগ্রামই আজ স্বাধীনতা লাভ এবং স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র বিপ্লবই পথ।"৫১

স্কুল কলেজ আবার যখন খুলল, তখন ছাত্র ফেডারেশন কি ছাত্রদের ক্লাসে যেতে বলবে, না ধর্মঘট করবে? তারও সঠিক উত্তর দিয়েছিল ছাত্রফেডারেশনের পূর্বোক্ত ঐ সভা : 'ছাত্র সাধারণই মিলিতভাবে ভোটে স্থির করবে, তারা ক্লাসে যাবে, না ধর্মঘট করবে; এবং আমরা সে সিদ্ধান্তই মেনে চলব। আমাদের কাজ ছাত্রসাধারণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলা—তাদের উত্তেজনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়াও নয়, তাদের ছেড়ে এগিয়ে যাওয়াও নয়।"৫২

পুজোর ছুটির অব্যবহিত কাল পরে প্রাদেশিক ছাত্র নেতৃত্ব ছাত্র ফেডারেশনের সমস্ত কর্মীদের কাছে জরুরী আহ্বানে জানালেন : "আর মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সর্বত্র ঐক্যবাহিনী গঠন করুন। স্কুলে কলেজে, শহরে, গ্রামে, পাড়ায়, প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ব্যাপক প্রচার চালান। যেখানে স্কুল-কলেজ বন্ধ, সেখানে তো খোলার জন্য ছাত্রদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করুন, জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য গণস্বাক্ষর নিন এবং সাথে সাথে ছাত্র ফেডারেশনের সভ্য সংগ্রহ করুন। একটি ছাত্রও যেন বাদ না থাকে।"৫৩

ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধের গতি গভীর সংকটময় হয়ে ওঠে। সমগ্র পূর্ব এশিয়া পদানত করে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের হিংস্র থাবা ভারতের উপর উদ্যত হয়। বীরত্বপূর্ণ দীর্ঘ প্রতিরোধের পর সেবাস্তোপোলের পতন হয় ও নাৎসী অভিযান ভলগা-তীরে স্তালিনগ্রাদ দখলের জন্য মরীয়া চেষ্টা শুরু করে। উত্তর আফ্রিকায় জার্মান সমরযন্ত্র দ্রুত কায়রো ও সুয়েজ অঞ্চলের দিকে এগোতে থাকে। ছাত্র-কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় যখন "পূর্বতোরণে শত্রুর থরনথর, পশ্চিমে প্রতিহত ঝঞ্ঝাবাহিনী। শহীদ সেবাস্তোপোলে আর দুর্জয় ষ্ট্যালিনগ্রাডে মুক্তিকামী দুনিয়ার বজ্রবাহু। হয় বাঞ্ছিত মুক্তি, নয় দাসত্ব লাঞ্ছিত শৃংখল—দ্বিতীয় পথ নেই।"৫৪

যুদ্ধের আগুন ভারতকেও ঝলসে দিল। জাপানী বোমারু বিমান ২৫ অক্টোবরে ব্যাপক বোমাবর্ষন করল চট্টগ্রামে, ডিব্রুগড়ে ও আসামের অন্য কয়েকটি অঞ্চলে। ডিসেম্বর মাসে বোমা পড়ল কলকাতায়। খিদিরপুর

বন্দর এলাকায় বোমাবর্ষণে বহু শ্রমিক প্রাণ হারাল। ছাত্র ফেডারেশন জাপ-বিরোধী প্রচারকে তীব্রতর করল। জনসাধারণের মনোবল অক্ষুন্ন রাখার জন্য বোমা আক্রান্ত অঞ্চলে ছাত্র প্রচার-দলগুলি বক্তৃতা ও গানের মারফত মানুষের মনে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগ্রত করতে থাকল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখলেন :

"এখানেও আজ তাই প্রতিরোধ প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার।
গড়ে তুলি দুর্জয় প্রাকার
সম্মুখ সমরে লাল পল্টনের খুন
মুক্তির পদাঙ্ক রাখে।"

নতুন এক উদ্দীপ্ত কিশোরের কণ্ঠে শোনা গেল :

চট্টগ্রাম ? বীর চট্টগ্রাম।
...তোমার সংকল্পস্রোতে ভেসে যাবে লোহার গরাদ
এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।
তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম
আমার হৃৎপিণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম।
( সুকান্ত ভট্টাচার্য : চট্টগ্রাম ১৯৪৩ )

প্রতিরোধের গান বাঁধলেন বিনয় রায় :

হোই হোই হোই
জাপান ঐ
আস্যে বুঝি
হামার টারীত,
বার‍্যাও গাঁ-র
গেরিল্লা জুয়ান ( বিনয় রায় : জনযুদ্ধের গান )

আর এইসব গান ও কবিতা গেয়ে, আবৃত্তি করে বাংলার শহর প্রান্তর মুখরিত করে তুলল ছাত্র ফেডারেশনের অগণিত কর্মী ও সদস্য।

১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারিতে কারারুদ্ধ গান্ধীজী অনশন করলেন। তাঁর মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশ জুড়ে ছাত্রসভা ও মিছিল হল। কলকাতার বিরাট ছাত্রসভায় গান্ধীজীর মুক্তি দাবি করে উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দিলেন ছাত্রনেতা অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য। ২১ থেকে ২৩ আগস্ট রাজশাহীতে প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন হল প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে। সম্মেলনে বীরভূম ছাড়া সমস্ত জেলা থেকেই ছাত্র-প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। সভাপতিত্ব করেন প্রসিদ্ধ প্রাক্তন ছাত্র-নেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। সংগঠনের নতুন সাধারণ সম্পাদক হলেন অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য।

এর পরই এল বাংলায় মহামন্বন্তর। লক্ষ লক্ষ মানুষ একমুঠো অন্নের

জন্য শহরে ছুটে এল, প্রাণ হারাল ফুটপাথে। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল ছাত্রসমাজ ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে। শুরু হল 'বাংলাকে বাঁচাও' আন্দোলন। ১৯৪৩-৪৪ সালে ছাত্র ফেডারেশনের রণধ্বনিই ছিল, যেখানে একজনও ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী আছে, সেখানেই অন্তত একটি রিলিফ কিচেন খুলতে হবে। অগণিত শহরে ও গ্রামে লঙ্গরখানা খুলে নিরন্ন দেশবাসীর মুখে অন্ন তুলে দিয়েছে ছাত্র ফেডারেশনের কয়েক হাজার কর্মী। মহামারীর বিরুদ্ধে অভিযানে এগিয়ে এসেছিল কলকাতার বিভিন্ন মেডিকেল স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। মাসের পর মাস গ্রামে পড়ে থেকে তারা সংগ্রাম করেছে মহামারী ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে সভাপতি অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তীকে কোষাধ্যক্ষ ও ছাত্র ফেডারেশনের নেতা সুনীল মুন্সীকে যুগ্ম সম্পাদক করে গড়ে উঠল ছাত্র-শিক্ষক যুক্ত রিলিফ কমিটি। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাঞ্জাব, বোম্বাই, বিহার, মাদ্রাজ ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে অর্থ, বস্ত্র, খাদ্য ও ঔষধ নিয়ে বাংলায় ছুটে এল ছাত্রদের গড়া বহু রিলিফ স্কোয়াড।

১৯৪৩-এ আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ছাত্র ফেডারেশনের নেতা অন্নদাশংকর ভট্টাচার্যের উদ্যোগে ও ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের নেতৃত্বে স্কুলের ছেলেমানুষ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'কিশোর বাহিনী' নামে নতুন সংগঠনের জন্ম। দেশপ্রেম, জনসেবা ও সমাজতন্ত্র—এই তিন আদর্শকে সামনে রেখে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে কিশোর বাহিনী বাংলার কিশোর-কিশোরীদের অতিপ্রিয় সংগঠন হয়ে ওঠে। অল্পদিনের মধ্যেই এই সংগঠনের মধ্যমণি হয়ে ওঠে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। বাংলাদেশের বহু শহরে ও গ্রামে কিশোর বাহিনী অভিনয় করেছে সুকান্তের লেখা কাব্য নাটিকা 'অভিযান'। নাটকের শেষে একদল কিশোর কিশোরী যখন মঞ্চের উপর দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করত : "রাজার উপর আর করব না নির্ভর, আমাদের ভাগ্যের আমরাই ঈশ্বর" —তখন ছোটবড় সকল দর্শকের করতালিতে ভরে যেত প্রেক্ষাগৃহ।

এই যুগের ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের সাহস ও দৃঢ়তার কথা একটু বলা দরকার। আগেই বলা হয়েছে যে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনযুদ্ধের নীতি দেশবাসীকে বোঝানো খুবই কঠিন কাজ ছিল। আমাদের শত্রু ইংরেজ; সুতরাং তাদের শত্রু জাপান আমাদের মিত্র—এই চিন্তায় ভেসে গিয়েছিল দেশপ্রেমিক ছাত্র-যুবসমাজের এক বৃহৎ অংশ। বাংলাদেশের ছাত্র-যুবসমাজের সবচাইতে প্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসু স্বয়ং এই ধরনের মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। ফলে বাংলাদেশের ছাত্র ফেডারেশনের পথে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী দায়িত্ব পালন করা তখন খুবই কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু, নিন্দা, ধিক্কার বা

দৈহিক নির্যাতন—কোনও কিছুই ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪-এ ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের কর্তব্যচ্যুত করতে পারেন নি।

ছাত্র ফেডারেশনের বহু নেতা ও কর্মী এই বিভ্রান্ত দেশপ্রেমিকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। তিন জন বিশিষ্ট ছাত্রকর্মী—মৈমনসিংহের ফণী চক্রবর্তী ও ভানু মজুমদার এবং ঢাকার কচি নাগ—আততায়ীদের আক্রমণে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু ছাত্র ফেডারেশনের একজন কর্মীও প্রচার থামান নি বা কোনও ভীরুতা প্রদর্শন করেন নি।

১৯৪৪-এর ডিসেম্বরে কলকাতার মহম্মদ আলী পার্কে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন হল। সভাপতিত্ব করলেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি ছিলেন সদ্য কারামুক্ত দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডু এবং সম্মেলন উদ্বোধন করলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে বাংলার তথা ভারতের ছাত্রসমাজের ও বিশেষত ছাত্র ফেডারেশনের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করলেন বিধানবাবু। বাংলার ছাত্রসমাজকে অভিনন্দন জানিয়ে সরোজিনী নাইডু বললেন: "আত্মহত্যা আমরা করিনি—আত্মত্যাগ করেছ তোমরা, বাংলার তরুণ সমাজ। তোমাদের ধন্যবাদ জানাই। বাংলার ঘোর দুঃসময়ে তোমরা জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে অসামান্য সেবাকার্য করেছ কে তা অস্বীকার করবে? এখন স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম আসন্ন। ঝগড়া ভুলো, একজোট হও, চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত ও সংহত হও।" সম্মেলনের সমাপ্তি-ভাষণে ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন: "তোমরা ছাত্র-ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেছ। এই আশা নিয়ে আমি তোমাদের সম্মেলনে এসেছিলাম যে তোমরা ছাত্র-ঐক্য গড়ার কথা বলবে। আমি আনন্দিত যে তোমরা ছাত্র-ঐক্যের পথে অনেকদূর এগিয়ে গেছ। ঐক্য একদিনে আসবে না, ধাপে ধাপে তা গড়ে উঠবে। ঐক্যের দরজা তোমরা খুলে দিয়েছ...”[৫৬] সম্মেলনের শেষ দিনে, দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী দৃপ্ত কণ্ঠে আওয়াজ ওঠাল: 'ফ্যাসিবাদ ধ্বংস হোক', 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক', 'ছাত্র-ঐক্য জিন্দাবাদ।'

এই যুগের ও এর ঠিক পরবর্তী বছরগুলির ছাত্র আন্দোলনের আর একটি স্মরণীয় অবদান নতুন গণমুখী প্রগতিশীল সংস্কৃতির জন্মদান। তার চমৎকার মূল্যায়ন করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

"ছাত্র ফেডারেশন থেকেই যে সাংস্কৃতিক স্কোয়াড তৈরি হয়েছিল, তা বিভিন্ন সময়ের প্রয়োজনে সারা বাংলাদেশ ঘুরত। এঁদের অনেকেই পরবর্তী কালে সংস্কৃতিজগতে খ্যাতিমান হয়েছেন। তা ছাড়া ৪২ সালে যখন ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গড়ে উঠল সেটাও সম্ভব হয়েছিল ছাত্র ফেডারেশনের জন্য।...যে নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন যুদ্ধের মধ্যে

বাংলাদেশে গড়ে ওঠে, এক হিসাবে বলা যায় ছাত্র ফেডারেশন তার জমি তৈরি করেছিল।[৫৭]

ছাত্র ফেডারেশনেরই কর্মী ছিলেন স্বয়ং সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, গোলাম কুদ্দুস, রাম বসুর মতো কবি, কর্মী ছিলেন আজকের প্রসিদ্ধ গায়িকা সুচিত্রা মিত্র, গণনাট্য সংঘের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের অনেকেই, বহুরূপীর তৃপ্তি মিত্র, চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন, চিত্রকর সোমনাথ হোড়, সংগীতকার সলিল চৌধুরী এবং আরো কয়েকশত তরুণ তরুণী যাঁরা পরবর্তী তিন দশক ধরে প্রেরণা যুগিয়েছেন প্রগতিশীল সাহিত্যে, শিল্প, নাটকে ও চলচ্চিত্রে। বাংলার সংস্কৃতি জগতে ছাত্র আন্দোলনের এ অবদান সত্যিই মনে রাখার মতো।

## অসমাপ্ত বিপ্লব (১৯৪৫-৪৭)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল ১৯45-এ। চূর্ণ-বিচূর্ণ হল নাৎসী জার্মানি। বার্লিনে ফ্যাসিবাদের ধ্বংসস্তূপের উপর বিজয়ী লালফৌজ উড়িয়ে দিল মুক্তির লাল ঝাণ্ডা। পৃথিবীর প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র সোবিয়েত ইউনিয়নের লক্ষ লক্ষ নওজোয়ানের অকাতর আত্মদানের মাধ্যমে চূর্ণ-বিচূর্ণ হল ফ্যাসিস্ট রণদানব, রাহুমুক্ত হল সমস্ত পৃথিবী। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ফ্যাসিবাদের কবলমুক্ত হয়ে পা বাড়াল জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, সমাজতন্ত্রের পথে। এশিয়াতেও জাপানী ফ্যাসিবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র গণ-উত্থানের পথে মুক্ত হল সমগ্র ইন্দোচীন, (ভিয়েতনাম, লাওস বা কম্বোডিয়া)। মুক্ত হবার সংগ্রাম শুরু করল ইন্দোনেশিয়া। ভারতবর্ষও তখন একটা ক্রোধের জমাট আগ্নেয়গিরি।

এই পরিস্থিতিতে, আগস্ট মাসের শেষে, কুচবিহারে ছাত্রদের উপর বর্বর অত্যাচার চালাল পুলিশ বাহিনী। কারারুদ্ধ রাজবন্দীরাও প্রায় একই সময় প্রতীক অনশন ধর্মঘট করলেন মুক্তির দাবিতে। বাংলার ছাত্রসমাজ অসহ্য ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশন তখন সময়োচিত নেতৃত্ব দিল—২৯ আগস্ট বন্দীমুক্তি ও দমননীতি-বিরোধী দিবস তথা কুচবিহার দিবস পালনের আহ্বান জানাল সারা বাংলার ছাত্রছাত্রীদের কাছে। ছাত্ররা বিপুল সাড়া দিল এই আহ্বানে। ধর্মঘট হল কলকাতার প্রায় প্রত্যেকটি কলেজে। রাস্তা দিয়ে সংগ্রামী মিছিল বের করল প্রায় আট হাজার ছাত্রছাত্রী। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের জনসভায় জমায়েত হল ১৫ হাজার ছাত্র-জনতা। সভাপতিত্ব করলেন প্রবীণ কংগ্রেসসেবী ও বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী অধ্যাপক ক্ষিতিশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ছাত্রনেতারা ছাড়াও, সভায় বক্তৃতা করলেন চোদ্দ বছর পরে সদ্য-কারামুক্ত চট্টগ্রাম বিপ্লবী শ্রীমণি দত্ত। সভাপতি আশা

প্রকাশ করেন যে সমস্ত রাজবন্দী মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রদের এই ঐক্যবদ্ধ অভিযানের অবসান হবে না।[৫৮]

৯ সেপ্টেম্বর থেকে ধর্মঘট করল প্রায় ১৩ হাজার ট্রামশ্রমিক ইংরেজ মালিকদের বিরুদ্ধে। তাদের সমর্থনে এগিয়ে এল ছাত্র ফেডারেশন ও অন্য সমস্ত ছাত্রসংগঠনের কর্মীরা। কলেজে কলেজে সভা করে চাঁদা তুলল ছাত্র সাধারণ, ধর্মঘটীদের সাহায্য করার জন্য। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পথসভা করল ছাত্রকর্মীরা ট্রাম শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে, ধ্বনি তুলল: ট্রাম মজুর, ট্রাম যাত্রী এক হও। প্রচন্ড দমননীতির সামনেও অটুট রইল ট্রাম ধর্মঘট। ছাত্ররা অচল করে দিল শহরের অন্যান্য পরিবহণ ব্যবস্থাকেও। ইংরেজ মালিক পিছু হটল, বিরাট জয় হল শ্রমিকশ্রেণীর। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বড় জয়।

ইতিমধ্যে দেশে এবং ছাত্রজগতে সবচেয়ে বেশি চাঞ্চল্য দেখা দিল লাল কেল্লায় বন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের বিচার নিয়ে। কমিউনিস্ট বিরোধী, জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠনগুলি ডাক দিল ছাত্র ধর্মঘটের। ২১ নভেম্বর, ১৯৪৫; হাজার হাজার ছাত্র বেরিয়ে এল রাজপথে। দৃপ্ত ধ্বনি তাদের মুখে 'লাল কিল্লে কো তোড় দেও, আজাদ ফৌজ কো ছোড় দেও', আর 'চলো দিল্লী'। ছাত্রসভায়, অন্ধ কমিউনিস্ট বিদ্বেষ থেকে তারা বলতে দিল না ছাত্র ফেডারেশনের নেতাদের। ছাত্র ফেডারেশনের নেতারা ও কর্মীরা কিন্তু তবুও রইলেন সেই জঙ্গী ছাত্র মিছিলে, ধ্বনি তুললেন সংগ্রামী ছাত্র ঐক্যের সপক্ষে। ধর্মতলা স্ট্রীট আর ম্যাডান স্ট্রীটের মোড়ে ধর্মতলার উপর সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার পুলিশ মিছিলের পথ আটকাল। তারপর যা ঘটল তা ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে গেছে।

ছাত্ররা দৃঢ়, শান্তভাবে বসে রইল। তাদের দাবি: ১৪৪ ধারার এলাকা ডালহৌসি স্কোয়ারে তাদের যেতে দিতেই হবে। তদানীন্তন প্রধান কংগ্রেসী নেতা শরৎ বসু ছাত্রদের কাছে এলেন না, চিঠি পাঠালেন ছাত্রদের ফিরে যেতে পরামর্শ দিয়ে। কয়েকজন ছাত্র চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিল, সমগ্র মিছিল চীৎকার করে জানাল: আমরা ফিরে যাব না। একটি ছেলে গান গাইতে শুরু করলো সতেজে 'কদম কদম বাড়ায়ে যা'। মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠতে লাগল 'জয়হিন্দ' আর ডালহৌসি চলো। সন্ধ্যা ৬টায় গোরা সার্জেন্ট ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, মিছিলের উপর চলল গুলি, ধর্মতলা স্ট্রীটে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ল রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও গরিব নওজোয়ান আবদুস সালাম। আহত হল আরও অনেকে। তলপেটে গুলি লাগল পোস্টগ্র্যাজুয়েট বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র, ছাত্র ফেডারেশনের নেতা অরুণ সেনের। কিন্তু মিছিল ফিরে গেল না ছত্রভঙ্গ হয়ে আবার জড়ো হল তারা। ছাত্রাবাস থেকে কাতার দিয়ে ছাত্রেরা এসে বসে পড়ল তাদের পাশে। বসলেন কংগ্রেস গরিব আর অগ্রজ দেশসেবকরা—মহিলা নেত্রী

বিমলপ্রতিভা দেবী আর জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী,—কমিউনিস্ট নেতা নৃপেন চক্রবর্তী, ছাত্রনেতা রমেন ব্যানার্জী ও আরও অনেকে। বসে রইল মিছিল সারা রাত, ব্যারিকেড গড়ে, সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর মুখোমুখি। পরদিন ২২ নভেম্বর তামাম কলকাতা ভেঙে পড়ল ধর্মতলা স্ট্রীটে। শুধু মিছিল আর মিছিল। লালঝাণ্ডার ডাকে সাধারণ ধর্মঘট করেছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক—কাঁকিনাড়া থেকে বজবজ অবধি. চাকা বন্ধ করেছে ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি আর রিকশা। ইসলামিয়া কলেজের ছাত্ররা এল মুসলিম লীগের সবুজ পতাকা নিয়ে। হাজার হাজার ছাত্র দৌড়ে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল তাদের সবুজ পতাকা গিঁট দিয়ে বেঁধে দিল কংগ্রেসের তেরাঙ্গা ঝাণ্ডার সাথে। পূর্ব কলকাতা থেকে রঙকলের মজুরদের মিছিল এল, লালঝাণ্ডা হাতে। তাদেরও বুকে জড়িয়ে ধরল ছাত্ররা, রক্তপতাকাও বেঁধে দিল তেরঙ্গা আর সবুজ পতাকার সাথে। পতাকা, দল, মত আর ছাত্র-জনতার মিলন—ব্যারিকেডের সামনে, সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি, স্বাধীনতার শেষ লড়াইয়ের মহড়া চলছে। ছাত্রদের মুখে মৃত্যুভয়হীন শ্লোগান: জয় হিন্দ্‌। চলো ড্যালহাউসি। চলো দিল্লী। ইংরেজ, তুমি ভারত ছাড়ো।

মিছিলের স্রোতে সেদিন ভেসে গিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের বাধা, পালিয়ে গিয়েছিল গোরা পল্টন আর বন্দুকধারী গুর্খা ফৌজ। জয় হয়েছিল নিরস্ত্র মিছিলের, বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনের। ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের উপর মৃত্যু-পরোয়ানা জারি হয়েছিল—তার পুরোভাগে ছিল বাংলার ছাত্র-সমাজ।[৫৯] আর এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে সঠিক নেতৃত্বদানের মধ্য দিয়ে, ছাত্রদের বৃহৎ অংশের মনে কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশন সম্বন্ধে আগের দু বছরের সন্দেহ ও রাগ বহু পরিমাণে কেটে গেল। প্রায় রাতারাতি ছাত্র ফেডারেশন আবার হয়ে দাঁড়াল বাংলার সংগ্রামী ছাত্র-আন্দোলনের সবচেয়ে আস্থাভাজন সংগঠন। ছাত্র ফেডারেশন এই কদিনের সংগ্রামের উপর পুস্তিকা লিখল: 'রক্তের স্বাক্ষর'। ৫০০০ কপি বিক্রি হল ছাত্রদের মধ্যে এক সপ্তাহ না যেতেই। আতঙ্কিত ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করল পুস্তিকাটি।

১৯৪৬-এর শেষে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হল প্রাদেশিক ছাত্রসম্মেলন। প্রায় ২০ হাজার সদস্যের ৫ শত প্রতিনিধি, সোজা সংগ্রামের ময়দান থেকে সম্মেলনে যোগ দিলেন। সম্মেলন মঞ্চে দুটি বিরাট ফেস্টুন: একটিতে লেখা অনন্ত-গণেশের মুক্তি চাই, অন্যটিতে লেখা স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ শুরু করো। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সত্যপাল ডাং। অভিবাদন জানালেন সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবী নেত্রী কল্পনা দত্ত (যোশী)। সুকান্ত কবিতা আবৃত্তি করলেন:

আমার ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে,
ক্ষুব্ধ এদেশে, রক্তের অক্ষরে।

১৯৪৬-এ সারাদেশ থমথম করছে, সাম্রাজ্যবাদকে শেষ আঘাত হানবার জন্য প্রহর গুনছে দেশবাসী। আবার বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ করল কলকাতার ছাত্রসমাজই। ১১ই ফেব্রুয়ারি, আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম নেতা ক্যাপ্টেন রশীদ আলির মুক্তি দাবি করে কলকাতায় ছাত্রধর্মঘটের ডাক দিল মুসলিম ছাত্র লীগ। ছাত্র ফেডারেশন তাকে সমর্থন জানাল। সর্বাত্মক ছাত্র-ধর্মঘট হল কলকাতায় ও শহরতলীতে। ড্যালহাউসির মুখে ছাত্রমিছিলকে আটকাল সশস্ত্র পুলিশ। ডেপুটি কমিশনার দোহা ছাত্রদের হুমকি দিল : এখনই ফিরে যাও, নয়তো চুরমার করে দেব : সমস্ত মিছিলের হয়ে ধারালো জবাব দিলেন প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য : "পেটাতে পার, গুলি করে মারতে পার। কিন্তু আমাদের চুরমার করতে পারবে না।"৬০

পুলিশের আক্রমণ শুরু হল। প্রতিরোধে রুখে দাঁড়াল ট্রাম, বাস ও রিকশা শ্রমিকরা। এক ঘন্টার মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল কলকাতার সমস্ত যানবাহন। লক্ষ লক্ষ ছাত্র যুবক, বস্তিবাসী নওজোয়ান, হিন্দু-মুসলমান জনতা সামিল হল প্রতিরোধ-সংগ্রামে গড়ে তুলল পথে পথে ব্যারিকেড। মুখে তাদের রণধ্বনি 'ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ভারত ছাড়' আর 'হিন্দু-মুসলমান এক হও।' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতারা পছন্দ করলেন না জনতার এই লড়াকু মেজাজ, কিন্তু বাধা দিতেও সাহস পেলেন না। বাংলার গভর্নর কেসী সাহেব ভারত সরকারকে গোপন চিঠিতে লিখলেন : "আমার স্পষ্ট ধারণা হয়েছে যে প্রধান দুটি দল, কংগ্রেস ও লীগ বিক্ষোভ চায় না, কিন্তু তারা নিজেদের দলের তরুণ কর্মীদের রুখতে পারছে না, তাদের প্রভাবান্বিত করছে কমিউনিস্টরা।"৬১

সেদিন সংগ্রামের ডাক দিতে সাহস করে এগিয়ে এল কমিউনিস্ট পার্টি, এগিয়ে এল ছাত্র ফেডারেশন। সমর্থন জানাল আর সমস্ত ছাত্রসংগঠন—মুসলিম ছাত্র লীগ, ছাত্র কংগ্রেস ও অন্যান্যরা। কেসী সাহেব পূর্বোল্লিখিত পত্রে লিখলেন : "এই-সমস্ত বিক্ষোভের পিছনে সবচেয়ে বিপজ্জনক সংগঠন হচ্ছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। আমাদের হাতে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে যে এরা বিক্ষোভকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চাইছে। এদের লক্ষ্য সশস্ত্র গণবিপ্লব"৬২ ভারতের পূর্বাঞ্চলের তৎকালীন সামরিক সর্বাধিনায়ক সার ফ্রান্সিস টুকারও লিখেছেন : "কলকাতা শহরের হিন্দু মুসলমান শিখ যত দাঙ্গাবাজ জনতা, কমিউনিস্টদের উস্কানিতে সর্বাত্মক লড়াইতে নামল"।৬৩

১২ই ফেব্রুয়ারি কাঁকিনাড়া থেকে বজবজ, ফুলেশ্বর থেকে চাঁদপানী

পর্যন্ত—কলকাতা আর আশেপাশের জেলায় সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হল প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক—হিন্দু মুসলমান, বাঙালী হিন্দুস্থানী ওড়িয়া—সবাই। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে ছাত্রসংগ্রামের একটি ফুলকিই দাবানল জ্বালতে সক্ষম হল। ১২ই ফেব্রুয়ারি সাম্রাজ্যবাদী সশস্ত্র বাহিনীর বাধা ভেঙে, কলকাতার রাজপথে বিজয়-মিছিল করল লক্ষাধিক নরনারী, তাদের মধ্যে ছাত্ররাই ছিল প্রধান। ১৩ ফেব্রুয়ারি অমৃতবাজার পত্রিকা লিখল: "গতকাল ও আজ কলকাতার রাজপথে আমরা যা দেখলাম, তারই নাম গণ-অভ্যুত্থান।" ১২, ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারী, সারা বাংলাদেশ অচল হয়ে রইল—হরতাল, সাধারণ ধর্মঘট, ব্যারিকেডের লড়াইতে।

দুটি বর্ণনা দিচ্ছি: 'কলকাতার বড় বড় রাজপথে টহল দিচ্ছে ইংরেজ ফৌজ। তাদের গুলিতে এখন পর্যন্ত মারা গেছে ১৫০ জন নরনারী। কলকাতার যানবাহন তিনদিন ধরে একেবারে অচল। শিয়ালদহ ও হাওড়া, কোনও স্টেশন থেকেই ট্রেন ছাড়ছে না. ট্রেন আসছেও না। রেলপথ জনতার অবরোধে বিপর্যস্ত। শ্রমিক অঞ্চল থমথম করছে। সারা কলকাতা জুড়ে মোড়ে মোড়ে রয়েছে ব্যারিকেডের অবরোধ।"[৬৪]

"কলকাতা শহরে ফৌজ টহল দিচ্ছে। উত্তর কলকাতায় মোতায়েন আছে গ্রীন হাওয়ার্ডাস, মধ্য কলকাতায় ইয়র্কস ও ল্যাংকসরা এবং দক্ষিণ কলকাতায় গুর্খা রাইফেল দল। সর্বত্র রাস্তায় ব্যারিকেডের অবরোধ। ডক অঞ্চলে বিক্ষোভ ছড়াচ্ছে। ট্রেন বন্ধ করার উদ্যমও চলছে। ইংরেজদের সমস্ত দোকানের কাঁচ ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ। মিলিটারি লরি পোড়ানো হচ্ছে। চৌরঙ্গীতে বহু মৃতদেহ পড়ে আছে। উত্তর কলকাতা কার্যত আমাদের হাতছাড়া।"[৬৫]

নাভিশ্বাস উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদের। ভারতে ভ্রমণ শেষ করে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি দলের নেতা অধ্যাপক ফ্র্যাংক রিচার্ডস, লন্ডনে ফিরে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটেলীকে বলেছিলেন: "আমাদের চটপট ভারত ছেড়ে চলে আসা উচিত, নইলে ভারতবাসীরা আমাদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে।"[৬৬] ইংরেজ সেনাপতি টুকারও পরে লিখেছেন: "১৯৪৬-এর গোড়ায় ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করেছিল এবং তাদের উপর আমরা আর কোনও আস্থা রাখতে পারছিলাম না।[৬৭]

শুধু সাম্রাজ্যবাদই ভয় পায় নি, ভয় পেয়েছিলেন দেশের উপরতলার জাতীয় নেতারা—ভয় পেয়েছিলেন আসন্ন গণবিপ্লবকে। ১২ই ফেব্রুয়ারি রাতে, কলকাতার তামাম হিন্দু-মুসলমান, ছাত্র নওজোয়ান যখন প্রাণ তুচ্ছ করে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তখন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ এক বিবৃতি দিয়ে বললেন: "কলকাতার রাজপথে এখন গুন্ডা-রাজ চলেছে,

আমরা তার নিন্দা করছি।"৬৮ শরৎচন্দ্র বসু বললেন ঃ "গত দুদিনের ঘটনা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে গুন্ডারা ও দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকেরা এখন শহরে নেতৃত্ব করছে। এ আমরা কিছুতেই সহ্য করব না।"৬৯ নাজিমুদ্দীন, ইস্পাহানি প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতারাও সংগ্রামী জনতার নিন্দা করে বিবৃতি দিলেন। একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল জনতার পাশে। ডাক দিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চূড়ান্ত গণ-বিপ্লবের জন্য দেশবাসীকে তৈরি হতে। রাস্তায় সংগ্রামরত, মরণজয়ী ছাত্রদের হয়ে সুকান্ত লিখলেন ঃ

আকাশে বাতাসে জিজ্ঞাসা উদ্দাম,
গুন্ডার দলে আজও লেখাওনি নাম?

রশীদ আলি দিবসের বিদ্রোহী কলকাতা শান্ত হতে না হতেই, বোম্বাই আর করাচীতে ফেটে পড়েছিল ভারতীয় নৌসেনাদের বিদ্রোহ। গোলামির প্রতীক ইংরেজের ইউনিয়ন জ্যাককে ছিঁড়ে, তার জায়গায় বিদ্রোহীরা একসাথে উড়িয়ে দিয়েছিলেন কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট দলের পতাকা। বিদ্রোহী নৌ-সেনাদের উপর আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করতে অস্বীকার করে ধর্মঘট করেছিলেন সমস্ত ভারতীয় বৈমানিকরা। প্রায় মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছিল স্বাধীনতা। কিন্তু ব্যর্থ হল সে উদ্যম, অসমাপ্ত রয়ে গেল গণবিপ্লব—জাতীয় নেতৃত্বের দ্বিধা এবং বিপ্লবভীতির জন্য। ইংরেজের কামানের মুখে নয়, নেতাদের ধমকের সামনেই থমকে দাঁড়িয়ে, সেদিন পথভ্রষ্ট হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা-বিপ্লব।

এপ্রিল-মে মাস থেকে বাংলাদেশে শুরু হল শ্রমিকশ্রেণী আর মধ্যশ্রেণীর কর্মীদের সংগ্রাম। ধর্মঘটের পর ধর্মঘট। এত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী তখন ছিল না বাংলাদেশে। এগিয়ে এসেছিল ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা। যেখানেই শ্রমিক বা কর্মচারীদের ধর্মঘট, সেখানেই দৌড়ে গিয়েছিল ছাত্রকর্মীরা, ছাত্র-শোভাযাত্রীরা। ডাক-তার ধর্মঘটের সমর্থনে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট হয়েছিল ২৯ জুলাই। জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে ধর্মঘট ভাঙার চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয় ছাত্ররাই। দালাল আর পুলিশ-ভর্তি জীপের সামনে পথ অবরোধ করে শুয়ে পড়ে ছাত্র ফেডারেশনের নেতা কমলাপতি রায়, সরোজ হাজরা, আরও অনেকে। অল ইন্ডিয়া রেডিও দপ্তরের সামনে একই ভাবে পথ অবরোধ করেন ছাত্র ফেডারেশনের নেত্রী গীতা মুখোপাধ্যায়, অলকা মজুমদার, আরও অনেকে।

এই যুগের সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলনের বিশেষত ছাত্র ফেডারেশনের আর-একটি বড় সাফল্য—দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীদের গণ-সংগ্রামের পথে মুক্ত করা। ১৯৪৬-এর জুলাই মাসের শুরুতে বন্দীমুক্তি কমিটি এই বীর বন্দীদের মুক্ত করার দাবিতে আন্দোলনের ডাক দেন।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বিরাট ছাত্রসভায় ছাত্র-ফেডারেশনের নেতারা ডাক দেন : জালালাবাদের বীরদের প্রয়োজন হলে জালালাবাদের পথেই মুক্ত করব। সুকান্ত কবিতা লিখলেন, সভায় তা আবৃত্তি করা হল :

ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়
ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে
গুলি বন্দুক বোমার আগুনে
আজও রোমাঞ্চকর।

এক পক্ষকাল স্কুলে কলেজে অবিরাম প্রচার চলল : ২৪ জুলাই, কলকাতার সমস্ত ছাত্র আইনসভায় চলো, বন্দীমুক্তি আদায় করে তবে আমরা ঘরে ফিরব।

২৪শে জুলাই বন্দীমুক্তি কমিটি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্মিলিত আহ্বানে দশ হাজার ছাত্রছাত্রীর দৃপ্ত মিছিল আইনসভার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল। মুখ্যমন্ত্রী সোরাবর্দী ছাত্রদের সামনে এসে বন্দীমুক্তির প্রশ্নে টালবাহানা করতে থাকলে, ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক, ছাত্রনেতা অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য চীৎকার করে বলেন : প্রতিশ্রুতি চাই না, মুক্তি চাই। দশহাজার কণ্ঠে প্রতিধ্বনি ওঠে : মুক্তি চাই, মুক্তি চাই। সোরাবর্দী প্রকাশ্যে কথা দিতে বাধ্য হন যে ৩১শে আগস্টের মধ্যে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে।[৭০] দীর্ঘ ১৫-১৬ বছর কারাবাসের পর মুক্ত হন বন্দীরা। দীর্ঘ এক দশক ধরে ছাত্র-সমাজ ও ছাত্র ফেডারেশনের যে বন্দীমুক্তির সংগ্রাম চালাচ্ছিল, তা এতদিনে পরিপূর্ণ জয়লাভ করে। চট্টগ্রাম বিদ্রোহীরা সহ সমস্ত বন্দী বীরেরা মুক্ত হয়ে অভিবাদন জানান বাংলার ছাত্র আন্দোলনকে, বাংলার ছাত্র ফেডারেশনকে।

ইতিমধ্যে শ্রমিকশ্রেণী, ছাত্র-যুবসমাজ ও দেশবাসীর এই বিপুল ঐক্যকে বিপর্যস্ত করার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করছিল সাম্রাজ্যবাদ। ইংরেজদের উস্কানিতে ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে কলকাতায় ভয়াবহ ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা বেঁধে গেল ১৬ই আগস্ট। আগুন জ্বলল নোয়াখালিতে, বিহারে, সারা ভারতে। ভাইয়ের বিরুদ্ধে ছুরিকা উদ্যত করল ভাই, নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেল উভয়ের শত্রু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ। সাময়িকভাবে বিহ্বল ও হতোদ্যম হয়ে পড়ল ছাত্র আন্দোলনও। তারপর ধীরে ধীরে ছাত্ররা নামল দাঙ্গাবিরোধী অভিযানে। ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা বহু জায়গায় প্রাণ তুচ্ছ করে দাঙ্গার পথ রুখে দাঁড়াল, দাঙ্গা-বিধ্বস্ত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করল। সেই ভয়ংকর দুর্যোগের আমলে, কলকাতায় চালু কথাই ছিল যে হিন্দু-মুসলমান একত্রে থাকতে আর গল্পগুজব করতে পারে একমাত্র ট্রাম শ্রমিকদের আস্তানায় আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে অবশ্য কুমিল্লার হাসানাবাদ থানার সংগ্রামী কৃষকরা, লালঝাণ্ডা হাতে নোয়াখালির

দাঙ্গাবাজদের পথ রুখে, সারা পূর্ববাংলায় দাঙ্গার আগুন জ্বলে ওঠা বন্ধ করে, দাঙ্গা-বিরোধী সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ কীর্তি রচনা করেছিলেন।

ছাত্র আন্দোলনের আর একটি স্মরণীয় অবদান হচ্ছে সারা পৃথিবীর মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে যুক্ত করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ইউরোপ ও আমেরিকার ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামী ছাত্রসমাজ সেতুবন্ধন করলেন এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামী ছাত্রসমাজের সঙ্গে। ১৯৪৬ এর আগস্ট মাসে চেকোস্লাভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ শহরে অনুষ্ঠিত হ'ল প্রথম বিশ্ব ছাত্র মহাসম্মেলন, জন্ম পেল ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব ছাত্রসংস্থা—আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন (I. U. S)। এই মহাসম্মেলনে ভারতের ছাত্রপ্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম সংগঠক ও কলকাতার বিশিষ্ট ছাত্রনেতা গৌতম চট্টোপাধ্যায়, নির্বাচিত হন আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতিতে। এই মহাসম্মেলনে একদিকে যেমন স্পেনের সেভিল শহরের কারাগার ভেঙ্গে, ফেরারী ছাত্রনেত্রী মারিয়া এসেছিলেন, যেমন এসেছিলেন যুগোস্লাভ গেরিলা বাহিনীর অন্যতম তরুণ সেনানী রাইকো টমোভিচ, তেমনই এসেছিলেন মিশরের রাজপথে ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে রক্তাক্ত ছাত্রসংগ্রামের দুই নেতা ও নেত্রী—গামাল ঘালি ও ইঞ্জি এফ্‌লেতুনা এবং ইন্দোনেশিয়ার মরণজয়ী ছাত্রনেতা আহমেদ সুরিপনো (পরে মাদিয়ুনের ব্যর্থ গণঅভ্যুত্থান, ১৯৪৯ এ যিনি শহীদ হ'ন)। ফ্যাসিবাদ ও উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে প্রতিটি দেশের জাতীয় স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার ও সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে যুদ্ধ শোষণের বিপদমুক্ত নতুন পৃথিবী গড়ার সংকল্প নিল এই মহাসম্মেলন। রণধ্বনি রাখল; যুদ্ধের ময়দানে নয়, খেলার ময়দানেই মিলিত হবে বিশ্বের ছাত্র সমাজ। বেয়নেটে আমরা পরস্পরকে বিদ্ধ করব না। সৌভ্রাত্রের আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরব একে অপরকে।

ভারতের ছাত্র সমাজের আমন্ত্রণে ১৯৪৭-এর গোড়ায় ভারতে এলেন বিশ্ব-ছাত্র-যুব প্রতিনিধিরা—এই প্রথম। চারজনের দল—ফরাসী ছাত্রনেতা জাঁ লাতুসিয়, সোভিয়েৎ যুবনেত্রী ওল্‌গা চেটচটকিনা, যুগোস্লাভ ছাত্রনেতা রাইকো টমোভিচ ও ডেনমার্কের যুবনেতা হোমু।

ইতিমধ্যে ১৯৪৭এর ২১ জানুয়ারি ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ভিয়েৎনামের উপর দস্যু আক্রমণের প্রতিবাদ, ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে ধর্মঘট করে সারা বাংলার ছাত্রসমাজ। পুলিশের গুলিতে শহীদ হয় কলকাতার দুই ছাত্র ধীরঞ্জন ও সুখেন্দুবিকাশ, মৈমনসিংহের অমলেন্দু। বুলেটে বিদ্ধ হয়ে আহত হয় কলকাতার ছাত্র কবি জ্যোতি রায়, ছাত্রকর্মী রণমিত্র সেন (তখন আর. এস. পি.

দলের কর্মী)। মৈমনসিংহের ছাত্রী অনিতা। লাঠির আঘাতে আহত হ'ন বহু ছাত্রছাত্রী, তার মধ্যে মনে রাখার মত ঘটনা, কলেজস্ট্রীটে পুলিশের এক বড় কর্তাকে ছাত্রীকর্মী (পরে খ্যাতিমান লেখিকা) সুলেখা সান্যালের জুতো দিয়ে প্রহার করে গ্রেপ্তার হ'ন ছাত্র ফেডারেশনের বহু নেতা—কমলাপতি রায়, দেবকুমার বসু, সরোজ হাজরা। মাথায় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিচালনা করেন মৈমনসিংহের ছাত্রনেতা কানু রায়।

এই ছাত্র সংগ্রামের বড় সাফল্য, দমদম বিমান বন্দরে সমস্ত জঙ্গী বিমান চলাচল তারা বন্ধ করে দিয়েছিল। ১৯৫৮তে ভারত সফরের সময় সে কথা মনে রেখেছিলেন ভিয়েৎনামের অবিস্মরণীয় নায়ক হো চি মিন। কলকাতার 'পৌর-সম্বর্ধনায়' বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করেছিলেন ১৯৪৭ এর ভিয়েৎনাম দিবসে বুলেটে আহত ছাত্রকর্মী রণমিত্র সেনকে, চিঠি লিখে, স্বাক্ষরযুক্ত ছবি পাঠিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ১৯৪৭-এর দুই ছাত্রনেতা কমলাপতি রায় ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে—তাদের মারফৎ বাংলার সমগ্র সংগ্রামী ছাত্রসমাজকে। বাংলার ছাত্র আন্দোলনের ললাটে সে এক অসামান্য রাজটিকা।

১৯৪৮-এ ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতাতেই অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণপূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলন—সমগ্র এশিয়া মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছাত্র-যুব সংগ্রামের ডাক উচ্চারিত হয় সেই মহাসম্মেলনের মঞ্চ থেকে।[৭১]

তবে তার বিশদ আলোচনা এই প্রবন্ধের পরিসরে সম্ভব নয়।

অন্য একটি দিকের কথা সামান্য একটু বলব। চল্লিশের দশকেই কলকাতায় ঢাকায় ও বাংলার অন্যত্রও ক্রমেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় প্রগতিশীল মুসলিম ছাত্ররা বাংলার ছাত্রসংগ্রামের মূল স্রোতধারার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। ১৯৪০-এ হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের আন্দোলনে ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৯৪৬-এ কলকাতার রসীদ আলি দিবসে হাজার হাজার মুসলিম, ছাত্র ধর্মঘট, মিছিল, ব্যারিকেডের লড়াইতে অংশ নিয়েছেন। তারপর মাঝখানে দ্বিজাতি তত্ত্বের বিকৃত প্রচারের শিকার হয়ে ব্যাপক মুসলিম ছাত্রসমাজ পাকিস্তান আন্দোলনে ভেসে গেলেও, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তখনই কলকাতায় রুখে দাঁড়িয়েছেন পোষ্টগ্র্যাজুয়েটের ছাত্রকর্মী সালের আহমদ, প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রকর্মী শহীদুল্লাহ কায়সার আরও অনেকে। ঢাকার ছাত্রনেতা মুনীর চৌধুরি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদিকা গীতা মুখার্জীর সঙ্গে একত্রে পুস্তিকা রচনা করেন—নতুন যুগের নতুন শিক্ষা।

শুধু মনে করিয়ে দেব যে ছাত্র আন্দোলনের এই অঙ্কুরই দেশভাগের চার বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের বনস্পতিতে পরিণত হয়েছিল—পদ্মা মেঘনা কর্ণফুলীর পাড়ে লাখো ছাত্রছাত্রীর মরণজয়ী গানে মুখরিত

হয়েছিল ঢাকা, মৈমনসিং, চট্টগ্রাম, বরিশাল—আমার ভাই-এর রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি। ১৯৭২-এর জানুয়ারি মাসে স্বাধীন বাংলাদেশে, ঢাকা নগরীতে এই প্রবন্ধের লেখককে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজীব বলেছিলেন ; রসীদ আলি দিবসের ছাত্রসংগ্রামে আমাদের রক্তের রাখীবন্ধন হয়েছিল, সে কথা ভুলব না। উভয় বাংলার গৌরবতাই মরণজয়ী ছাত্র সমাজ, যারা বরাবর লড়েছে, লড়বে, "রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ফুটন্ত সকাল" কে ছিঁড়ে জন্ম দিতে।

## পাদটীকা

১। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ বাংলা প্রদেশের গভর্নর ছিলেন সার জন অ্যান্ডারসন। চণ্ড দমননীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্ব চালানর জন্য তাঁর শাসন কাল 'অ্যান্ডারসনী রাজ' নামে ইতিহাসে কুখ্যাত।

২। জওহরলাল নেহরু : আত্মজীবনী ( ইংরেজি সংস্করণ )

৩। অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৪ মার্চ ১৯৩১

৪। সোমনাথ লাহিড়ী, রচনাবলী, প্রথম খণ্ড 'সভ্য হবার আগে'

৫। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : সাক্ষাৎকার, ছাত্র অভিযান বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৬৯

৬। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৩৫

৭। চিন্মোহন সেহানবীশ : সাক্ষাৎকার, কলিকাতা ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৫

৮। নয়াদিল্লীর অজয়-ভবন সংগ্রহশালাতে সংরক্ষিত মূল ইংরেজি থেকে লেখকের বঙ্গানুবাদ।

৯। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : কমিউনিস্ট হলাম, মেদিনীপুর, ১৯৭৬

১০। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ আগষ্ট, ১৯৩৭, কলকাতা

১১। ঐ

১২। রবীন্দ্রনাথের লিখিত ভাষণ হইতে—আনন্দ বাজার পত্রিকা, ৩ আগষ্ট ১৯৩৭, কলকাতা

১৩। অমৃতবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১৫ আগষ্ট ১৯৩৭।

১৪। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৬ আগষ্ট ১৯৩৭

১৫। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৮ আগষ্ট ১৯৩৭

১৬। অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৯ আগষ্ট ১৯৩৭

১৭। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : কমিউনিস্ট হলাম, ১৯৭৬

১৮। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৪ মার্চ ১৯৩৮

১৯। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৫ মার্চ ১৯৩৮
২০। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : "ছাত্র ফেডারেশনের গোড়ার যুগ" ৪০ বর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ, ১৯৭৬
২১। প্রশান্ত সান্যাল : সাক্ষাৎকার, ২২ নভেম্বর ১৯৮৬, কলকাতা
২২। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : পূর্বোদ্ধৃত স্মারক গ্রন্থ
২৩। ঐ
২৪। ঐ
২৫। প্রভাত দাসগুপ্ত : "ছাত্রধর্মঘট" ছাত্র অভিযান প্রথমবর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৪৫ (১৯৩৮)
২৬। রমেন ব্যানার্জি : ছাত্র অভিযান, প্রথম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা, ১৯৩৮
২৭। কে. এম. আহমদ : "বাংলার ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের দিনগুলির স্মৃতিচারণা" ৪০ বর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ, ১৯৭৬
২৮। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : স্মারকগ্রন্থ ১৯৭৬
২৯। গোলাম কুদ্দুস : দুই মূর্তি, সম্বোধন, ১৯৬৫
৩০। ষ্টেটস্‌ম্যান, কলকাতা, ৩ মার্চ, ১৯৩৭
৩১। প্রবাসী মাঘ, ১৩৪৪
৩২। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : স্মারকগ্রন্থ ১৯৭৬
৩৩। ভারতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত গোপন দলিল : হোম / পল্‌ / এফ. এন. ৩৭/২৭/১৯৪০
৩৪। অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৪০
৩৫। অমৃতবাজার পত্রিকা, ২ জুলাই, ১৯৪০
৩৬। অমৃতবাজার পত্রিকা : ৩ জুলাই, ১৯৪০
৩৭। অমৃতবাজার পত্রিকা : ৬ জুলাই, ১৯৪০
৩৮। কে. এম. আহমদ : 'স্মৃতিচারণ। স্মারকগ্রন্থ, ১৯৭৬
৩৯। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : স্মারকগ্রন্থ ১৯৭৬
৪০। ভারতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত গোপন দলিল : হোম/পল/এফ. এন ৭/১, ১৯৪১।
৪১। ঐ
৪২। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ : "কবিকথা" বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক-পৌষ, ১৩৫০
৪৩। বিজন রায় : জাপানী শাসনের আসল রূপ, কলকাতা, ১৯৪২
৪৪। রামকৃষ্ণ মৈত্র : "ছাত্র ফেডারেশন ৪০ বছর" স্মারকগ্রন্থ ১৯৭৬
৪৫। জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গোপন দলিল নং ২২৬/৪২

৪৬। ম্যানসার অ্যান্ড মুন ( সম্পা ) ট্রান্সফার অব পাওয়ার, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৪৪০-৪১

৪৭। আবুল কালাম আজাদ ঃ ইণ্ডিয়া উইন্স্ ফ্রীডম, পৃঃ ৭৩

৪৮। জওহরলাল নেহরু ঃ ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৫৩৩

৪৯। অমৃতবাজার পত্রিকা ঃ ১১ আগষ্ট, ১৯৪২

৫০। ঐ ১৬ ও ১৭ আগষ্ট ১৯৪২

৫১। জনযুদ্ধ, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

৫২। ঐ

৫৩। জনযুদ্ধ ১২ অক্টোবর, ১৯৪২

৫৪। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ একসূত্র, ডিসেম্বর ১৯৪২

৫৫। সম্মেলনের মুদ্রিত ইংরেজি বিবরণী, ডিসেম্বর ১৯৪৪

৫৬। ঐ

৫৭। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ স্মারকগ্রন্থ ১৯৭৬

৫৮। জনযুদ্ধ ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫

৫৯। এই সমগ্র বিবরণীর উৎস লেখকের স্মৃতি। লেখক ছিলেন এই মিছিলের অন্যতম অংশগ্রহণকারী। তা ছাড়া উৎস ঃ গৌতম চট্টোপাধ্যায় ঃ ইন লেটারস অব ব্লাড, দি স্টুডেন্ট, বোম্বে, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৫ এবং অমৃতবাজার পত্রিকা ২২ ও ২৩ নভেম্বর ১৯৪৫

৬০। অমৃতবাজার পত্রিকা ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬

৬১। স্বরাষ্ট্র দপ্তরে গোপন দলিল নং ৫/২২/৪৬

৬২। ঐ

৬৩। স্যার ফ্রান্সিস টুকার ঃ হোয়াইল মেমারি সার্ভস। লণ্ডন। ১৯৫০

৬৪। অমৃতবাজার পত্রিকা ঃ ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬

৬৫। কলকাতা থেকে বড়লাটকে সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের গোপন তার নং ১৩/২/৪৬

৬৬। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬

৬৭। টুকার ঃ হোয়াইল মেমারি সার্ভস্

৬৮। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬

৬৯। ঐ

৭০। স্বাধীনতা ২৫ জুলাই ১৯৪৬

৭১। স্বাধীনতা ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮

# প্রমিথিয়ুস শৃঙ্খলমুক্ত হোক

## মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

স্বর্গ থেকে জ্ঞানের আগুন এনে পৃথিবীর মানুষের মনের শৃঙ্খল খুলতে চেষ্টা করেছিলেন দেবপুত্র বীর প্রমিথিয়ুস। স্বর্গের দেবতারা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তাঁকে বন্দী করেছিলেন। বন্দী প্রামিথিয়ুস শৃঙ্খল ছেড়ার জন্য গর্জন করছে—সেই ক্রুদ্ধ গর্জন পৃথিবীর আকাশে বাতাসে। এই বন্দী প্রমিথিয়ুসকে শৃঙ্খলমুক্ত করার দায়িত্ব সারা পৃথিবীর ছাত্রসমাজের, যাদের মন তরুণ, তাজা; চোখে যাদের নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন। সমাজের স্পর্শকাতর তবে অসম সাহসী এই ছাত্রসমাজ। দেশে বিদেশে মানুষের মন যেখানেই বন্দী করবার চেষ্টা হচ্ছে কিংবা আলোর অভাবে মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে সেখানে তাদের মুক্তি ও আলোর সন্ধান দিতে হবে ছাত্রদেরই।[১] ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ।

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার মহম্মদ আলী পার্কে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেন "আমি সারা পৃথিবীর তরুণ সমাজের চিরদিনের মা, কেননা আমি ভালবাসি পৃথিবীর যৌবনকে। আমি পৃথিবীর যৌবনকে এত ভালবাসি কারণ তাদের গায়ের রং ধর্ম বা রাজনৈতিক মতামত যাই হোক না কেন, তারাই তো পৃথিবীর ভবিষ্যৎ—যৌবনই-তো আগামী দিনের আশা ভরসা।"[২]

বাংলাদেশে বিশেষ করে কলকাতার এই মুক্তির আলোর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা। সময়টা উনিশ শতকের বিশ ত্রিশ চল্লিশের দশক। শিক্ষিত যুবকদের মনে নতুন শিক্ষা এক নতুন চেতনা এনে দিয়েছে, যে চেতনা থেকে তারা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের পাকে পাকে জড়ানো যে আমাদের সমাজ, সেই সমাজকে মুক্ত করতে চাইছে। কাজ কঠিন, বাধা অনেক, আর কঠিনের সঙ্গে লড়াই যে সবচেয়ে বেশী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ উদ্ধত যৌবন। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ছাত্রদের মনে ঝড় তুলছে। বিলেত থেকে জাহাজে করে টম পেইনের 'রাইটস অব ম্যান' বা বেন্থামের 'ইমানসিপেট দি কলোনিজ' এর মত বই কলকাতা পৌঁছলে তা চোখের নিমেষে বিক্রী হয়ে যেত হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে —এ খবর পাওয়া যাচ্ছে তখনকার কালের সংবাদপত্র বেঙ্গল হরকরা-তে।

এই হিন্দু কাগজে ১৮২৬-এ মাত্র ১৭ বছর বয়সের যুবক হেনরী লুই ভিভিয়েন ডিরোজিও এলেন শিক্ষক হয়ে। অল্প কদিনের মধ্যেই কলেজের এক অংশ ছাত্রদের মন জয় করে নিলেন তিনি, শিক্ষক হলেন বন্ধু। কলেজের ক্লাশে সব কথা মন খুলে বলার সুযোগ নেই, সময় নেই, বলাও যায় না, তাই তাঁরই বাড়িতে বসতো নিয়মিত আলোচনাচক্র। কত কি আলোচনা হত— সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা সম্পর্কিত। প্রচলিত কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধেই ছিল তাদের বিদ্রোহ। ওখানেই তৈরী হল অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশের সম্ভবত প্রথম ছাত্র সংগঠন। সব কিছু প্রশ্ন করে, তর্ক করে, যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে জানা এবং তবেই তাকে গ্রহণ করা—জাগরণের যে প্রথম লক্ষণ তাই প্রকাশ পেল এই ছাত্রদের মধ্যে।

উল্লেখযোগ্য যে ঐ সময়ই এরা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তাতে স্থান পেয়েছে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম এবং সতীদাহর বিরুদ্ধে ও বিধবা বিবাহের সপক্ষে মতামত। কাগজ বার করেছেন 'পার্থেনন'—তবে প্রথম সংখ্যার পর সমাজের চাপে হয়ত সংখ্যাটি আর আলোর মুখ দেখতে পেল না। শুধু তাই নয় শিক্ষক ডিরোজিওকেও কলেজ থেকে পদত্যাগ করতে হল, অভিভাবকদের এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের চাপে। কিন্তু যে মুক্ত বুদ্ধির আলো তিনি জ্বালিয়েছিলেন ছাত্রদের মনে তা নিভল না।

১৮৩৩ সালে হিন্দু কলেজের একদল ছাত্র গড়ে তুললেন সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা। সভার আলোচনা হত বাংলা ভাষায়। সমাজের ও দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতিই ছিল সভার আলোচনার বিষয়বস্তু। সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রমাপ্রসাদ রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনমাধব দে, দ্বারকানাথ মিত্র, হরগোপাল বসু এবং হিন্দু কলেজের আরও ছাত্র।[৩]

১৮৩৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী পাঁচজন প্রগতিশীল ছাত্র যুব—তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও রাজকৃষ্ণ দে যুক্তভাবে স্বাক্ষর করে একটি সভা ডাকেন। উদ্দেশ্য দেশের নানাবিধ সমস্যার নিয়মিত আলোচনার জন্য একটি স্থায়ী সংগঠন চাই। সভাটি হয় ১২ মার্চ, সংস্কৃত কলেজে। উপস্থিত ২০০ জনের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ছাত্র। এই সভা থেকেই তৈরী হয় 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' নামে একটি সংগঠন। সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুসূদন দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র দেব—প্রমুখদের নামের উল্লেখ আছে।

সংগঠনটিতে যে সব আলোচনা হত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বিদ্যাসাগর

বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুরু করার একদশক আগে মহেশচন্দ্র দেব বিধবা বিবাহের সমর্থনে এক জোরালো প্রবন্ধ লেখেন, উদয়চাঁদ আঢ্য মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম ও সরকারী ভাষা হওয়ার সপক্ষে প্রবন্ধ লেখেন এবং স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার সম্পর্কিত প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়।

১৮৩৫ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্র কৈলাশচন্দ্র দত্ত '১১০ বছর পরে তোমার কল্পনার ভারতবর্ষ'' নামে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় '১৯৪৫এ ৫৮ ঘণ্টা রোজনামচা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে প্রথম পুরস্কার পান। প্রবন্ধটিতে ছাত্রটি লেখেন ইংরেজদের অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে গণবিদ্রোহ ফেটে পড়ে— সাময়িকভাবে ইংরেজ বড়লাট গদিচ্যুত হয়, শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ পরাজিত হয় এবং বিদ্রোহের নেতা এক বাঙালী তরুণের মৃত্যুদণ্ড হয়। মৃত্যুর পূর্বে তরুণটি জনসমক্ষে ঘোষণা করেন স্বাধীনতার জন্য শেষ রক্তবিন্দু ঢেলে দেবার চেয়ে মহৎ কাজ কিছু হতে পারে না।[৪]

স্বাধীনতার কোন স্পষ্ট চিন্তা তখন বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীর মনে ছিল না ঠিকই, তবে পরাধীনতার জ্বালা যে ভাবেই হোক তারাও অনুভব করেছেন বলেই মনে হয়, অন্তত একটা অস্পষ্ট ধারণা সচেতন ছাত্রসমাজের মনে আনাগোনা করত।

তাই ১৮৪১-এ ছাত্র যুবরা মিলে তৈরী করলেন 'দেশহিতৈষিণী সভা'। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সারদাপ্রসাদ ঘোষ সভা প্রতিষ্ঠার দিনে প্রধান বক্তা হিসেবে স্পষ্টভাবে ইংরেজ শাসনকে ধিক্কার দিয়ে বললেন 'স্বাধীনতা হীনতাই আমাদের সমস্ত দুর্দশার মূল কারণ। দেশের দুর্গতি মোচনের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে দেশপ্রেমেই হবে, ঐক্যের ভিত্তি।[৫] এই সংগঠনটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে এর দরজা খোলা রইল জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়দের জন্য। যদিও এই গোড়ার পর্বে মুসলমানদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক এদের ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়না।

১৮৪৩ এর আরেকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র একটি আলোচনা চক্র সংস্কৃত কলেজে অনুষ্ঠিত হয় ৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে। সভায় ইংরেজদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন এককালের ডিরোজিয়ান, তখন হিন্দুকলেজের অধ্যাপক তারাচাঁদ চক্রবর্তী। কলেজের অধ্যক্ষ ডি. এল. রিচার্ডসন সভায় উপস্থিত ছিলেন, বক্তৃতার মাঝখানে তিনি একবার বক্তাকে বাধা দিলে সভার সভাপতি আপত্তি জানান। তিনি তখন চুপ করে গেলেও, আবার বক্তৃতার মাঝে বাধা দিলে তারাচাঁদ তীব্রভাবেই তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তখন রিচার্ডসন অপমানিত বোধ করে সভা ত্যাগ করেন। বক্তৃতা শেষে তারাচাঁদ রিচার্ডসনের ব্যবহারের তীক্ষ্ণ ভাষায় সমা-

লোচনা করেন এবং পরদিন অধ্যক্ষের ঘরে গিয়ে নিজের পদত্যাগ পত্রও দাখিল করে আসেন। এই ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধ অনুসরণীয়। এরপর উক্ত সংগঠন সংস্কৃত কলেজে আর কোন সভা করেনি।[৬]

১৮৪৬ এ হিন্দু কলেজে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয় বিষয় 'Loyalty' বা 'আনুগত্য'। যে ছাত্রটি প্রথম পুরস্কার পান তিনি আনুগত্যের নানান মহিমা কীর্তন করে প্রবন্ধ শেষ করেন এই বলে যে, দেশ যদি বিদেশীর পরাধীন থাকে তাহলে সেই শাসন ও শাসকের প্রতি আনুগত্যের চেয়েও বড় আদর্শ হচ্ছে দেশপ্রেম। বিদেশী শাসনের শৃংখলছিন্ন করার চেয়ে মহত্তর কর্তব্য আর কিছু নেই।

বিদেশী দাসত্ব যে অবমাননাকর এ বোধ স্বভাবতই শিক্ষিত মানসে ছিল। আবার ইংরেজ শাসনের মাধ্যমেই পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডার তাঁদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে এ কৃতজ্ঞতাবোধও তাঁদের মধ্যে কাজ করেছে। সর্বোপরি ছিল শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা। তখন ভারতের নানান জায়গায় ছোট বড় কৃষক বিদ্রোহ তো শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কৃষকের সঙ্গে কোন নৈকট্যবোধ ছিল না। এ সময়ের ছাত্র সমাজে, তাই এ সময়কার ছাত্র আন্দোলন প্রধানত সামাজিক কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা কিম্বা বিধবাবিবাহ প্রবর্তন বা বহুবিবাহরোধ ইত্যাদি বিতর্ক ও লেখালেখির মধ্যেই সীমিত ছিল।

তবে এ যুগের ছাত্র আন্দোলনের যেটা সবলতা তা হচ্ছে কোন রকম সাম্প্রদায়িক মনোভাব এদের মনকে আচ্ছন্ন করেনি। জাতপাতের সমস্যা দ্বারাও এরা বিভ্রান্ত হননি। তবে সবচেয়ে বড় কথা ছাত্রদের যে সমাজে একটা আলাদা অস্তিত্ব আছে। ইংরেজীতে যাকে বলে Separate Entity—সেটাই এ যুগের ছাত্র আন্দোলন জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। ভবিষ্যৎ ছাত্র সমাজের কাছে—এটাই হল সবচেয়ে মূল্যবান পাথেয়।

মাঝখানের ঘটনা বহুল কতগুলো বছর কেটে যায়। ১৮৫৭র মহা-বিদ্রোহ সারা ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসকবর্গকে আতঙ্কিত করে তোলে। শাসনের চেহারা পাল্টাতে থাকে। আমাদের চেতনার স্তরেও আসে পরিবর্তন।

১৮৭৫-এ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু বিলেত থেকে দেশে ফেরেন। আনন্দর সঙ্গে যোগাযোগ হয় তখনকার ছাত্র সমাজের একাংশের সঙ্গে। তখন প্রগতিশীল ছাত্রদের একটা বড় অংশই ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। অনেকেই শিবনাথ শাস্ত্রীর 'চেলা'। কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিন চন্দ্র পাল, সুন্দরী মোহন দাস প্রমুখ অনেকেই সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের সঙ্গে দেখা করেন এবং এবং একটি প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন তৈরীর ব্যাপারে সাহায্য চান। ১৮৭৫-এ প্রতিষ্ঠিত হল স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন। সুরেন্দ্রনাথের

জ্বালাময়ী বক্তৃতা এই তরুণ ছাত্রদের মনকেও দেশপ্রেমের আগুনে প্রজ্বলিত করল। বিপিন চন্দ্র পাল লিখছেন "কলিকাতা ছাত্র-মণ্ডলীকে অবলম্বন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ যেমন সেকালের শিক্ষানবীশ বাঙালীদিগের রাষ্ট্রীয় জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেইরূপ এই ছাত্রমণ্ডলীই সুরেন্দ্রনাথের এবং আনন্দ মোহনের রাষ্ট্রনায়কত্বও গড়িয়া তুলিয়াছিল।"

ঊনিশ শতকের মধ্যভাগের শিক্ষা জগতে একটা বড় ঘটনা মেয়েদের পড়তে আসা। প্রধানতঃ ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে যুক্ত পরিবারের মেয়েরাই স্কুল কলেজে পড়তে এসেছেন বেশী। হিন্দু ঘরের মেয়েরা লেখাপড়া অল্পবিস্তর শিখলেও প্রকাশ্যে স্কুলে বা কলেজে তারা তখনও আসেননি। তবে পড়াশুনা করতে শুরু করলেও বাধা ছিল অনেক। শিক্ষিত মহিলাদের নামের তালিকা এখানে দেবো না শুধু কাদম্বিনী বসু এবং চন্দ্রমুখী বসুর কথা উল্লেখ করবো।

কাদম্বিনী ১৮৭৮ এ সর্বপ্রথম মহিলা (বেথুন স্কুল) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর জন্যই ১৮৭৮-৭৯ তে বেথুন স্কুলে কলেজ ক্লাসের পত্তন হয়েছিল। ইতিমধ্যে দেরাদুন প্রবাসী ভুবনমোহন বসুর কন্যা চন্দ্রমুখী বসুর বিশেষ আবেদনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে এই পরীক্ষা দেবার জন্য বিশেষ অনুমতি দেয়। এরা দুজনেই কৃতকার্য্য হয়ে বেথুন কলেজে বি এ পড়েন। ১৮৮৩ তে এরা দুজন প্রথম মহিলা স্নাতক হলেন শুধু এশিয়াতে নয়, সম্ভবত বৃটিশ সাম্রাজ্যেই। চন্দ্রমুখী কৃতিত্বের সঙ্গে এম এ পাশ করেন এবং বেথুন কলেজের প্রথম মহিলা অধ্যক্ষা নিযুক্ত হন। তাঁর সাফল্যে খুশী হয়ে বিদ্যাসাগর নিজের হাতে স্নেহ উপহার লিখে তাঁকে সমগ্র সেক্সপীয়র রচনাবলী উপহার দিয়েছিলেন।

কাদম্বিনী কিন্তু গতানুগতিক পথে এগুলেন না, তিনি গেলেন ডাক্তারী পড়তে। মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া এই শতকের গোড়ার দিকে ছেলেদের কাছেও একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ছিল। সাহসের সঙ্গে ছেলেরা সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। সেই তুলনায় কাদম্বিনীর সাহসের কোন তুলনাই হয় না। অবশ্য তাঁর পেছনে এখনকার সমাজ সংস্কারকরা (দ্বারকনাথ গাঙ্গুলী, রামকুমার বিদ্যারত্ন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ) ছিলেন। পরে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ডাক্তারী ডিগ্রী অর্জন করে আমাদের দেশে প্রথম মহিলা ডাক্তার হন।[৮]

লেখাপড়ায় বা স্বাদেশিকতায় মেয়েদের ভূমিকা থাকলেও কোন রকম ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে তখন মেয়েদের কোন যোগ ছিল না।

এ সময়কার ছাত্রদের আন্দোলনের আর একটি নতুন ধারা উল্লেখ করার

মত। শিবনাথ শাস্ত্রী তখন হেয়ার স্কুলের শিক্ষক। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু ছাত্র গড়ে তোলেন 'সমদর্শী গোষ্ঠী'। সমাজতন্ত্র কথাটা তখন আমাদের দেশে একেবারে অপরিচিত নয়। তবে ইউরোপে এ কথাটা তখন খুবই পরিচিত। সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র নিয়ে আলাপ আলোচনা বিদ্বান সমাজে তখন শুরু হয়েছে। সম্ভবত শিবনাথ শাস্ত্রীর মনেও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা কোন ছাপ ফেলেছে। এই সমদর্শী গোষ্ঠী অগ্নিসাক্ষী করে শপথ নিলেন "স্বায়ত্ত শাসনই আমরা একমাত্র বিধাতৃনির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি আমরা জাতিভেদ মানিবনা আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা রক্ষা করিব না…সাধারণ ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের হিতকর কার্যে জীবন উৎসর্গ করিব।"[৯] প্রতিজ্ঞা পত্রে সাক্ষর করেন বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, গগনচন্দ্র হোম প্রমুখ। শিবনাথ চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করেন।

ইলবার্ট বিল আন্দোলন বাংলার ছাত্র সমাজকে আবার চাঙ্গা করে তোলে। চারুচন্দ্র দত্ত স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন "স্কুলে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পরে সুরেনবাবুর জেল হল। আমরা সবাই কালো ফিতে পরলাম। সভা করে বক্তৃতা হল সব বুঝলাম না, কিন্তু মনে একটা স্থির বিশ্বাস হলো যে একটা সূত্রপাত হচ্ছে।[১০] এবারে জাতীয় জাগরণের সঙ্গে হাতে হাত রেখে বাংলা দেশে ছাত্র জাগরণ ও ছাত্র আন্দোলন শুরু হল। জাতীয় আন্দোলন ছাত্র সমাজকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলো না। ছাত্র সমাজও দেশের রাজনীতির সঙ্গে আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়ল।

সরকারী শিক্ষা সচিব কার্লাইল ফতোয়া জারি করলেন, যে ছাত্র স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবে সেই বিতাড়িত হবে সরকারী স্কুল কলেজ থেকে। এর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে অ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটি। এটি সম্ভবত বাংলার গণ ছাত্র সংগঠন। এর প্রধান পুরুষ কৃষ্ণকুমার মিত্র, আর উল্লেখযোগ্য দুজন সংগঠক সিটি কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও জাপান ফেরৎ তরুণ ইঞ্জিনীয়ার রমাকান্ত রায়। ছাত্র সংগঠন এই সময় শুধু শহর নয়, শুধু কলেজ নয়, মফঃস্বলের স্কুল কলেজেও গড়ে উঠতে থাকে। কার্যত পরবর্তীকালে বিপ্লবী আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ এবং জাতীয় আন্দোলনের নানান ধারার সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত হয়ে যাওয়ার সূচনা বোধ করি এই সময় থেকেই হয়। ছাত্ররা এ সময় দেশপ্রেম, কর্মতৎপরতা এবং সাহসই শুধু দেখিয়েছেন তা নয়, উল্লেখ করার মত অসাম্প্রদায়িক চরিত্রও দেখিয়েছেন। সোসাইটির বার্ষিক সভায় প্রতিবেদন দিতে গিয়ে শচীন্দ্রপ্রসাদ বলেন হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্য আমাদের উদ্যোগী হতে হবে এবং শিবাজী উৎসবের ব্যাপারে কোনও মতেই সোসাইটির জড়িয়ে পড়া উচিত নয়, কেননা তাতে

মুসলমানদের মনে আঘাত লাগবে।[১১] কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর পেলে সেখানে এরা ছুটে গেছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে। ১৯০৬ সালে ছাত্রদের এ ধরনের কার্যকলাপ সত্যিই বিস্ময়কর।

শিক্ষাজগতে সরকারী অন্যায় হস্তক্ষেপ দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করল জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়নে। কি পড়ানো হবে, কেমন শিক্ষা হবে, শিক্ষকরা কেমন হবেন—এ সব কিছু নিয়ে গুণগত ভাবে নতুন চিন্তা এল, ১৯০৫-৮এ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে গঠিত হল National Council of Education. শহরে গ্রামে তৈরী হল জাতীয় বিদ্যালয়, তৈরী হল যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, তৈরী হল ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি। দলে দলে ছাত্র সরকারী স্কুল কলেজ ছেড়ে এসব স্কুল কলেজে পড়তে এলেন। দেশের সেরা ছাত্ররা এলেন এসব জায়গায়। শিক্ষকতার দায়িত্ব নিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, স্যার গুরুদাস প্রমুখরা। এর অল্প কিছুকাল পরে আরও বৃহত্তর আদর্শ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুললেন বিশ্বভারতী। সে এক জোয়ার। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'নবযুগের বাংলায়' এ জোয়ারকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। তবে এ আদর্শ বেশীদিন টিকল না, কারণ ছাত্রদের বেশীর ভাগই বাঁধা পথে পড়াশুনা করেছেন, অভিভাবকরা তাতেই অনেক নিশ্চিন্ত থেকেছেন, নতুন নতুন সুযোগ সুবিধার প্রত্যাশী হয়ে থেকেছেন।

তবে ছাত্ররা বাঁধভাঙা বন্যার মত রাজনীতিতে এলেন গান্ধী আন্দোলনের আহ্বানে। গান্ধীর নতুন আদর্শ চুম্বকের মত আকর্ষণ করল ছাত্র, অভিভাবক বিশেষ করে মহিলাদের। তবে ছাত্ররা এলেনও যেমন, তেমনি আবার ইংরেজের সীমাহীন অত্যাচারের সামনে অহিংস আন্দোলনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ডাকে সেদিকে চলেও গেলেন। আর একাংশ ছাত্র সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্ন দেখলেন শোষণমুক্ত এক সমাজতান্ত্রিক জগতের—রুশ বিপ্লব তাদের পথের দিশারী। ছাত্র আন্দোলন শৈশব ছাড়িয়ে, কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পা রাখল।

১৯২৮ সাল। সাইমন কমিশন এল ভারতে। কমিশনকে বয়কট করে সারা ভারতে হরতাল পালন করল। পুলিশ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ ঘোষালের উপর লাঠি চার্জ করে। ছাত্ররা ধর্মঘট করে কলেজ স্কোয়ারে জমা হয়। এই প্রথম রাজনৈতিক কারণে বেথুন কলেজের মেয়েরাও ধর্মঘট করেন। প্রমোদ ঘোষাল ও স্কটিশ চার্চ কলেজের শচীন্দ্রনাথ মিত্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। বেথুন কলেজের মেয়েদেরও কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হয়। ঐদিনের বর্ণনা দিচ্ছেন বেথুনের প্রথম বর্ষের ছাত্রী বীণা দাস (ভৌমিক)। "দু-একটি চক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা জনাকয়েক ছাত্রী—যতগুলি ক্লাসে পারলাম বোর্ডে

লিখে দিলাম—"আগামীকাল দেশব্যাপী হরতাল। আমরা বেথুন স্কুল ও কলেজের ছাত্রীরাও সেই হরতালে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একটি বোনও যেন সেদিন বিদ্যালয়ে যোগ না দেন এই প্রার্থনা। শুরু হল whisper campaign, অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল।"[১২] এই সময়কার বেথুন কলেজের ছাত্রী অরুণা মুন্সী বলেছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজে তখন সকালে মেয়েদের কলেজ খুলেছে। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষা তখন মীরা দত্তগুপ্ত। সেদিন বেথুনের বহিষ্কৃত মেয়েদের তিনি সাদরে তাঁর কলেজে স্থান দিয়েছিলেন।"[১৩]

এরপর থেকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বেথুন কলেজের মেয়েদের জন্য একটি স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল। বাংলা দেশের প্রথম ছাত্রী সংগঠন গড়ে তোলেন কমলা দাশগুপ্ত, কল্যাণী দাস, সুরমা মিত্র—সবাই বেথুনের ছাত্রী। প্রীতিলতা আর কল্পনা বেথুনেরই মেয়ে। কল্পনা তার উচ্ছল প্রাণবন্যায় সমস্ত কলেজটাকেই প্লাবিত করে তুলতেন। এখানকার অধ্যক্ষা রাজকুমারী দাস বলতেন "ঐ মেয়েকে আমার কলেজ থেকে সরাতেই হবে—নইলে ও কলেজের সব মেয়েকে বার করে নিয়ে যাবে।"[১৪]

ছাত্ররাতো রাস্তায় নেমেছেন এবারে আস্তে আস্তে মেয়েরাও বেরিয়ে এলেন। একটি দুটি করে মুসলিম মেয়েও সাহস করে এগিয়ে এলেন। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন ছাত্ররা যারা মূলতঃ সংস্কৃতি কর্মী ছিলেন তারা বিভিন্ন কুসংস্কার, পশ্চাদপদতার বিরুদ্ধে সংগঠন ও সংঘ গড়ে তুলে আন্দোলনের একটি ইতিবাচক ধারা গড়ে তুলতে চাইছিলেন। এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মাত্র ছাত্রী পড়তেন তাঁর নাম ফজিলতুন্নেসা। তাঁর বিষয় ছিল গণিত। তিনি টাঙ্গাইলের মেয়ে। এটা যে কত বড় দুঃসাহসিক কাজ তা এখনও বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না।

এই সময় ঢাকার তরুণ সাহিত্যমোদী ছাত্ররা পত্রিকার 'পর্দা প্রথার সাহিত্যিক অসুবিধা' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন। কঠোর সব সংস্কার ও দেশা-চারের বাধা ভেঙ্গে, বোরকা ছাড়া, প্রচলিত ঘোমটা ছাড়া, সে যুগে একক একটি মুসলমান মেয়ের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। নবীন সাহিত্যমোদী ছাত্রদের উদ্যোগে মূলতঃ এ পরিবেশ আর আবহাওয়াতেই পর্দা বিরোধী সংঘের জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের দেরীতে হলেও প্রাথমিক ভিত্তি তৈরী হল। এই সংঘ কর্মীরাই পর্দাপ্রথা ও নানা ধরনের কুসংস্কার ও কুআচারের বিরুদ্ধে ছাত্র জনমত গড়ে তুলেছিল। ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকরা সম্মিলিত ভাবে একটি প্রগতিকামী সংগঠন গড়ে তোলেন যাতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজ সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে চিন্তা করতে ওকথা বলতে পারে। আবুল

হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল ফজল, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[১৫]

ছাত্র আন্দোলন যত জোরালো হচ্ছে, ছাত্র অস্তিত্ব সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতিতে যত প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে তত তাদের বিরুদ্ধে অতিবাম বা প্রতিক্রিয়াশীলদের অপপ্রচার ও আক্রমণ শুরু হয়েছে। প্রশাসকও ছাত্র সমাজের এই বিস্ফোরণকে আর অগ্রাহ্য করতে পারল না। ছাত্ররা এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হল তাঁদের পত্রিকা 'ছাত্র অভিযান' প্রকাশ করে।

এই সময় সারা ভারতেই ছাত্র আন্দোলনে একটি বৈপ্লবিক গুণগত পরিবর্তন ঘটে। নতুন ভাবনা চিন্তা ছাত্র ছাত্রীদের মনে উঁকি ঝুঁকি মারছিল, যদিও সবটা খুব শটে ছিল না। 'সেদিনের কথা' বইয়ে মনিকুন্তলা সেন লিখছেন তাছাড়া ছাত্রদের সভায় শুধু দেশের স্বাধীনতার কথাই নয়, সমাজতন্ত্রের কথাও আলোচিত হত। যারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের পুরোধা ছিলেন তৎকালীন সর্বভারতীয় নামকরা সেরা ছাত্ররাই। তখন দেশের হাওয়ায় সোশ্যালিজমের একটা আকর্ষণীয় হাতছানি ছিল। তরুন সমাজের চোখে মুখে তখন সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন। এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে আমরাও তো বরিশাল থেকে এখানে এসে মিলেছি।[১৬]

১৯২৮ এ ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক সম্মেলন হয় ছাত্রদের। জন্ম হয় নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি। এতে সভাপতির ভাষণে ভারতের তৎকালীন জননেতা জওহরলাল নেহরু বলেন "তোমরা বাংলার তরুণ, তরুণীরা, তোমরা কি সাহসের সঙ্গে চিন্তা ও কাজ করতে রাজী আছো? শুধু তোমাদের স্বদেশ থেকে উদ্ধত, বিদেশী রাজকে উচ্ছেদ করার জন্যই নয়, এই দুর্ভাগা জগৎকে বদলে উন্নততর ও সুখী সমাজ গড়ার জন্যও লড়তে কি তোমরা রাজী?

এই তোমাদের সামনে সমস্যা।......সব বাধাই ভাঙতে হবে, বিদেশী শাসকের চাপিয়ে দেওয়া বাধাই হোক, আর দেশের প্রাচীন লোকাচারের বাধাই হোক।[১৭]

১৯৩৩/৩৪ সালে রাজনীতিতে এল অবসাদ, চরম হতাশা, ছাত্র আন্দোলনও ঝিমিয়ে পড়ল। এইআন্দোলন আবার চাঙ্গা হল ১৯৩৫ ৩৬এ। তবে তখন পর্যন্ত ছাত্র নেতৃত্ব ছাত্র সমাজের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তুলতে পারিনি, আর উপযুক্ত কর্মসূচীও এই সংগঠনের ছিল না।[১৮] দেশে এক একটা বড় রকমের ঘটনা ঘটে দেশের মানুষ উত্তেজিত হয়, উত্তেজিত ছাত্র সমাজও রাস্তায় নামে, কিন্তু তার কোন স্থায়ী প্রভাব থাকে না।

ছাত্র সমাজ আবার প্রচন্ড আলোড়নে ও আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ল নির্বাসিত রাজনৈতিক বন্দীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার দাবীতে। সমস্ত দল

মতের ছাত্র-ছাত্রী বিপুল সংখ্যায় সাহসের সঙ্গে লড়াইয়ে এগিয়ে আসে, কলেজে কলেজে ধর্মঘট হয়, মিছিলে মিছিলে কলকাতা ও সারা বাংলার রাজপথ কাঁপে। পুলিশের লাঠি চার্জকে অগ্রাহ্য করে আইন সভা অভিযান করেন ছাত্র-ছাত্রীরা। মুক্তির প্রতিশ্রুতি আদায় করে আনেন হক মন্ত্রীসভার কাছ থেকে। আন্দোলনের এই উত্তাপ জিইয়ে রাখার জন্য শহর ও গ্রামে গঞ্জের স্কুলগুলিতে ছাত্র কমিটি তৈরি করার চেষ্টা করা হয়। এগুলিই হল পরবর্তী কালের ছাত্র সংগঠনের ব্যাপক ভিত্তি।

১৯৩৫ সালে ও ১৯৩৭ সালে দীর্ঘ আলোচনার ভিত্তিতে ছাত্র ফেডারেশনের নতুন সংবিধান ও কর্মসূচী গৃহীত হয়। জাতীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ ও আন্তর্জাতিক সংগ্রামে সমর্থন ও সংহতি, মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম, শ্রমিক কৃষক ও মেহনতি মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে সংহতি, মেহনতি জনতার মধ্যে সাক্ষরতার প্রসার প্রভৃতি সাধারণ লক্ষ্য ও কর্তব্য ছাড়াও এই প্রথম শিক্ষা ও ছাত্র দাবী সম্বন্ধে কতগুলি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হল :

(ক) শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও সরকার কর্তৃক ছাত্রদের সংগঠিত হওয়ার ও সংগ্রাম করবার অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে।

(খ) সরকারী শিক্ষা সংস্কার প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে হবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

(গ) এখনই বিনা বেতনে বাধ্যতা মূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ( ১৯৩১এ করাচী কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব ) প্রবর্তন করতে হবে।

(ঘ) সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ছাত্রদের সারা বাংলা রাজনৈতিক সংগঠনকে স্বীকৃতি দান করতে হবে।

(ঙ) সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের ভোটদানের অধিকারের ভিত্তিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ গঠন করতে দিতে হবে।

(চ) বিদ্যায়তনের পরিচালক সমিতিতে ও আইন সভায় ছাত্র প্রতিনিধি নিতে হবে।[১১]

নীচে থেকে উপর পর্যন্ত সংগঠনের কাঠামো ও নিয়ম কানুনও স্থির হয়।

১৯৩৭ এ ছাত্র ফেডারেশনের নতুন সংবিধান ও কর্মসূচী গৃহীত হয়। ঠিক হয় :—

(১) ছাত্র আন্দোলন জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে কাজ করবে।

(২) কিন্তু কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর লেজুড়ে পরিণত হবে না।

(৩) স্বাধীনতার দাবী বা বন্দীমুক্তির দাবী ছাড়াও—

(৪) ছাত্ররা তাদের নিজস্ব শিক্ষাগত দাবী নিয়েই দৈনন্দিন আন্দোলন করবে।

(৫) তাছাড়া দেশের শ্রমজীবি জনসাধারনের সমস্ত রকম দাবী ও সংগ্রামের সমর্থনেও তারা সামিল হবে।

(৬) এছাড়া থাকবে প্রগতিশীল নানান ধরনের সাংস্কৃতিক কাজকর্ম।[২৮]

ছাত্র ফেডারেশনের কাজকর্মের ধারায় মৌলিক গুণগত রূপান্তর ঘটতে শুরু করে। কি বাংলাদেশ, কি সারা ভারতে, সর্বত্রই সে যুগের সেরা মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা আসেন ছাত্র আন্দোলনের নেতা বা কর্মী হিসেবে এটা সত্যিই একটা উল্লেখ করার মত ঘটনা। বলা বাহুল্য আন্দোলনেও তার ছাপ স্পষ্ট।

'ছাত্র অভিযানে' সোমনাথ লাহিড়ী লিখেছেন: "ছাত্র হিসেবে আমাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন আমাদের জাতি, ধর্ম ও অবস্থার বন্ধনকে ছাপিয়ে যায়।

ছাত্র ফেডারেশনের দাবী মাহিনা কমাতে হবে। পরীক্ষার ফী কমাতে হবে, স্কুল কলেজে খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করতে হবে, এবং এই রকম আরও অনেক কিছু। আমাদের গরীব দেশ অধিকাংশ ছাত্রই ছা-পোষা অপরিচিত ঘরের ছেলে। গরীব দেশের পড়াকে গরীব মানুষের উপযুক্ত সস্তা অথচ কার্যকরী করার জন্য ছাত্র ফেডারেশন এই সব জরুরী সংস্কারের দাবী নিয়ে সারা বাংলায় আন্দোলন চালাচ্ছে—সেই দাবীগুলো তো হিন্দু হই বা মুসলমান হই আমাদের সকলেরই।

...ছাত্র আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছাত্রদের নিজস্ব দাবী।...ছাত্ররা দেশেরই মানুষ। সে হিসাবে দেশের স্বাধীনতা তাদেরও প্রধান ও স্বাভাবিক দাবী।

পরাধীন দেশে রাজনীতিই হল প্রথম নীতি।...দেশের সাধারণ রাজনীতিই ছাত্রদেরও রাজনীতি হবে।

কলকাতায় স্কুলের ছাত্রদের একটা সম্মেলন হল। নেতারা সাম্রাজ্যবাদকে যেমন সুন্দর বিশ্লেষণের সাহায্যে অনায়াসে ধ্বংস করলেন ছাত্রদের নিজস্ব প্রশ্ন গুলো তেমন নির্ভুল ও সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলতে পারলেন না।

ছাত্র সাধারণের আশা ও ভাষা যদি স্বাভাবিকভাবে ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে না উঠতে পারে তাহলে ছাত্র আন্দোলন ছাত্রদের জীবনের একটা সহজ ও স্বাভাবিক অংশ হয়ে উঠতে পারবে না।"[২৯]

ছাত্র আন্দোলন ছাত্রদের সঙ্গে রেখেই করতে হবে। নেতৃত্বও আসবে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্য থেকে। ছাত্ররা নিশ্চয়ই দেশ ও পৃথিবীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকে সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির আন্দোলন করবেন না, বরঞ্চ ছাত্রদের আন্দোলনকে দেশের আন্দোলন ও উন্নতির সঙ্গে সমন্বিত করে তুলতে হবে। রাজনীতি তো ছাত্ররা অবশ্যই করবে, কিন্তু তা সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতিতে

পর্যবসিত হলে আন্দোলন আদর্শ ভ্রষ্ট হবে এবং সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে একটা দুরত্বের প্রাচীর গড়ে উঠবে। ছাত্ররা যেমন নিজেদের অধিকার, দাবীদাওয়া কাজকর্ম ও সম্মান বোধ সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন তেমনি সজাগ ও সচেতন থাকবেন নিজের দেশ ও পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে। ছাত্রনেতা ও ছাত্র কর্মীর দায়িত্ব তাই অনেক।

শিক্ষা ও পরীক্ষা, শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ, পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলা, শিক্ষকের দায়িত্ব, ছাত্রের দায়িত্ব—এ নিয়ে তো আমাদের দেশে আলোচনার অন্ত নেই। একের পর এক শিক্ষা কমিশন হয়, তার সুপারিশ নিয়ে কিছুদিন উত্তপ্ত আলোচনা চলে তারপর যে কে সেই। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে কোন পরিবর্তন আসেনি এমন কথা বলা যাবে না। গিনি-পিগের মত ছাত্রদের উপর বার বার নতুন নতুন পদ্ধতি পরীক্ষা করা হয়েছে, তার ভাল মন্দ দুরকম ফলই ফলেছে।

শিক্ষার কথা বলতে গেলে প্রথমে যাঁর কথা মনে হয় তিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতই প্রায় দেড়শো বছর আগে শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু সুপারিশ করেছিলেন। তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আশ্চর্য মনে হয় যখন দেখি সেই সব সুপারিশ আজও সমান অর্থবহ। সেদিনও রক্ষণশীল সমাজ বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সংস্কারকে ভাল চোখে দেখেনি, আজও যে সবাই মেনে নেবেন এমন মনে করার কোন কারণ নেই।

তার প্রস্তাবনা ছিল "আমি যে সব প্রস্তাব করছি তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংস্কৃত ও ইংরেজীর সমৃদ্ধ জ্ঞান ভাণ্ডারকে একত্র করে তার ভিত্তিতে বিদ্যার্জন করা। এই শিক্ষা লাভ করে যে তরুণরা বেরিয়ে আসবেন তাঁরা পাশ্চাত্য জগতের বিজ্ঞান ও সভ্যতার পরিচয় ঘটাতে সক্ষম হবেন আমাদের মাতৃভাষা-গুলির মাধ্যমে। এ প্রস্তাবনা করেন বিদ্যাসাগর ১৮৪৬-এ। সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবকে বানচাল করার চেষ্টা করলে তিনি কাজে ইস্তফা দিলেন।

১৮৫০-এ তিনি আমন্ত্রিত হলেন আবার সংস্কৃত কলেজে, এবারে অধ্যক্ষ হিসেবে। ১৮৫২ সালে তিনি পেশ করেন 'নোটস অন দি সংস্কৃত কলেজ'। যাতে তিনি মাতৃভাষার চর্চা, উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা করা এবং প্রয়োজনীয় পুস্তকের অনুবাদ করা, সমস্ত রকম দর্শন পড়ানো এবং ছাত্রদের একটি স্বাধীন, বিতর্কিত মন তৈরি করার প্রচেষ্টা—ইত্যাদি সুপারিশ করেন।

বিদ্যাসাগর লিখলেন: "জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার—এই এখন আমাদের প্রধান প্রয়োজন, আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করতে হবে। স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক

রচনা করতে হবে, শিক্ষকদের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করতে পারে এমন একদল কর্মী সৃষ্টি করতে হবে।

মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল থেকে মুক্তি—শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরণের দরকারী লোক গড়ে তোলাই আমার উদ্দেশ্য, আমার সংকল্প।"[২৩] কিন্তু এ সবই প্রস্তাবনায় থেকে গেল।

১৯৩১-এ করাচী কংগ্রেসে প্রস্তাব নেওয়া হল, বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে এবং যত দ্রুতগতিতে সম্ভব নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। কংগ্রেস শেষ হল, প্রস্তাব কার্যকরী করার কোন প্রচেষ্টা শুরু হল না।

ছাত্র আন্দোলন শিক্ষার সম্প্রসারণে এগিয়ে এল। এই যুগে ছাত্র আন্দোলনের একটি বড় অবদান কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় ল্যানটার্ন স্লাইড সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ব্যাপক নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান ও সেই সঙ্গে কৃষক জনতার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া। তখনকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি কে. এম. আহমদ লিখেছেন: "১৯৩৯ সালের ছুটিতে বি. পি. এস. এফ গণসাক্ষরতা অভিযান সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিল। দেশবাসীর উপর সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিবরণ দিতে ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইড তৈরী করল। সেই নিয়ে দল ছড়িয়ে পড়ল।...দলটি যখন ২৪ পরগণার শ্রমিক কৃষক এলাকায় ঘুরতে শুরু করল, তখন সত্যি সত্যিই হাজার হাজার লোক তাদের কথা শোনার জন্য সন্ধ্যায় জড়ো হতে লাগলেন। শুরু হল পুলিশী তৎপরতা। আদেশ জারি হল এই দল গ্রামের ভিতর দিয়ে প্রচার করতে পারবে না।"[২৪]

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্রীকরণের জন্য দাবী জানালেন ছাত্ররা। তাদের বক্তব্য যে শিক্ষায়, সরকার, কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়—শুধু এদের কথামত চললেই হবে না, যাদের নিয়ে কারবার সেই ছাত্রদের এতে দখল দিতে হবে। তাদের অভিভাবক, অর্থাৎ দেশের জনসাধারণকেও এতে অধিকার দিতে হবে। স্বভাবতই কর্তৃপক্ষ এতে সহজে রাজী হবেন না, কারণ তাদের এতদিনকার জমিদারী তারা ছাড়তে রাজী হবেন কেন?

এই সময় একটি পুস্তিকা ছেপে বেরোয় 'বিশ্ববিদ্যালয় না জমিদারী'? লেখকের নাম সোমনাথ লাহিড়ী। তৎকালীন ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকদিনে পুস্তিকাটির হাজার কপি বিক্রী করেন। পুস্তিকাটির প্রচ্ছদে ছিল একটি বড় জিজ্ঞাসা চিহ্ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মুখটি বসানো ছিল ঐ চিহ্নটিতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বজন পোষণ ও দুর্নীতিকে একেবারে খোলাখুলি আক্রমণ করা হয়েছিল এই পুস্তিকাটিতে।[২৫]

তখন স্কুলগুলিতে কারণে অকারণে শিক্ষকরা ছাত্রদের নির্মমভাবে প্রহার করতেন। কলেজে এবং স্কুলে রাজনীতি করার অপরাধে যখন তখন ছাত্র নেতাদের বহিষ্কার করা বা পুলিশের লাঠিপেটা করা—হামেশাই এসব ঘটনা ঘটতো। প্রেসিডেন্সী কলেজে, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে, স্কটিশ চার্চ কলেজে, বিদ্যাসাগর কলেজে, সিটি কলেজে নানান অজুহাতে ছাত্রনেতা ও কর্মীদের কলেজ থেকে বিতাড়ন করা হত, অনেক সময় তাদের উপর লাঠিচার্জও হয়েছে, কলকাতার একটি মিশনারী স্কুল, নোয়াখালির অরুণচন্দ্র হাইস্কুল, রংপুরের তারকনাথ স্কুলে ছাত্রদের বেত দিয়ে মারার ঘটনা প্রায়শই ঘটত। ১৯৩৭-৩৮এ ছাত্র ফেডারেশন জোরালো অভিযান করে যে স্কুলে ছাত্রদের উপর দৈহিক প্রহার করা চলবে না। জেলায় জেলায় সভা করে আন্দোলন চালানো হয়, ছাত্র ও অভিভাবকরা এই ব্যাপারে একমত হন। ছাত্ররা বার বার ধর্মঘট করে। দু-বছরের মধ্যে ৭০টি ধর্মঘট করে এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে। শেষ পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলন সরকারী শিক্ষা দপ্তরকে বাধ্য করে নির্দেশ দিতে 'বিদ্যালয়ে কোনরকম দৈহিক নির্যাতন করা চলবে না'—ছাত্র ফেডারেশনের নিঃসন্দেহে এটা একটা বড় জয়।[২৬]

১৯৪২-৪৩—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া গ্রাস করছে আমাদের দেশকেও। জাপান বার্মা দখল করে, কাতারে কাতারে বাঙালী ও ভারতীয় পালিয়ে আসেন কলকাতায়। কলকাতার লোক শহর ফাঁকা করে মফঃস্বলে পালিয়ে যান। কলকাতা নিষ্প্রদীপ হল। যুদ্ধের প্রয়োজনে ইংরেজ সরকার জনগণকে বঞ্চিত করল প্রয়োজনীয় খাবার, কেরোসিন ও কাপড় থেকে। শুরু হল মজুতদারী ও কালোবাজারী। আর ৪৩-এ শুরু হল ভয়াবহ মন্বন্তর। কলকাতার রাজপথে মৃতদেহ, অলিতে গলিতে মৃত্যু। ক্ষিদের তাড়নায় গ্রাম উজাড় করে লোক এল কলকাতায়। কিন্তু কোথায় খাবার। ছাত্রছাত্রী ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষগুলোর পাশে।

ছাত্রছাত্রীরা একদিকে লঙ্গরখানা খুলে খাবার বিতরণ করলেন, অন্যদিকে সরকারকে বাধ্য করলেন সস্তায় লেখার কাগজ ও আলো জ্বালাবার কেরোসিন দিতে। নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলন করল ছাত্র-সংগঠনগুলি, বিশেষ করে ছাত্র-ফেডারেশন। জেলায় জেলায় Convention করল। মফঃস্বলে সস্তায় কাগজ, কেরোসিন বিক্রী হল, আর কলকাতায় রেশন কার্ড দেখিয়ে ছাত্ররা এবং তাদের অভিভাবকরা সস্তায় কাগজ, খাতা ও কেরোসিন পেলেন। ছাত্র-

ফেডারেশনের এই আন্দোলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও তার পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলনকে জোরদার করেছে।[২৭]

১৯৪৪ সালের ছাত্র ফেডারেশনের আর একটি কর্মোদ্যোগ সত্যিই। প্রশংসনীয়। কলেজের ফাইনাল পরীক্ষায় একটি ছেলে নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ে, তাই নিয়ে শিক্ষকের (invigilator) সঙ্গে বচসা, শেষ পর্যন্ত ছেলেটি শিক্ষককে ছুরিকাঘাত করে এবং মাষ্টারমহাশয় মারা যান। ঘটনাটি ছাত্র ও অভিভাবক মহলকে স্তম্ভিত করে দেয়। ১৯৪৫-এ ছাত্র-ফেডারেশন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এক বিরাট ছাত্র-সমাবেশ আহ্বান করে। প্রধান বক্তা ছাত্র-ফেডারেশনের সম্পাদক অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য। তীব্র ভাষায় সমস্ত ঘটনাটির সমালোচনা করেন তিনি। পরীক্ষায় নকল করা একটি গর্হিত অপরাধ। এবং সভায় ঘোষণা করা হয় যদি কোন ছাত্র-ফেডারেশনের কর্মী পরীক্ষার হলে টোকাটুকি করে তবে তাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হবে। একই সময় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশীও ঘোষণা করেন কমিউনিস্ট পার্টির কোন সদস্য যদি এমন জঘন্য অপরাধ করে তবে তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হবে।

স্মরণীয় বক্তৃতা করেন ছাত্র-ফেডারেশনের অপর এক নেতৃস্থানীয় কর্মী রণজিৎ গুহ।—তিনি বলেন: বীণা দাস সেনেট হলে কনভোকেশনে ডিগ্রী নিতে গিয়ে ইংরেজকে মারতে গিয়েছিলেন আর আজ আমরা শিক্ষককে মারতে যাচ্ছি—এ কোন অধঃপতন?

ঐদিন অন্নদাশঙ্করের লেখা **পরীক্ষা ও শিক্ষা** পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটিতে বলা হয় যে টোকাটুকি জঘন্য অপরাধ আমরা সর্বতোভাবে তার বিরোধিতা করি, কিন্তু একই সঙ্গে এই ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থারও আমরা সংস্কার চাই। শিক্ষাকে গণমুখী ও ব্যবহারিক করার প্রয়োজন। কেরানী তৈরীর সেকেলীয় শিক্ষানীতিকে পরিবর্তন করার সময় এসেছে।

পরীক্ষা ব্যবস্থা একটা তামাশা। শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত মাতৃভাষা। এই পুস্তিকায় Compartmental পরীক্ষা চালু করার জন্য সুপারিশ করা হয়। কোন ছাত্রছাত্রী কোন একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তাকে শুধু সেই বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হবার সুযোগ দিতে হবে। তাহলে অনর্থক, অর্থ ও সময়ের অপচয় হবে না।

পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন হওয়া একান্তই আবশ্যক। পুস্তিকাটি ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহলকে ছাত্র-ফেডারেশন সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত করে তোলে।[২৮]

১৯৪৬-এর জুন মাসে নাগপুরে এই আই. এস. এফ.-এর বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। ছাত্র নেতৃত্ব ঘোষণা করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে জোরদার করার জন্য শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন প্রয়োজন। এটাই হবে

লড়াইয়ের দ্বিতীয় রণাঙ্গন (2nd front)। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এখনই সম্ভব না হলেও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

* শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রয়োজন, শিক্ষাকে গণমুখী করতে হবে তবে শুধু বিস্তার নয় শিক্ষার মানোন্নয়ন করা প্রয়োজন।

* মাতৃভাষা শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন হবে।

* বিনাবেতনে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা দরকার।

* বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় প্রবণতা যাতে বাড়ে এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যাতে শিক্ষা বহুমুখী হতে পারে সেই ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।[২৯]

শুরু হয় তর্ক-বিতর্ক। ছাত্র নেতৃত্বের মধ্যেও নানান ধরনের মতামত প্রকাশ পায়। ছাত্র কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ হল শিক্ষক সমাজের। আলাপ আলোচনা চলল। পাঠ্যসূচী পরিবর্তনে ছাত্ররা তখন একটা বড় ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলেন। অধ্যাপক ম্যালকম আদি শোবাইয়া (UNESCO'র চেয়ারম্যান) পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের উদ্যোগের জন্য ছাত্র-ফেডারেশনকে অভিনন্দন জানান।[৩০]

১৯৪৮-৪৯এ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা বিভাগ ছাত্রদের Compartmental পরীক্ষা দেবার সুযোগ দিতে স্বীকৃত হয়। সবকিছু মিলিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষক মহলে ছাত্র-ফেডারেশনের নেতা ও কর্মীরা সুনাম অর্জন করেন।

১৯৪৭ সাল ১৫ আগস্ট। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। একদিকে স্বাধীনতার আনন্দ অন্যদিকে দেশবিভাগের শোক ও ক্রোধ। ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বলল কলকাতায় স্বাধীনতার ১৫ দিনের মধ্যে, ১ সেপ্টেম্বর। গান্ধীজী আমরণ অনশন করলেন। কলকাতার ছাত্র রাস্তায় নামলেন, নামলেন ছাত্রীরাও হাতে তাদের শান্তির ব্যাজ—'গান্ধীজিকে বাঁচাতে হলে কলকাতাতে শান্তি চাই'—[৩১] একা ছাত্ররা নিশ্চয়ই নয়, তবু যে অসম সাহস দেখিয়ে কোন রকম দ্বিধা না করে, মুহূর্ত মধ্যে কর্মপন্থা ঠিক করে দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে ছাত্ররা চলে যেতে পারলেন এতো এমনি এমনি হল না। সমাজে ও মানুষের মধ্যে কলকাতার ছাত্ররা নিজেদের একটা বড় জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন তাঁদের কাজ ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

শিক্ষার বিস্তারেও পিছিয়ে রইল না ছাত্র-ফেডারেশন। ছাত্র-ফেডারেশনের স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতি সম্পর্কে পুস্তিকা প্রকাশিত হল। পুস্তিকাটির নাম নতুন যুগের নতুন শিক্ষা[৩২]। পুস্তিকাটি রচনা করেন ছাত্রফেডারেশনের সম্পাদিকা গীতা মুখার্জী এবং ঢাকার ছাত্রনেতা ও ছাত্র-ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক মুনীর চৌধুরী। পুস্তিকাটি প্রকাশিত হল ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট।

স্বাধীনতা আসছে। স্বাধীনতার আনন্দ আর দেশ ভাগের জ্বালা দুই একসঙ্গে অনুভব করছি। আমাদের ছাত্রসমাজ স্বাধীনতার জন্য অনেকেই আত্মদান করেছেন ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হলে করবেন। করাচী কংগ্রেসের বাধ্যতামূলক বিনাবেতনে প্রাথমিক শিক্ষার সিদ্ধান্ত বহুদূর রয়ে গেছে। স্বাধীন দেশের ছেলে মেয়েরা সবাই যাতে শিক্ষা পায় তার ব্যবস্থা দেশকেই করতে হবে।

পুস্তিকাটিতে স্পষ্ট ভাষায় লেখা হয় মাতৃভাষাই হবে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন। বিজ্ঞান শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা স্কুল শিক্ষার পরই শুরু করতে হবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। নিশ্চয়ই স্বাধীন দেশকে অর্থনীতিতে স্বনির্ভর করার জন্য নতুন নতুন শিল্পের পরিকল্পনা এবং শিল্প কারখানার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নতুন নতুন শিল্প পরিচালনার উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্ত থাকবে। স্বাধীন দেশের নতুন শিক্ষানীতি রূপায়ণে তৎপর হয়ে এগিয়ে এলেন ছাত্রসমাজ।

১৯৫২ সালে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা শুরু হল। ছাত্র-সংগঠনের সঙ্গে হাত মেলালেন শিক্ষক সংগঠন (A.B.T.A)।

স্কুলের শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন নিয়ে শুরু হল আলোচনা। যা আছে স্কুলে (দশম শ্রেণী) তাই থাকবে না একটু এগিয়ে স্কুলে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে কলেজে স্নাতক স্তরে ৩ বছর ও স্নাতকোত্তর স্তরে ২ বছর পড়াশুনা করবে।

আর একটা মত এল স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়ে কলেজে আসবে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বহুমুখী (কলা / বিজ্ঞান / বাণিজ্য) শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সবগুলোর পরীক্ষা নিরীক্ষাই করা হোল। বর্তমানে দশম ক্লাশ পর্যন্ত সাধারণ স্কুলে, বড় বড় স্কুলে এবং অধিকাংশ কলেজে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পড়ানো হয়।

বার বার ছাত্র, শিক্ষক মহলে প্রশ্ন উঠে পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের। সে পাঠ্যসূচীর সঙ্গে জীবনের যোগ নেই, যার কোন সমকালীন গুরুত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না তা জানার জন্য আগ্রহও খুব থাকে না। শিক্ষক সম্প্রদায় অধিকাংশ সময়ই ছাত্রদের দোহাই দিয়ে পাঠ্যসূচী পরিবর্তনে বাধা দিয়ে থাকেন। কিন্তু ছাত্ররা মানতে চান না। তর্ক উঠে, হয়তো খানিকটা বাড়াবাড়িও করে ফেলে। পুরোনো বিষয়ের নতুন ব্যাখ্যা নতুন মূল্যায়ন আজও শিক্ষার্থীর মনে ঝড় তোলে। নিম্নবর্গের মানুষের জীবনযাত্রা সমাজ

ইতিহাস জায়গা করে নিতে চায় রাজা উজিরকে সরিয়ে দিয়ে। দ্রুতগতিতে পৃথিবী পাল্টায়, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে উৎসুক ছাত্র। এ কাজ তো এককভাবে ছাত্রর নয়? ছাত্র সম্প্রদায়, ছাত্র সংগঠন পিছিয়ে থাকবে কেন? তারা বর্তমানকে তৈরী করবে, ভবিষ্যতের রূপরেখা অনেকখানিই তো তাদের হাতে।

১৯৬৭-৭০ সাল। নতুন পাঠক্রমের দাবী এল আমাদের দেশে। শুধু আমাদের দেশে কেন, ফরাসী ছাত্ররা শিক্ষা জগতে বিপ্লব করে ফেললেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাবী উঠল মাষ্টারমশাইদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি নয়, তাদের কাছে জানতে চাই, লড়তে চাই। কি জানবো আমরাই ঠিক করে দেবো। ফরাসী ছাত্ররা ১৯৬৮ সালের মে মাসে শিক্ষা জগতে আলোড়ন তুললেন—

মাষ্টারমশাই—আমরা প্রশ্ন করবো। আপনারা উত্তর দেবেন।

—আর শার্লামেন নয়। আমরা জানবো ভিয়েতনামে কি হল?

নতুন নতুনভাবে পৃথিবীকে জানা, এগিয়ে চলাই ছাত্রদের ধর্ম। তাই ছাত্র আন্দোলন হোক প্রগতিরই আন্দোলন।

"এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায়না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোন সংশয়—
এদেশের বুকে আঠারো
আসুক নেমে।"

## পাদটীকা

১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ, ১৯৮০ (পরিশিষ্ট-ছ)—সোমনাথ লাহিড়ী ছাত্র অভিযান প্রথম বর্ষ ৮ম সংখ্যা।

২। গৌতম চট্টোপাধ্যায়ঃ—স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ (পরিশিষ্ট জ)

৩। রিফর্মার ৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৩

৪। ক্যালকাটা লিটারেরী গেজেট ৬ জুন ১৮৩৫
গৌতম চট্টোপাধ্যায়—Awakening in Bengal in Early 19th Century—1965.

৫। ক্যালকাটা মান্থলী জার্নাল নভেম্বর, ১৮৪১।

৬। সুশোভন সরকার—Bengal Renaissance and other Essays, 1970, P. 22

৭। বিপিনচন্দ্র পাল : নবযুগের বাংলা।
৮। বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ।
৯। বিপিনচন্দ্র পাল : নবযুগের বাংলা।
১০। চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা
১১। গৌতম চট্টোপাধ্যায় : স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ
১২। বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ।
১৩। স্মৃতিচারণ—অরুণা মুন্সী : মীরা দত্তগুপ্তর স্মরণসভা। ১৯৮৩
১৪। স্মৃতিচারণ—বীণা দাস : বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ।
১৫। মোহাম্মদ হানসান—বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস প্রথম খণ্ড (১৮৩০—১৯৫২), ১৯৯১ ঢাকা, পৃঃ ২৩।
১৬। মনিকুন্তলা সেন : সেদিনের কথা, ১৯৮২
১৭। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ—পরিশিষ্ট 'ক'
১৮। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : 'ছাত্র ফেডারেশনের গোড়ার যুগে'—ছাত্র ফেডারেশন ৪০ বছর স্মারকগ্রন্থ, ১৯৭৬
১৯। মোহম্মদ হানসান—'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস।'
২০। ঐ
২১। সোমনাথ লাহিড়ী : 'ছাত্র জীবন ও ছাত্র প্রতিষ্ঠান' ছাত্র ফেডারেশন স্মারক গ্রন্থ, ১৯৭৬
২২। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি।
২৩। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা।
২৪। কে. এম. আহমদ : বাংলার ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের দিনগুলি—স্মারক গ্রন্থ।
২৫। সোমনাথ লাহিড়ী রচনাবলী : ঘটনা ও রটনা, ১৯৮৫, প্রথম খণ্ড (১৯৩১—৪৫) পৃ : ২৫১—২৫৫
২৬। প্রভাত দাশগুপ্ত : ছাত্র ধর্মঘট—স্মারকগ্রন্থ।
২৭। জনযুদ্ধ, কলকাতা
২৮। সাক্ষাৎকার : গৌতম চট্টোপাধ্যায় অক্টোবর ১৯৯২
২৯। The Student, Bombay 15 July 1946
৩০। ঐ
৩১। স্বাধীনতা, কলকাতা ২/৩/৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭
৩২। গীতা মুখার্জী ও মুনীর চৌধুরী : 'নতুন যুগের নতুন শিক্ষা' আগস্ট ১৯৪৭—এবং গীতা মুখার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
৩৩। The almost Revolution: France May 1968, Pelican, London, 1969.